বাংলা সাহিত্যে নজরুল

বাংলা সাহিত্যে নজরুল

আজহারউদ্দীন খান

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১
দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৩
তৃতীয় সংস্করণ—পৌষ, ১৩৬৫
চতুর্থ সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৭

BANGLA SAHITYE NAZRUL

Azharuddin Khan

দাম দশ টাকা

৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস
মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ২৪-এ সুধীর চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
নিউ বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে শ্রীসন্তোষকুমার সামুই কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শৈশবে মাকে হারাই, কৈশোরে বাবাকে—
এমনি কপাল নিয়ে দুঃখীর সংসারে একদিন
এসেছিলুম, সেদিন যিনি নিজের দুঃখ-দৈন্য,
অন্যের ঈর্ষা-বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করে আমাকে
কোলে তুলে নিয়ে মা-বাবার অভাব কোন
দিনই বুঝতে দেননি সেই আমার দিদিমাকে
প্রণাম করছি।

এই লেখকের

বাংলা-সাহিত্যে মোহিতলাল

মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

বর্তমান সংস্করণের পিছনে আমি মোটেই সময় দিতে পারিনি—পূর্বের সংস্করণাদির সময় যেটুকু দিতাম এবার সেটুকুও হোল না। প্রকৃতপক্ষে প্রকাশকের আকস্মিক অনতিক্রম্য তাগিদ, সর্বোপরি আপনাদের প্রবল আগ্রহ ও অবিচ্ছিন্ন উৎসাহই আমাকে এই সংস্করণের জন্য সম্মতি দিতে হয়েছে।

এবারে "নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা" ও "সাধক কবি নজরুল" নামে নতুন দু'টি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। "নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা" প্রবন্ধের ওপর আপনাদের একটু অভিনিবেশ দাবী করব। নজরুল-প্রতিভার আলোচনার নামে কবির একদল তথাকথিত অনুরাগী ও ভক্তরা যে বিকৃত মনোভাবের পরিচয় আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে সেই সম্পর্কে এখন থেকে একটু সাবধান হবার সময় এসেছে।

আজ বিশেষভাবে মনে পড়ছে সদ্য পরলোকগত আব্বাসউদ্দীন আহমদ সাহেবের কথা, যিনি নিজের কণ্ঠে গীত নজরুলগানের রেকর্ড তালিকা আমাকে পাঠিয়েছিলেন—সেটি এমন অন্তিম মুহূর্তে আমার হাতে এসেছিল যখন সংযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সংস্করণে যথাযথস্থানে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে আমি বেদনা পেয়েছি।

পরিশেষে মুদ্রণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি যা দুর্মরভাবে থেকে গেল, তার জন্যে অন্যান্য বারের মত এবারও আপনাদের সস্নেহ ঔদার্যের ওপর নির্ভর করলুম।

আজহারউদ্দীন খান্

॥ ১৮ই আষাঢ়, ১৩৬৭ ॥

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

অল্প সময়ের মধ্যে বইটির আবার সংস্করণ হোল। বিশেষতঃ যেখানে গল্প-উপন্যাসের দ্রুত নিঃশেষের কথা প্রকাশকদের কাছে প্রতিনিয়ত শুনতে পাই, সেখানে প্রবন্ধ বইয়ের ভাগ্যে আশু সংস্করণ আমাকে রীতিমত বিস্মিত করেছে। আমার লেখার মধ্যে কোন কৃতিত্ব আছে কিনা জানিনা, তবে এ গ্রন্থের যিনি বিষয়বস্তু তিনি নিঃসন্দেহে আজও জনপ্রিয় কবি। তাঁকে অবলম্বন করে আমি যে গ্রন্থ রচনা করেছি সেটিও যে আশাতিরিক্ত সমাদর পেয়েছে তা আমার মত লেখকের পরম সৌভাগ্য।

এবারও বইটির কিছু পরিমার্জন করেছি এবং কয়েকটি নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত করেছি। জনকয়েক পাঠক কবির চিঠি সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন, সেজন্য তাঁর কয়েকটি চিঠির মধ্য থেকে মাত্র দুটি চিঠি পরিশিষ্টে দিয়েছি যা তাঁর কবি-মানস উপলব্ধি করার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করবে। কোনরূপ কৃতজ্ঞতার অপেক্ষা না রেখে যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নজরুল-সঙ্গীতের রেকর্ড তালিকা প্রণয়নে আমায় সাহায্য করেছেন—এবারের সংস্করণে সেগুলি সংযুক্ত হয়েছে। আগামীবারে এ বিষয়ে তাঁদের আরো সহযোগিতা কামনা করি।

প্রতি সংস্করণে মুদ্রণ-প্রমাদ কিছু কিছু থেকেই যাচ্ছে। এ বেদনা আমার সর্বাধিক হলেও এখান থেকে এর সমাধানের কোন উপায় নেই আমার হাতে। তবু যাঁরা আমার শতত্রুটিসত্ত্বেও বইটিকে সাদরে গ্রহণ করেন সেই চেনা-অচেনা আপনজনের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

আজহারউদ্দীন খান্

॥ ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ একবছরের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়। পাঠক-সমাজের তাগিদ সত্ত্বেও নানা কাজের চাপে নতুন সংস্করণের জন্যে সঙ্গে সঙ্গে নিজে প্রস্তুত হতে পারিনি। তবু যতটুকু সময় পেয়েছি তারই মধ্যে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে স্থানে স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করেছি এবং চারটি নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত করেছি যাতে নজরুল-সাহিত্য পঠন-পাঠন ও আলোচনার বিশেষ সহায়ক হয়।

প্রথম সংস্করণ মাত্র দশ দিনে ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। ফলে মুদ্রাকর প্রমাদ এত বেশী রয়ে গেছল যে তথ্যের ভুল ও ব্যাখ্যানের বহু ওলট-পালট হয়েছিল। এ সংস্করণে সেগুলি যথাসম্ভব সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। কবির জীবনী আরও তথ্যময় করা হয়েছে। জনাব মুজফ্ফর আহমদ সাহেব কবি সম্পর্কে বহু তথ্য দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। তাঁর দেয়া উপকরণ এবারে আমি অসঙ্কোচে ব্যবহার করেছি। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থের পরিমার্জন ব্যাপারে বহু উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। নজরুল-সঙ্গীতের রেকর্ড তালিকার অনেকগুলি গান রেকর্ডের নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাঠক-পাঠিকারা কবির রেকর্ড কিনতে চান বলে এই ব্যবস্থা করা হল তাঁদেরই পরামর্শ-অনুসারে।

প্রথম সংস্করণটিকে যাঁরা সাদরে গ্রহণ করেছেন তাঁদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আবার তাঁদেরই হাতে এ সংস্করণটি তুলে দিলাম।

আজহারউদ্দীন খান্

॥ ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ ॥

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের ধ্রুবাকাশে কাজী নজরুল ইসলাম একটি জ্যোতিষ্ক বিশেষ। এই জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বলতার যথার্থ বিচার এখনও পর্যন্ত হয়নি। যদিও সঠিক মূল্যনিরূপণের উপযুক্ত সময় এখনো আসেনি তবু প্রাথমিক পরিচিতি হিসেবে তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করা যে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে একথা আজ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। নিজের যোগ্যতার প্রতি সন্দিহান হয়েও এই প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধ হয়ে চারপাঁচ বছর ধরে নানা সাময়িক পত্রে নজরুল প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে খণ্ড-বিখণ্ডভাবে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলুম, তবে সেগুলি যে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিরন্তর তাগাদায় দীর্ঘ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে বাংলা বইয়ের আসরে নামাতে হবে তা ছিল আমার কল্পনার বাইরে। বাংলার পাঠকসমাজ এ বইকে কেমনভাবে গ্রহণ করবেন তা জানিনে, এ বইয়ে আমার যদি সামান্যতম কৃতিত্ব থাকে তা তাঁদের জন্যেই পেয়েছি বলে মনে করব। কেননা, তাঁরা আমাকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন; তাঁদের স্নেহ ভালবাসাই আমাকে লেখার কাজে বিরক্তি, অবসাদ ও নৈরাশ্যের মধ্যে উৎসাহ দিয়েছে, আমাকে প্রেরণা জুগিয়ে আমার লেখাকে শেষ করিয়েছে। তাঁদের সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত স্নেহের সম্পর্ক রয়েছে, তাতে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও যেন আন্তরিকতার দোষে দোষী হতে হয়, আবার না করলেও আত্মপ্রবঞ্চনা করা হয়। কী করব ভেবে পাচ্ছিনে।

নজরুল সম্পর্কে এ বইটি প্রথম বই এমন কথা বলব না—আমার আগে জন তিনেক নজরুল সম্পর্কে বই লিখেছেন। তবে আমার দিক থেকে বলতে পারি যে নানাদিক দিয়ে নজরুল-প্রতিভার বিচার হয়ত এই প্রথম। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে কতদূর সফল হয়েছি সে বিচারের ভার দিলুম পাঠকদের ওপর।

কবির জীবন সম্পর্কে নানারূপ ভুয়ো গুজব আমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেই গুজবকে বিশ্বাস করে আজও অনেক মহলে কবির বিরুদ্ধে

বিকৃত প্রচার চলে। অনেকে আবার নিজ স্মৃতির মাধ্যমে কবিকে দেখতে চেষ্টা করেছেন—সেগুলি আরও বিপজ্জনক, কেননা তাতে কবির চেয়ে লেখকই নিজের মোড়লি করেছেন বেশী। এঁদের সত্যতা সবসময়ে গ্রহণ করতে বাধ-বাধ ঠেকে। তাই তাঁর সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা ঘটনা এমন জট পাকিয়ে রয়েছে যে সত্য-মিথ্যা বেছে একটা পাকা নির্ভরযোগ্য জীবনী লেখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কবির জীবনের যেসব ঘটনা দীর্ঘ চার পাঁচ বছর ধরে আমি উদ্ধার করেছিলুম নানাজনের নানা লেখা থেকে, নানা পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে এবং সাধ্যমত অনুসন্ধান ক'রে—সেসব তথ্য একত্রিত করে যতদূর সম্ভব প্রামাণিক জীবনী লিখতে চেষ্টা করেছি। এতে যে কতদূর ক্লেশস্বীকার করতে হয়েছে তা মফঃস্বলের সাহিত্যসেবী মাত্রেই সহজে উপলব্ধি করবেন। তথ্যসংগ্রহে যেখানে আমার সংশয়ের উদয় হয়েছে সেখানেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের গোচরে এনেছি, তিনি আমার অনেক সংশয়ের মীমাংসা করে দিয়ে জীবনীকে প্রামাণিক ক'রে তুলতে সাহায্য করেছেন। তবু লেখার শেষে বারবার মনে হয়েছে সব কথা বলা হ্লান, কেননা সত্যসন্ধীর কাছে শেষকথা বলে কোন কথা নেই। তাই কবির সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনী এখনও রচিত হবার অপেক্ষায় আছে। আমাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে অনেক তথ্য লোপ পেয়ে গেছে, আর অনেক তথ্য লোপ পেতে বসেছে। তাঁর বন্ধুসম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও অনেকে জীবিত ও কর্মক্ষম আছেন, সময় থাকতে থাকতে সেগুলি সংগৃহীত না হলে আর কখনও হবার সম্ভাবনা থাকবে না। তাই হারিয়ে যাবার ভয়ে যৎসামান্য উপকরণ সংগ্রহ ক'রে দিয়ে গেলুম ভাবীকালের জীবনচরিতকারের কাছে, যিনি এই জীবনীর খসড়া থেকে পাথেয় নিতান্ত কম পা'বেন না। যদিও আগামী দিনের মানুষ 'কবিকে পাবে না তাহার জীবনচরিতে' তবু কবির সমকালীনদের একটা দায়িত্ব আছে বৈকি।

"নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা" কবির দোষ-গুণ সম্পর্কিত তন্ন তন্ন বিচার নয়। তাঁর কাব্যের প্রাথমিক পরিচয় প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে কবির প্রকৃত স্থান কোথায় এবং তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য কি, এ আলোচনায় তারই ইঙ্গিত স্পষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। মোটামুটিভাবে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ও হোল তাই।

"শেলী—বায়রণ—নজরুল" প্রবন্ধটি পাঠ করার পূর্বে আমি পাঠককে এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আসল কথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই। এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল তুলনামূলক আলোচনা, তুলনামূলক বিচার নয়। তাঁদের সাধনার ভেতর যে একটি যোগসূত্র রচিত হয়েছে সেটিই আমি রচনার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। তাই এই ত্রয়ীর মধ্যে কে বড় কে ছোট এ অবাস্তব প্রশ্ন আসে না। তাঁদের কবিধর্মের দোষগুণের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করলেও কে ছোট কে বড় এ নিয়ে জজিয়তি রায় দিইনি। প্রয়োজনের খাতিরে তাঁদের কাব্যাংশ বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করতে হয়েছে। রসিকজনের কাছে উদ্ধৃতির বহুলতা বাহুল্য হিসেবে বিবেচিত হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

এই বইয়ের মতামতগুলো অধিকাংশ পাঠকদেরই মনঃপূত হবে সে ভরসা আমি করিনে; লোকে আমার মতকেই নির্বিবাদে গ্রহণ করুক এরকম সহজাত আদিম দুর্বলতা আমার নেই। আবার অপরের অভিমতকে নির্বিচারে গ্রহণ করে গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে তেমনি আমার সমান আপত্তি আছে। তাই পাঁচজনের মতামতের সঙ্গে যেখানে আমার মতবিরোধ হয়েছে সেখানেই আমার বক্তব্যকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যক্ত করতে পশ্চাৎপদ হইনি। এতে কেউ যদি ক্ষুণ্ণ হন তাহলে আমি নিরুপায়।

এ গ্রন্থ রচনায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অনেকের নিকট হতে সাহায্য গ্রহণ করেছি—অনেকের সঙ্গে নজরুল-সাহিত্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনাও করেছি; পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের দ্বারা যে প্রভাবিত হইনি তা নয় বরং তাঁদেরই উক্তির সার সংগ্রহ করেছি। তাই জানা-অজানা বন্ধুদের প্রতি এখানে রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিবেদন।

অসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে এ বইয়ে কিছু অনবধানতাবশত ছাপার ভুলচুক, কিছু অজ্ঞতার জন্যে লেখার মধ্যে দোষ-ত্রুটি, চিন্তার অসঙ্গতিও হয়ত রয়ে গেল; কেননা অখণ্ড অবসর ও অবহিতচিত্ত নিয়ে সাহিত্য-সেবার সুযোগ আমার নেই। তাছাড়া, আজকের দিনে শুধু সাহিত্য নিয়ে পড়ে থাকলে মন ভরে, পেট ভরে না। তাই ডি. এম লাইব্রেরীকে এই গ্রন্থ প্রকাশ করার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বইটির

অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করতে চেষ্টার কসুর করেন নি। তবে তথ্য ও ব্যাখ্যার দিক দিয়ে কোন ত্রুটি থাকলে সে ত্রুটির জন্যে দায়ী সম্পূর্ণভাবে আমি। ত্রুটি সংশোধনে কিংবা অন্য কিছু তথ্য বা পরামর্শদানে কোন সহৃদয় পাঠক যদি যত্নবান হন তাহলে অতিপ্রিয়জন সম্ভাষণের আনন্দে তা গ্রহণ করব। ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাঁদের দেওয়া উপদেশানুযায়ী ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করব।

পরিশেষে দেশবাসীর অন্তরের প্রার্থনার সঙ্গে আমার প্রার্থনাও যোগ করে দিলুম যে কবি সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে নতুন শক্তি নিয়ে আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসুন, তাঁর সঙ্গে দেশবাসীর আবার কল্যাণযোগ স্থাপিত হোক, বাংলা দেশ আবার কবির কাছে কল্যাণ ও মহত্ব লাভ করুক।

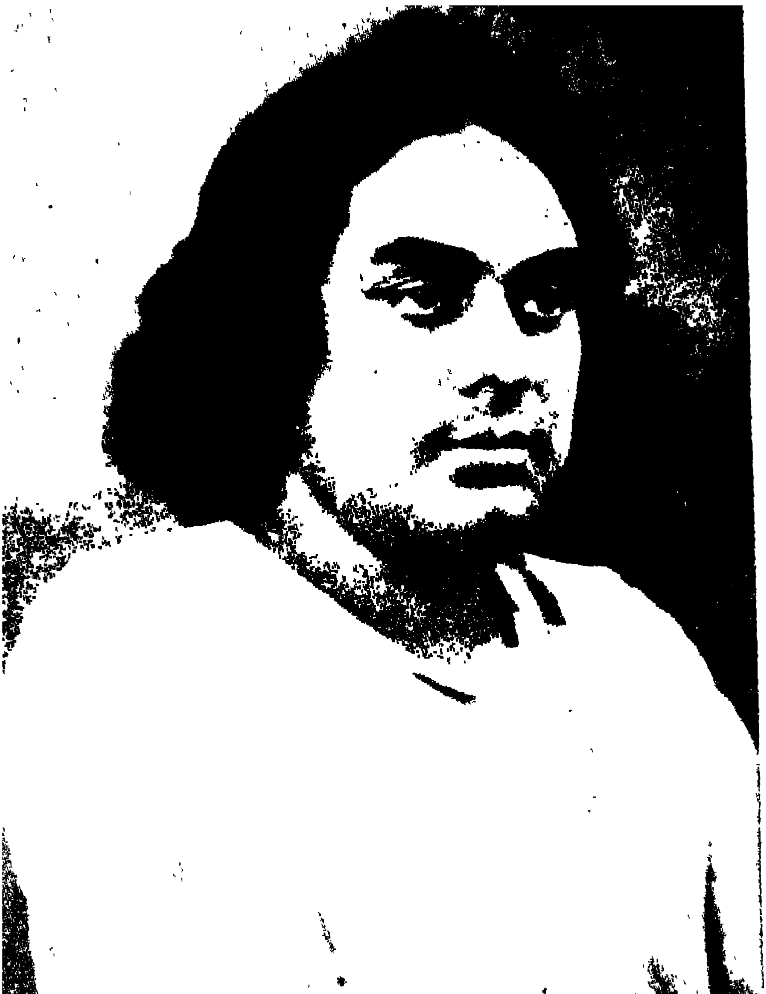
উদ্যতে নমঃ। উদায়তে নমঃ। উদিতায় নমঃ।
বিরাজে নমঃ। স্বরাজে নমঃ। সম্রাজে নমঃ॥

মীরবাজার
মেদিনীপুর
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

আজহারউদ্দীন খান্

সূচী

পরিশিষ্ট ঃ



কবি নজরুল ইসলাম

নজরুল-জীবনী

অখ্যাত জড়ত্বভাবে যে সাহিত্যের রাত্রি একদিন স্তব্ধ ছিল, বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তার স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে নতুন আলোকবন্যা এনেছিল, সেই আলোকধারায় কবি নজরুল ইসলাম 'একতারা যন্ত্রের একটানা সুরের' পরিবর্তন করে নতুন তার যোজনা করে বীণাযন্ত্রে তুলেছেন দীপক রাগিনীর ঝঙ্কার। রবিকরোজ্জ্বল বাংলা-সাহিত্যে বেণু-বীণা নিক্কণের মধ্যে শুনিয়েছেন বিপ্লবের তূর্যনিনাদ। অস্বাভাবিক কবিত্ব-সাধনার মধ্যে নিয়ে এলেন নিজ জীবনের অভিব্যক্তি। বাংলা-সাহিত্যে তিনি বিপ্লবের কবিরূপে প্রসিদ্ধ, বিদ্রোহের সুর তাঁর ভাবসাধনার প্রধান সুর। তাঁর সাহিত্য সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। পরাধীন দেশের দেশপ্রেমিক কবি পরাধীনতার যে জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন সেই জ্বালাকে তিনি অগ্নিক্ষরা ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। ফলে, তার বহু রচনার প্রকাশ ইংরেজ-সরকার কর্তৃক বন্ধ হয়। জীবনকে তিনি রঙীন কাচে দেখেন নি, বাস্তব জীবনের তাগিদকে তিনি বলিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ বাস্তব দৃষ্টিতে প্রতিফলিত করে স্বতন্ত্র একটা কবি-পরিচয় সৃষ্টি করেছেন। একাধারে সমাজসেবা এবং সাহিত্যসেবার সম্মিলন নজরুলের পূর্বে আর কোন সাহিত্যিক তেমন সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন নি। তাই কবি নজরুল ইসলাম নতুন যুগের নতুন কবি, নতুন গানের সূত্রধার। ওয়াল্ট হুইটম্যান কবিকে the leader of leader's আখ্যায় ভূষিত করেছেন, নজরুল হচ্ছেন এই আখ্যার যোগ্য প্রার্থী। কেননা তিনি এযুগের বাঙালীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন জড়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, বাঙালীর মনে নব আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করে। দীন অত্যাচারিতদের শরীক হয়ে, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনকর্তা হিসেবে। এই কবির কাব্যের তাৎপর্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত ঘটনাবহুল বিচিত্র জীবনের সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

নজরুলের পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল পাটনার অন্তর্গত হাজীপুরে। সম্রাট শাহ আমলের সময় তাঁরা হাজীপুর থেকে বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল

মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। এই চুরুলিয়া অতীতে ছিল রাজা নরোত্তম দাসের রাজধানী, বাঙলার অস্ত্রাদি নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র। অস্ত্রনির্মাণের স্থানগুলি আজও 'চুরুলিয়া গড' নামে খ্যাত এবং সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত। মোগল আমলে এখানে একটি প্রাচীন বিচারালয় ছিল এবং তার প্রমাণস্বরূপ প্রাচীন কাজীবংশ আজও এখানে বর্তমান। এই কাজীবংশ মোগল আমল হতে আয়মা সম্পত্তি ভোগ করে আসছেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম এই বংশেরই সন্তান।

ইতিহাসের এই লীলানিকেতনে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯৯ খৃঃ ২৪শে মে মঙ্গলবার কাজী নজরুল ইসলাম এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ, পিতামহের নাম কাজী আমিনুল্লাহ, মাতার নাম জাহেদা খাতুন, মাতামহের নাম মুন্সী তোফায়েল আলি। তাঁর পিতা দেখতে সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন, পিতার মত কবিও যৌবনে বলিষ্ঠ ও সুদর্শন ছিলেন।

কবির বাড়ীর পূর্বদিকে রাজা নরোত্তমের গড এবং দক্ষিণপার্শ্বে "পীর পুকুর" নামে একটি পুষ্করিণী—শোনা যায় হাজী পাহলোয়ান নামে একজন সাধক ঐ পুকুর খনন করিয়েছিলেন তাই তার নাম "পীর পুকুর"। এই পুষ্করিণীর পূবপারে সেই পীরসাহেবের সমাধিক্ষেত্র আর পশ্চিমপারে একটি ছোট্ট মসজিদ। কবির পিতা অবস্থার দুর্বিপাকে আজীবন এই মাজার শরীফ এবং মসজিদের সেবা ক'রে জীবননির্বাহ করতেন। রোজা নামাজ প্রভৃতি মুসলিমোচিত সাধন-প্রক্রিয়ায় তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা ও একাগ্র ঐকান্তিকতা থাকলেও সকল ধর্মের প্রতি তার অনুরাগ ছিল—নানা ধর্মের লোক তাঁর কাছে আনাগোনা করত। গরীব হলেও তাঁর অন্তঃকরণ খুব মহৎ ও ভদ্র ছিল। কোন হীন কাজে কোনদিনই তাঁর প্রবৃত্তি হত না। তাই আশেপাশের সকলেই তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করত। পিতার এই দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন নজরুল।

বাল্যকাল ঃ অন্ন-সংস্থান ও সাহিত্য-সাধনা

আজ 'নজরুল ইসলাম' নামটি শুনলে সাধারণ লোকের মনে একটা মূর্তি সহজে জাগে—উদ্ধত, নিয়মহারা বিদ্রোহী একটি মানুষের মূর্তি। কিন্তু নজরুলের

এই বিদ্রোহী মানুষটির জন্মের ইতিহাস যদি সন্ধান করি, তবে দেখব তার হয়েছিল নজরুলের নিতান্ত শৈশবে। পিতামাতার আর্থিক সঙ্গতি কিছু না থাকায় শৈশবে দুঃখদারিদ্র্যের জন্য এবং স্নেহমমতার অভাবে একটি বিদ্রোহীভাব জেগে উঠেছিল তার পূর্ণবিকাশ তাঁর পরবর্তী সাহিত্য ও জীবনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

কাজী ফকির আহমদ সাহেবের দুটি বিয়ে। তার মোট সাতপুত্র ও দু'কন্যা। নজরুলের সহোদর ভাইবোন বলতে তাঁরা তিন ভাই ও এক বোন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন, ভগিনী উম্মে কুলসুম। কাজী সাহেবজানের পর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর চারিপুত্রের অকালবিয়োগ হয়। তারপর নজরুলের জন্ম হয়। তাই তাঁর ডাকনাম রাখা হয় 'দুঃখু মিয়া'। অপরিসীম দুঃখের মধ্যে তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে, অন্তিমজীবনেও দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনাতিপাত করছেন। জীবন রণাঙ্গনে তাঁকে সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ফলে জীবনের নানাদিকের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি। শত অভাবে, শত দুঃখেও তাঁর মনোবল এতটুকু মাত্র কমেনি। তাই উত্তর জীবনে 'দারিদ্র্য' কবিতায় দারিদ্র্যেরই জয়গান গেয়েছেন তিনি—

: হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।—দিয়াছ, তাপস
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার।

(সিন্ধু-হিন্দোল)

শৈশবে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জীবনে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর লীলা আরম্ভ হল। তাঁর বয়স যখন আটবছর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয় (১৩১৪, ৭ই চৈত্র)। পরিবারের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুতে দারিদ্র্যের সংসারে এক চরম বিপর্যয় দেখা দিল। মৃত্যুকালে

স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের জন্যে তিনি কিছু রেখে যেতে পারেন নি। নজরুলের বিধবা মাতা ছোট ছেলেদের নিয়ে অকূল পাথারে পড়লেন, তাঁদের দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোটাই দুষ্কর হ'য়ে উঠল।

অতএব নজরুলের লেখাপড়া শেখবার কোন ভাল ব্যবস্থাই হয়নি, সারা শৈশব কেটেছে আর পাঁচটা বাঁধনহারা পল্লীবালকের মতো। ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত রঙ্গপ্রিয় ছিলেন, নির্দোষ হাসি-কৌতুকে তিনি সহজেই সকলের মন হরণ করতে পারতেন। আর তাঁর বুদ্ধিও ছিল খুব প্রখর। তাই সেই গ্রামের মক্তবের মৌলবী কাজী ফজলে আহমদ তাকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন। আরবী ফারসী ভাষায় মৌলবী সাহেবের জ্ঞান ছিল অগাধ; এঁরই কাছে নজরুলের আরবী-ফারসী শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। একবার নাকি সেই মক্তবে কয়েকজন পশ্চিমদেশীয় মৌলবী আসেন। বাঙালী ছেলের মুখে এমন নির্ভুল ও দ্রুত কোরাণপাঠ শুনে তারা অবাক হয়ে যান। দশবছর বয়সে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) তিনি গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করে সেই মক্তবে একবছর শিক্ষকতা করে সংসার চালিয়ে দেন। সে-সময় আশেপাশের পল্লীতে মোল্লাগিরি করেও দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা করেছিলেন; মাঝে মাঝে হাজী সাহেবের মাজার শরীফ ও মসজিদের সেবা করতেন। শোনা যায় এই সময় থেকেই কঠোর উপবাস নামাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তির চেষ্টা করতেন। পীরের খাদেম হয়েও তিনি ঐ বয়সেই রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ ভাগবত তন্ময়চিত্তে পড়তেন। কাছাকাছি যে সব সাধু সন্ত থাকতেন তাঁদের আস্তানায় গিয়ে সাধন-ভজন লক্ষ্য করতেন এবং সেগুলি তখন থেকেই নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে তিনি ফেরার হয়ে যেতেন, বাউল, সুফী, দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে কিছুদিন থেকে আবার বাড়ী ফিরতেন। চালচলনে উদাসীন দেখে প্রতিবেশীরা কবিকে ডাকত 'তারাক্ষ্যাপা' বলে এবং মাঝে মাঝে আদর করে 'নজরআলি' বলেও ডাকত। পরবর্তী জীবনে তিনি যে সব ভক্তিমূলক আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন এবং যোগীজীবন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল তার মূল হয়ত এইখানে।

অতি অল্পবয়সেই নজরুলের কবিত্ব শক্তির উন্মেষ হয়েছিল, সে কাহিনীও কম বিস্ময়কর নয়। তাঁর খুড়ো কাজী বজলে করিম একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন. তিনি কবিতা লেখালিখি করতেন। এঁরই কাছে নজরুলের উর্দু

ফারসী আরবী মিশ্রিত 'মুসলমানী বাংলা'য় কবিতা লেখার হাতে খড়ি হয়। কিন্তু পরিবারের দৈন্য দিন দিন বড় হয়ে ওঠায় লেখাপড়ার দিকে বেশী মনোযোগী হতে পারেনি নি। তাহলেও দারিদ্র্যদোষ তাঁর সহজাত কবিত্ব শক্তিকে নষ্ট করতে পারেনি। তাঁর সময়ে চুরুলিয়ায় অনেক পল্লীকবি ছিলেন, এঁদেরই সাহচর্যে তাঁর কবি প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। পল্লীকবিদের মধ্যে যাঁর নাম ডাক থাকত সবচেয়ে বেশী তাঁকে বলা হত 'গোদাকবি"। তখনকার দিনের কবিয়াল শেখ চাকুর গোদা নজরুলের উঠ্তি প্রতিভাকে পত্তনেই চিনেছিলেন; তিনি নজরুলকে ডাকতেন 'ব্যাঙাচি' বলে আর লোকজনের কাছে বলতেন, "এই ব্যাঙাচিই বড় হয়ে সাপ হবে।" তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী নজরুলের জীবনে সত্য হয়েছে। এই গোদাকবির একটি চালু 'লেটো' দল ছিল। পল্লীকবিরা পদ্যে নাটক রচনা করে নৃত্যগীত সহকারে যাত্রা-নাট্যের রূপ দিতেন; একে বলে 'লেটো নাচ'। কবিগানের সঙ্গে লেটো নাচে'র কিছুটা সাদৃশ্য আছে। লেটো গানে দরকার হয় দুটি দলের। প্রথমে একদল পালা অভিনয় ও গান গেয়ে অপরদলকে 'চাপান' অর্থাৎ প্রশ্ন করে। পরে আর এক পক্ষ প্রশ্নকারীকে পালা ও গানের ভিতর দিয়ে জবাব দেয় এবং পাল্টা প্রশ্ন করে। পরিবারের দৈন্যে পীড়িত হয়ে '১১।১২' বছর বয়সেই 'লেটো' দলে ভিড়ে গান-নাটক-প্রহসন লিখে আশে-পাশের পল্লীগ্রামে খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন—চুরুলিয়া, রাখাখুড়িয়া, নিমশাহ গ্রামের লোকেরা তাঁকে 'কবি' বলে স্বীকার করে নিল। এইসময়, তিনি নিমশাহ্ গ্রামের 'লেটো' দলের ওস্তাদের পদ প্রাপ্ত হন। 'লেটো'র ওস্তাদের শুধু কবিতা-গান বা নাটক রচনা করলেই কর্তব্যের শেষ হয় না, তাকে সঙ্গীতে সুর সংযোজন, নাটকাদি পরিচালনা ইত্যাদি সবই করতে হয়—এক কথায় জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত। অনেক সময় তাঁকে নিজের দলের হয়ে আসরে নেমে অংশ গ্রহণ করতে হত। কারণ বিপক্ষদলের পাল্টা প্রশ্নের উত্তর ছড়ার সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে দিতে হত। পাল্লার সময় প্রয়োজন হলে কবিকে স্বরচিত গান বা উর্দু গজল গেয়ে আসর জমাতে হত। পরবর্তীকালে নজরুল ফরমাসী রচনায় যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তার ভিত গড়ে উঠেছিল এই সময় থেকে। ঐ অল্পবয়সে (১৩।১৪ বছর বয়স) এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সকলের প্রিয় হয়ে ওঠেন। এই দলের ওস্তাদগিরি তিন-চার বছর করেছেন।

যখন তাঁর স্কুলে পড়ার সুমতি হল, 'লেটো' দল ছেড়ে দিলেন। তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে নিমশাহ র দল করুণ সুরে গেয়েছিলো। বোধকরি আজও গেয়ে থাকে—

ঃ আমরা এই অধীন, হয়েছি ওস্তাদহীন,
ভাবি তাই নিশিদিন, বিষাদ মনে।
... ...
নামেতে নজরুল ইসলাম, কি দিব গুণের প্রমাণ।

এই 'লেটো' দল নজরুলের ভবিষ্যৎ-কবি-জীবনকে নানাদিক দিয়ে প্রভাবিত করেছে। কথকরা যেমন পৌরাণিক উপমা, প্রবাদবাক্য, প্রচলিত গল্পগাথা দিয়ে বিষয়কে শ্রোতার সামনে উপস্থিত করেন তেমনি নজরুলের লেখাতেও এই পৌরাণিকী প্রতীক প্রচুর পরিমাণে এসেছে। যেখানে কথকতা, কীর্তন, যাত্রাগান মিলাদশরীফ হত সেখানে তিনি হাজিরা দিতেন।

'লেটো' দলে থেকে "চাষার সং", "রাজপুত্র" "শকুনিবধ' নামক কয়েকটি পালাগান তিনি রচনা করেন। সে-বয়সের লেখাগুলো অনেক হারিয়ে গেছে, কিছু কিছু আশে পাশের পল্লীগ্রাম থেকে পাওয়া যাচ্ছে: তার সে সময়কার অনেকগুলো গান আজও সেখানকার লোকের কণ্ঠে শোনা যায়। কৌতূহলী পাঠকের জন্যে তাঁর সে বয়সের রচনা থেকে দু'একটি নমুনা নীচে দিলুম—

ঃ চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এ'তে।
নামাজে জমি উগালে,
রোজাতে জমি সামলে,
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে এই ভবেতে।

লা-ইলাহা ইল্লিলাতে
বীজ ফেলা তুই বিধিমতে
পাবি ঈমান ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে।

নয়টি নালা আছে তাহার
ওজুর পানি সিয়াত ইহার
ফলে পানি নানা প্রকার
ফসল জন্মিবে তাহাতে।

যদি ভাল হয়েছে জমি,
হজ জাকাত লাগাও তুমি,
আর সুখে থাকবে তুমি,
কয় নজরুল ইসলামেতে।

(চাষার সং)

ঃ চল ওহে মন্ত্রীসুত স্বরাজ্যে ফিরে
ঈশ্বরের অপার মহিমা দেখি নাই দেশ-দেশান্তরে।
অসংখ্য গ্রাম নগরাদি,
দুর্গগুহা পর্বত আদি, কত নদনদী,
দেখিলাম কিন্তু নিরবধি স্বদেশ জাগিছে অন্তরে।

(রাজপুত্র)

ঃ নজরুল ইসলাম বলে কর ভাই বন্দেগী,
খোয়াইওনা আজন্ম গোণাতে জিন্দেগী—
শারমেন্দাগী হবে হাশরের মাঝে।

ঃ বুঝলাম নাথ এতদিনে যুবকের ছলনা হে।
কোথা শিখিলে এ প্রণয় আমারে বলনা হে॥
তোমার হিয়া কঠিন অতি
জাননা শ্যাম প্রেমের রীতি
তাই নিভালে প্রণয় বাতি
আর বাতি জেল না হে।

এইরূপে কত কামিনী
মজায়েছেন গুণমণি
কপাল দোষে বিরহিনী
তোমার আর হল না হে।
বিরহ জ্বালায় মরিলাম
আর জ্বালায়োনা বাঁকা-শ্যাম
ভেবে বলে নজরুল ইসলাম
মের না সলনা হে।

ঃ মেরা দিল বেতাব কিয়া তেরা আব্রু-য়ে-কামান ;
জ্বলা যাতা হ্যায় ইশ্‌ক্‌-মে জান্ পেরেশান্।
হেরে তোমায় ধনী
চন্দ্র কলঙ্কিনী
মরি কী যেন বদনের শোভা, মাতোয়ারা প্রাণ।
বুলবুল করতে এসেছে তাই মধু পান॥

ঃ রব না কৈলাসপুরে
আই এ্যাম ক্যালকাটা গোইং।
যত সব ইংলিশ ফেসেন,
আহা মরি কি লাইটনিং॥

ইংলিশ ফেসেন সবি তার
মরি কি সুন্দর বাহার!
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার
কামন্ ডিয়ার গুডমর্ণিং॥

বন্ধু আসিলে পরে
হাসিয়া হ্যাণ্ডসেক করে
বসায় তারে রেসপেক্ট ক'রে
হোল্ডিং আউট এ মিটিং॥

তারপর বন্ধু মিলে
ড্রিঙ্কিং হয় কৌতূহলে
খেয়েছে সব জাতিকূলে
নজরুল ইসলাম ইজ টেলিং ॥

পরবর্তীকালে কবি শ্যামাসঙ্গীত, ইসলামী সঙ্গীত, প্রেমের গান, হাসির গান, বন্ধনমুক্তির জয়গান গেয়েছিলেন তারই স্ফুরণ দেখতে পাই ওপরের উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে। বলা অনাবশ্যক যে নিছক সাহিত্যের দিক থেকে এসবের আজ আর সমালোচনা করা যেতে পারে না। তবে প্রতিভার ধর্ম হল বৈচিত্র্য, এই বৈচিত্র্য তার বাল্যরচনায় লক্ষ্য করা যায়।

বাল্যকালে তিনি অসম্ভব ধরণের দুরন্ত ছিলেন। কারুর বাগানের ফল একবার চোখে পড়লে আর তা গাছে থাকত না, পুকুরে মাছ বড় হত না, ক্ষেতের ফসল বাড়তে পেত না। এই দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হয়ে পাড়াপড়শীরা রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজস্কুলে তাঁর পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। কয়েক মাস পরে সেখান থেকে তিনি যান মাথরুণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। নজরুলের সে-সময়কার ছাত্র-জীবন কিছু জানবার জন্যে কুমুদবাবুকে আমি চিঠি লিখি। চিঠির উত্তরে তিনি লিখে পাঠান—"আমি ২৩ বৎসর বয়সে মাথরুণ উচ্চ ইংরাজী স্কুলে শিক্ষক হিসাবে ঢুকি।…নজরুল কলিকাতায় আমাকে জানায় যে সে আমার স্কুলের ছাত্র এবং ভক্তিভরে প্রণাম করে। আমি শুনিয়া আনন্দিত হই ও গৌরব বোধ করি। তখনকার দিনে 6th Classএ নজরুল পড়িত। ছোট সুন্দর ছনছনে ছেলেটি, আমি ক্লাস পরিদর্শন করিতে গেলে সে আগেই আসিয়া প্রণাম করিত। আমি হাসিয়া তাহাকে আদর করিতাম। সে বড় লাজুক ছিল, হেডমাস্টারকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত দেখিত: ছোট ছেলে কাছে আসিতে সাহসী হইত না, সে নিজেই আমাকে একথা বলিয়াছে। শিশুকালেই তাহার ব্যবহার ও কথা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্লাসের ছেলেরাও সকলে তাহাকে ভালবাসিত। সে স্কুলে বেশীদিন ছিল না, বোধহয় 4th Class (Class VII)-এ উঠার আগে কি পরে অন্যত্র যায়।"

এই বাঁধা-ধরা রুটিন ছকে লেখাপড়ায় নজরুলের বড় একটা মনোযোগ ছিল না। তিনি ছিলেন চিরদিনই স্বাধীনতা প্রয়াসী। জানবার আগ্রহ তাঁর পুরোমাত্রায় ছিল, পড়বার ক্ষুধাও ছিল কিন্তু স্কুলের নীরস পঠন-পদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। তবে মনের মত বই পেলে তা তিনি শেষ না করে ছাড়তেন না। স্কুল থেকে পালানো তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিছল—ঐ 'লেটো' দলে ভিড়ে শুধু গানই লিখতেন, নয়তো দামাল ছেলেদের সঙ্গে মিশে সারা দুপুর টো। টো। করে বেড়িয়েছেন।

চুরুলিয়া এলাকায় সব বছর সমান ধান হয় না—দুবৎসর লেগেই থাকে। চাষীর হাতে টাকা না থাকলে পালা গান করাবে কে। ওদিকে সংসারের অভাবও তীব্র হয়ে উঠেছে। 'লেটো' দল ছেড়ে কাউকে না বলে পালিয়ে গেলেন রাণীগঞ্জে (১৩১৭ বঙ্গাব্দ); কিছুদিন রেলওয়ে গার্ডসাহেবের বাবুর্চি হয়ে থাকলেন। তারপর চলে এলেন আসানসোলে। অপরিচিত জায়গায় গ্রামের ছেলে কী আর করেন—স্টেশনের কাছেই পাঁচ টাকা বেতনে এক রুটির দোকানে কাজ পেলেন। রুটির দোকানে তাঁর কাজ ছিল ভোরবেলায় রুটির জন্যে ময়দা মাখানো আর দোকানে বসে দিনের বেলা রুটি তৈরী করা ও বিক্রী করা। রাত্রে যা একটু অবসর পেতেন তাতেই গান কবিতা লিখতেন আর সুর করে পুঁথি পড়তেন। যন্ত্রসঙ্গীতে তিনি ইতিপূর্বেই দক্ষতা লাভ করেছিলেন লেটো' দলের সঙ্গে ভিড়ে; হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশী বাজিয়ে দোকানের খদ্দেরদের আকৃষ্ট করতেন। এই গীতালাপের সূত্রে ভাগ্যক্রমে আসানসোলের তৎকালীন পুলিশ সাব ইন্‌স্পেক্টর রফিকউদ্দীনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। নজরুলের গান শুনে গুণগ্রাহী রফিকউদ্দীন সাহেব বুঝতে পারলেন যে এই বালকের মধ্যে প্রতিভার বীজ সুপ্ত রয়েছে; উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটলে একজন শ্রেষ্ঠ কবি হয়ে উঠতে পারে। কাজী সাহেব নজরুলকে নিয়ে গেলেন তাঁর স্বদেশ ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজীর-সিমলা গ্রামে। সেখানকার দরিরামপুর হাইস্কুলে ফ্রি ছাত্ররূপে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন (১৩১৯)। স্কুলের বদ্ধ আবেষ্টনী সেবারও নজরুলকে বেঁধে রাখতে পারল না। স্কুলে যাবার নাম করে রোজই লক্ষ্মীছেলের মত বই খাতা পেন্সিল নিয়ে বেরুতেন কিন্তু স্কুলে যেতেন না। কাজীর-সিমলা থেকে স্কুল ছিল মাইল পাঁচেকের পথ। স্কুলে যাবার মাঝপথে ছিল এক প্রকাণ্ড বটগাছ।

তাতে হুঁকো-কল্কে ঝুলানো থাকত আর বাকী উপকরণ থাকত তাঁর পকেটে; রাখাল বালকদের সঙ্গে ধুমপান চলত অবাধে। কোন কোন দিন সারা দুপুর ধরে চলতো নদীতে মাছ ধরা কিংবা লোকের ফসল নষ্ট করে বেড়ানো। মাঝে মাঝে স্কুলে গেলেও পড়াশুনা কিছুই করতেন না, সহপাঠীদের সঙ্গে দুষ্টুমী করতেন নইলে ক্লাসে গোলমাল করতেন। স্কুল ছুটির পর যখন ছেলেরা বাড়ী ফিরতো সেই সময় তিনিও সুশীল বালকের মতো বাড়ী ফিরতেন। বাৎসরিক পরীক্ষা এল—বাংলা রচনা লিখলেন পদ্যে; পরীক্ষক তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় পেযে অবাক হলেন। বাংলার স্যার তারিফ করলেন বটে, কিন্তু আর সব সাবজেক্টে লবডঙ্কা! প্রমোশন হল না। এমনি করে একটা বছর গেল কেটে।

নজরুল অত্যন্ত অব্যবস্থিত চিত্তের লোক, কোন কিছুতেই বেশীদিন লেগে থাকা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাই ১৩২০তে নিজের দেশে ফিরে এসে 'লেটো' দলে যোগ দিলেন। কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর লেখাপড়ায় মতি ফিরল। আবার রাণীগঞ্জের সিযারসোল রাজস্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে (থার্ডক্লাস) ভর্তি হলেন (১৩২০)। লেখাপড়ায উদাসীন হলেও তিনি মেধাবী ছাত্র। এজন্যে সিযারসোলেব রাজা স্কুলের মাইনে, হোস্টেল ফ্রি করে দেন এবং রাজকোষ থেকে ৭৲ টাকা বৃত্তিরও ব্যবস্থা করে দেন। এই সমযকার বন্ধু হচ্ছেন কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যয। তিনি পড়তেন রাণীগঞ্জ হাইস্কুলে আর লিখতেন কবিতা, নজরুল পড়তেন সিযারসোল রাজস্কুলে, লিখতেন গল্প। হঠাৎ যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল পাশ্চাত্ত্যে। নজরুল তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র, প্রি-টেষ্ট দিচ্ছেন, বযসমাত্র সতের বছর। শহরে গাঁয়ে চলেছে তখন সৈন্যসংগ্রহের তোড়জোড়। এদিকে সংসারের অভাব-অনটন তখন তাঁকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে, অপরদিকে দেশের নেতৃবৃন্দ বাঙলার যুবকদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হবার জন্যে যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানাচ্ছেন। তাই ১৩২০ বঙ্গাব্দে (১৯১৭ খৃঃ) ৪৯নং "বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে" যোগ দিয়ে চলে গেলেন সুদূর করাচী। যুদ্ধে যাবার পর থেকে তাঁর জীবনের নতুন পব উন্মোচিত হল।

নতুন জীবন: সৈনিক থেকে মৈনাক

বস্তুতঃপক্ষে সৈনিক জীবনের পর হতেই নজরুলের কবি-জীবন আরম্ভ হয়। নজরুলের সৈনিক জীবন (১৯১৭-১৯১৯) কেটেছে করাচী সেনানিবাসে।

তাঁর রণাঙ্গণের চিত্তচাঞ্চল্যকর লেখা পড়ে আমাদের একটা ধারণা ছিল যে কবি মধ্যপ্রাচ্যে গেছ্লেন। কিন্তু তাঁর সৈনিক জীবনের সহযোগীদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, কবি করাচীর বাইরে আর কোথাও যাননি। পেশওয়ার, নওশেরা, বেলুচিস্তানে গিযে ট্রেনিং মাঝে মাঝে নিতে হত আর যেসব সৈন্য পালিয়ে যেত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হত। ৪৯নং বাঙালী রেজিমেণ্টের হেড কোয়ার্টার ছিল করাচী শহরের পূর্ব উপকণ্ঠে বর্তমানে "আবিসিনিয়া লাইনে" যা সে-সময় "গানজা লাইন" নামে পবিচিত ছিল। সৈন্য বিভাগে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিযে সামান্য সৈনিক থেকে 'হাবিলদার' পদে উন্নীত হন এবং কোয়াটার-মাস্টাব হাবিলদার রূপে সৈন্যদলের রসদভাণ্ডারের তত্ত্বাবধানের ভার পেযেছিলেন। সেনাদলেব মধ্যে তিনি ছিলেন খুব জনপ্রিয়—গান আবৃত্তি করে সকলের মন তাজা রাখতেন। এমন কি, সেনাদল ভেঙে দেবার পরও বহু সৈনিক এসে তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কবতেন। এক একদিন 'মুসলমান সাহিত্য সমিতির' অফিস একেবারে ভর্তি হযে যেত।

সেনানিবাসেও নজরুল কাব্য-চর্চা ও জ্ঞানালোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন। করাচী সেনা-নিবাসে একটি মৌলবী সাহেবের সংস্পর্শে এসে পারস্যকবিদেব সমস্ত কাব্য পড়বাব সুযোগ পান। "রুবাইযাৎ-ই-হাফিজ' নামক অনুবাদ-কাব্যের 'মুখবন্ধে' তিনি লিখেছেন, "আমি তখন স্কুল পালিযে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরিজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমাব হাফিজের সাথে পরিচয হয। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন। তাঁব কাছে ক্রমে ফারসী কবিদের প্রায সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।" সেনানিবাসে থাকতে থাকতেই "দীওয়ান-ই-হাফিজে"র কিছু বাংলা অনুবাদ করেছিলেন পরে দেশে এসে আরও কতকগুলি অনুবাদ করে পুস্তকাকারে "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ" (আষাঢ় ১৩৩৭) প্রকাশিত করেন। "রিক্তের বেদন" গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি 'আরব সাগরের বিজন বেলা'য় বসে লেখা।

গান গল্প কবিতা এ সময অজস্রধারায তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়ে আসে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাঙলায যে-সব লেখা পাঠাতেন, সেগুলিতে লেখা থাকত—হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। মৌলবী নাসিরউদ্দীনের

'সওগাত' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) "বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী" নামে একটি কাহিনী লিখেছিলেন। এ গল্পে তাঁর জীবনের ছাপ অনেকখানি পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প এটি, তাই এটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে যথেষ্ট। এই গল্পের প্রারম্ভে বন্ধনীর মধ্যে লেখা আছে—

[বাঙালী পল্টনের একটি বওয়াটে যুবক আমার কাছে তাহার কাহিনী বলিযাছিল নেশার ঝোঁকে, নীচে তাহাই লেখা হইল ; সে বোগদাদে গিয়া মারা পড়ে।]

তারপর আরম্ভ—

কি ভাযা! নিতান্তই ছাড়বে না? একদম এঁটেল মাটির মত লেগে থাকবে? আরে, ছোঃ! তুমি যে দেখ্‌ছি চিটে গুড়ের চেয়েও চামচিটেল! তুমি যদিও হচ্ছ আমার এক গ্লাসের ইয়ার, তবুও সত্য বল্‌তে কি, আমার সেসব কথাগুলো বলতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। কারণ খোদা আমায পয়দা করবার সময মস্ত একটা গলদ করে বসেছিলেন, কেননা চামড়াটা আমাব ক'রেছিলেন হাতীব চেযেও পুরু আর প্রাণটাও করে দিলেন কাদাব চেযেও নরম! আর কাজেই দু'চারজন মজুর লাগিযে আমার এই চামড়ায মুগুর বসালেও আমি গোঁপে তা দিযে বলব, "কুচ্ পরওযা নেই," কিন্তু আমার এই 'নাজোক জানটা'য় একটু আঁচড় লাগলেই ছোট্ট মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠবো। তোমার 'বিরাশী দশ আনা' ওজনের কিলগুলো আমাব এই স্থূল চর্মে স্রেফ্ আরাম দেওযা ভিন্ন আর কোনো ফলোৎপাদন করতে পারে না, কিন্তু যখনই পাকড়ে বস, 'ভাই, তোমার সকল কথা খুলে বলতে হবে," তখন আমার অন্তরাত্মা ধুক্‌ধুক্ ক'রে ওঠে,—পৃথিবী ঘোরার ভৌগলিক সত্যটা তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। চক্ষেও যে সর্ষপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হ'তে পারে বা জোনাকী পোকা জ্বলে' উঠ্‌তে পারে, তা আমার মত এই রকম শোচনীয় অবস্থায় পড়লে তুমিও অস্বীকার করবে না। (রিক্তের বেদন

এই 'সওগাত' পত্রিকায় পরে তাঁর বহু নামকরা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

১৩২৬-এর 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র (ত্রৈমাসিক) শ্রাবণ সংখ্যায় মুক্তক স্বরবৃত্তছন্দে লিখিত "মুক্তি" নামক কবিতাটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত কবিতা হিসেবে প্রথম কয়েক ছত্র নিয়ে তুলে দিলুম—

: রানীগঞ্জের অর্জুনপটির বাঁকে
সেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে
রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহুরে বৌ কলস কাঁখে—
সেই সে বাঁকের শেষে
তিন দিক হতে তিনটে রাস্তা এসে'
ত্রিবেণীর ত্রিধারার মত গেছে একেই মিশে'
তেপথার সেই 'দেখা শুনা' স্থলে
বিরাট একটা নিম গাছের তলে,
জটওয়ালা সে সন্ন্যাসীদের জটলা বাঁধ্‌ত সেথা,
গাঁজার ধূঁয়ায পথের লোকের আঁতে হোত বেথা…

ইত্যাদি

এই কবিতাটির ফুটনোটে লেখা ছিল—'ইহা সত্য ঘটনা'। ঐ বছরের কার্তিক ও মাঘ সংখ্যায যথাক্রমে "হেনা" ও "ব্যথার দান" গল্প বেরোয। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোজাম্মেল হক আর কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ছিলেন ঐ পত্রিকার অন্যতম পরিচালক। তিনি তখন নজরুলের লেখার মধ্যে বলিষ্ঠতা ও প্রতিভার পরিচয় পেযে তাঁকে আন্তরিক উৎসাহ দিয়ে যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তাতেই উভযের মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

করাচী থেকে 'সবুজপত্রে' নজরুল একটি কবিতা পাঠান; সেটি প্রমথ চৌধুরীর পছন্দ হল না। বাংলা-সাহিত্যের অজাতশত্রু সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায তখন কাজ করতেন 'সবুজপত্রে'। তিনি সেটি নিয়ে যান 'প্রবাসী'তে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায সম্পাদনার কাজ দেখাশুনা করতেন। তিনি কবিতাটি পড়েই 'প্রবাসী'র পৌষ (১৩২৬) সংখ্যাতেই ছাপিয়ে দেন। কবিতাটি হাফেজের একটি রুবাইয়াতে'র অনুবাদ—

আশায়

(হাফেজ)

নাই বা পেল নাগাল, শুধু সৌরভেরই আশে
অবুজ সবুজ দূর্বা যেমন জুঁই কুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে, তেমনি বিভোর থাক রে প্রিয়ার আশায়,
তার অলকের একটু সুবাস পশ্‌বে তোর ও নাশায়।
বরষ শেষে একটি বারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবে রে তোরও প্রাণে অমনি অবুঝ হরষ!

এইভাবে পবিত্রবাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে পরস্পরের গভীর ভালবাসা জন্মে। এসময় জেনে রাখা ভাল যে কবিতার চেয়ে নজরুলের গল্পগুলি অধিকতর জনপ্রিয় ছিল।

নজরুল যে বাহিনীতে ছিলেন সেটি যুদ্ধের পর ভেঙ্গে দেওয়া হোল (১৩২৬, মাঘ-ফাল্গুন : ১৯১৯ মার্চ-এপ্রিল)। তিনি চুরুলিয়ায় মায়ের সঙ্গে দেখা করে কলকাতায় এলেন। আগে থেকেই কথা ছিল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাদুড়বাগান মেসে গিয়ে উঠবেন। শৈলজানন্দ হাওড়া স্টেশন থেকে তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁদের মেসে। দিনের বেলা সবাইয়ের সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার করার পর মেসের বন্ধুরা আবিষ্কার করিলেন যে নজরুল ইসলাম মুসলমান। দুজনকেই মেস থেকে তাঁরা তাড়িয়ে দিলেন। শৈলজানন্দ গিয়ে উঠলেন দাদামশায়ের বাড়ীতে আর নজরুল এলেন মুজফ্‌ফর সাহেবের আস্তানায়। তখন মুজফ্‌ফর সাহেব থাকতেন 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার কর্ণধার আফজল-উল-হকের সঙ্গে ৩২নং কলেজ স্ট্রীটের দোতালায়। এটি 'মোসলেম ভারত' ও 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র কার্যালয় ছিল।

অন্নসংস্থানার্থে 'সাবরেজিষ্টার' পদের জন্যে তিনি দরখাস্ত দিলেন। যথা-সময়ে ইণ্টারভিউ-লেটার এল। কিন্তু মুজফ্‌ফর আহমদপ্রমুখ বন্ধুরা তাঁকে সরকারী চাকরী করতে নিষেধ করলেন। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সঙ্কল্প তখন তাঁরা সকলেই দেখছেন। দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে দিকে দিকে প্রস্তুতি চলছে। এসময় সরকারের গোলামী না করে তরুণদের নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লে কাজ হবে আর তাঁর মতো কবি যদি দূর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে দলীল রেজেষ্ট্রির কাজ করেন তাহলে তাঁর সমস্ত

সাহিত্যিক সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই নজরুল নির্ভয়ে থাকতে লাগলেন মুজফ্‌ফর সাহেবের সঙ্গে। এই ডেরাতে কবিকে কেন্দ্র করে একটা আড্ডা জমে উঠল। এখানে আসতেন শৈলজানন্দ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, গোলাম মোস্তাফা, কাজী আব্দুল ওদুদ, মুজফ্‌ফর আহমদ, মোজাম্মেল হক, সাহাদৎ হোসেন, হেমেন্দ্রলাল রায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ প্রভৃতি পরিচিত অপরিচিত যুবক। এই আড্ডায় নজরুলই ছিলেন একাই একশো—গুরুগম্ভীর সিংহনাদের মত তাঁর বজ্রকণ্ঠ, উচ্চগ্রামে প্রাণখোলা শিশুর মত সরল হাসি পাড়াশুদ্ধ সবাইকে সচকিত করে জানিয়ে দিত যে নজরুল রয়েছেন। এছাড়া আরও দুটি আড্ডা ছিল। এক হোল "ভারতীর আড্ডা," দ্বিতীয় হোল "গজেনদার আড্ডা"। সন্ধ্যায় গজেনদার আড্ডায় 'ভারতী'র আড্ডাধারীরা যথা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতি জমায়েত হতেন। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পেতেন না, 'নবযুগের' জন্যে তাঁকে তাড়াতাড়ি উঠে আসতে হত। বন্ধুরা অত তাড়া পছন্দ করতেন না, কবি হাসতে হাসতে বলতেন—"ওঠ কবি সৈনিক, 'নবযুগ' দৈনিক'। নজরুল এই আড্ডায় এসে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেন। তাঁর যে খুব সুকণ্ঠ ছিল তা নয়, কিন্তু দরাজ গলায় দরদ মিশিয়ে এমনভাবে গাইতেন, তখন সুর-বিচারের কোন প্রশ্নই উঠত না। এসময় প্রায়ই তাঁর কণ্ঠে স্বরচিত দুটি গান শোনা যেত—'পথিক ওগো চলতে পথে তোমায় আমায় পথের দেখা,' (নারায়ণ: মাঘ ১৩২৭-এ প্রকাশিত চৈত্র সংখ্যায় মোহিনী সেনগুপ্ত উক্ত গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন।) 'কোন্‌ সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক শুনেছিস ওরে আমার চখা' (ভারতী: বৈশাখ ১৩২৮-এ প্রকাশিত)। এ দুটি গানে রবীন্দ্র প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

গজেনদার আড্ডাতে নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের পরিচয় হয়—এ তথ্যটি পরিবেশন করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' বইয়ে। কিন্তু খবরটি ভুল। একদিন কবি করুণানিধানের বাসায় মোহিতলাল 'মোসলেম ভারতে'র কয়েকটি সংখ্যা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে নজরুল ইসলামের 'নিকটে' কবিতার 'রিমঝিমিয়ে' এর সঙ্গে 'শিঞ্জিনী যে' মিল দেখে কবির প্রতি আকৃষ্ট হন। বাংলা-সাহিত্যে কবিকে আমন্ত্রণ

জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দেন। দীর্ঘ চিঠি পড়ে উৎসাহিত হয়ে নজরুল মোহিতলালের বাসায় এসে উপস্থিত হন এবং সেই থেকে তাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় আরম্ভ হয়। মোহিতলাল তখন তরুণ-কবিদের প্রিয় কবি। তাঁর কাব্যে যৌবনের চিরন্তন বাণী ধ্বনিত হয়েছে। নজরুলের মধ্যে যৌবনের বাঁধ-ভাঙা শক্তির সাধনা দেখে তিনি তাঁকে হট্টগোল থেকে আত্মস্থ হবার সাধনা করতে উপদেশ দিলেন। মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হল। তাঁর কবিতা তিনি যত্রতত্র আবৃত্তি করতেন। তাঁকে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি তাঁর সদ্যপ্রকাশিত কবিতার আলোচনা করতেন বিভিন্ন পত্রিকায়। 'মোসলেম ভারত'-এর ভাদ্র (১৩২৭) সংখ্যায় তিনি লিখেছেন—

"কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গালা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ ঝঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ-ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে: যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কাব্যভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকৃতি ও হৃদয়স্পন্দনের সহচর না হইয়া ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণ প্রীতিকর প্রাণহীন চারুচাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানবকণ্ঠের স্বর-সপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাহা স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী।"

কিন্তু কিছুদিন পরেই বিরোধ দেখা দিল। ১৩২১, পৌষ সংখ্যার 'মানসী' পত্রিকায় মোহিতলালের "আমি" নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই "আমি'র সুর নিয়েই "বিদ্রোহী" কবিতার সৃষ্টি, যদিও দু'জনের মানসধর্মের পার্থক্য রয়েছে; "আমি"র মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ আর "বিদ্রোহী"র সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা। অথচ কাজী এই ঋণ প্রকাশ্যে স্বীকার করেন নি। অভিমানী মোহিতলাল একটু ক্ষুণ্ণ হলেও বিচ্ছেদ তখনও আসন্ন হয়ে ওঠেনি। ১৩৩১, ১০ই শ্রাবণ থেকে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠির' জন্ম হয়। পরে "চিঠি" সাপ্তাহিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত হয়। এই

পত্রিকা তৎকালীন প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও নবীন সাধকদের নিয়ে যা তা মন্তব্য করতে আরম্ভ করে। নজরুল তখন সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ছিদ্রান্বেষী সাহিত্যব্যবসায়ীদের বুক হিংসায় জ্বলে উঠল। তাঁরা কাজীর কবিতা ও চরিত্রের ওপর কালি ঢালতে শুরু করলেন। মোহিতলাল তখন 'শনিবারের চিঠি'র পাণ্ডা হয়েছেন। 'কল্লোল', 'কালি-কলম' প্রভৃতি আধুনিক দলের বিরুদ্ধে কাগজে কলম চালাতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর সঙ্গে কাজীর তেমন দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। তরুণের দল কাজীকে ঘিরে রয়েছে—মোহিতলাল বরাবরই জনতার কাছ থেকে দূরে রয়েছেন। হৈ-হল্লা ইত্যাদি তিনি পছন্দ করেন না। কাজেই কাজীর আড্ডায় তিনি পারতপক্ষে যান না। মোহিতলালের বিশুদ্ধ সাহিত্য-চেতনা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসময় অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কয়েকজন তরুণ মিলিত হয়ে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশ করেন (২৬শে জুলাই ১৯২৪)। মোহিতলাল তখনও এ-পত্রিকার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন নি। নজরুলই ছিলেন এ পত্রিকার প্রধান টারগেট। সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতির' দ্বিতীয় খণ্ডে এ সম্পর্কে বলেছেন—

> "নজরুলকে 'শনিবারের চিঠি' কম গালি দেয় নাই, সত্য কথা বলিতে গেলে 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকাল হইতেই সাহিত্যের ব্যবসায়ে একমাত্র নজরুলকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম উদ্যোক্তারা তাক করিতেন। তখন আমি আসিয়া জুটি নাই। অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত এলাইয়া পড়িলে ওই নজরুলী রন্ধ্র-পথেই আমি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলাম।"

'শনিবারের চিঠি'তে কাজীর "বিদ্রোহী" কবিতাকে ব্যঙ্গ করে বেনামে সজনীকান্ত দাসের "ব্যাঙ" কবিতা বেরুল। তরুণের দল কবিতাটিকে মোহিতলালের রচনা বলে মনে করল। কাজীও তাই মনে করলেন। ফলে মোহিতলালকে লক্ষ্য করে "সাবধানী ঘণ্টা' কবিতাটি ১৩২১-এর কার্তিকের 'কল্লোলে' তিনি লেখেন। মোহিতলাল এই কবিতাটি পড়েই ক্রুদ্ধ হন এবং প্রত্যুত্তরে "দ্রোণ-গুরু" কবিতাটি লেখেন। মোহিত-নজরুলের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল এবং যার জন্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তা কাজীর তরুণ বন্ধুদের ভুল বুঝবার ও বোঝাবার ফলে। মোহিতলাল সজনীকান্তের

মতো ছ্যাবলামি কবিতা লিখতেন না। তিনি কবি-সাহিত্যিকদের রচনার বিচার করতেন সাহিত্যমান দিয়েই। যখন নজরুলের "বারাঙ্গনা" কবিতা 'লাঙলে' বেরোয় তখন 'চিঠি'তে সজনীকান্ত 'সংবাদ-সাহিত্য' পর্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে কবি-চরিত্রে বক্র ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু মোহিতলাল সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি দিয়ে সে কবিতাটির আলোচনা করেছিলেন। পাঠকের অবগতির জন্যে সেই আলোচনার কিয়দংশ তুলে দিলুম—

"সম্প্রতি একটি কবিতায় নব-সাম্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই কবিতাটি নাকি কবির একটি উৎকৃষ্ট কীর্তি। ইহাতে একপ্রকার nihilism বা নাস্তিক্যনীতির উল্লাস আছে—ইহা বর্তমান যুগের রসপিপাসু পাঠক-পাঠিকার বড়ই আদরের সামগ্রী। কবিতাটির যতটুকু মনে আছে, তাহাতে ইহাই কবির বক্তব্য বলিয়া মনে হয় যে, জগতে সকলেই অসাধু, সকলেই ভণ্ড, চোর এবং কামুক; অতএব জাতিভেদের প্রয়োজন নাই; আইস, আমরা সকল ভেদাভেদ দূর করিয়া মহানন্দে নৃত্য করি। এই সাম্য-মৈত্রীর আবেগে কবি বেশ্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'কে বলে তুমি বারাঙ্গনা মা?' বিদ্রোহের চরম হইল বটে, কিন্তু কথাটা দাঁড়াইল কি? এই উক্তিতে সমস্ত নারীজাতিকে অপমান করা হইয়াছে, অথচ বেশ্যার মর্যাদাও এতটুকু বাড়ে নাই। বারাঙ্গনা 'মা' নয়, বারাঙ্গনা নারী বটে; তাহার সেই সুপ্ত নারীত্বের মহিমা রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতায় অপরূপ কাব্যসৃষ্টি করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও নারী মাত্রেই এই মহিমা বাস্তবচিত্রে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বারাঙ্গনাকে 'মা' বলিতে আপত্তি নাই—যদি নারীর মাতৃত্ব ব্যতীত আর সকল সম্পর্ক অস্বীকার করা হয়; এইজন্য বারাঙ্গনাকে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃ-সম্বোধন অতিশয় সত্য ও সার্থক হইয়াছিল। নতুবা কবি-প্রচারিত নব-সাম্যবাদ অনুসারে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে—তুমিও বারাঙ্গনা, মা-ও বারাঙ্গনা, অতএব মা-তে ও তোমাতে কোনো প্রভেদ নাই। এ ব্যাখ্যায় বেশীদূর অগ্রসর হইতে হইলে অন্তরাত্মা কলুষিত হয়, কিন্তু এই কবিতাটি 'তরুণ'দের বড় ভাল লাগিয়াছে। এই যে মনোভাব ইহা কেবল সমাজবিদ্রোহ নয়, ইহা মানুষের মনুষ্যত্ববিরোধী। ইহা সাহিত্য হইতে পারে না, কারণ, ইহা বলবান্ মনুষ্যহৃদয়ের অভিব্যক্তি নয়; যে

প্রজ্ঞার বলে পরিকল্পনার সৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পায় সেই প্রজ্ঞা বা শক্তি এখানে একেবারেই নাই। ইহা অলস অবশ মাংসপিণ্ডের আক্ষেপ, রিপুর তাড়না—ইহারই নাম বিদ্রোহ-ঘোষণা।" (সাহিত্যের আদর্শ: শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৩৪)

তবু নজরুলকে মোহিতলাল আজীবন ভালবেসেছেন। তিনি তাঁর ভক্ত-শিষ্য অনুরাগী বন্ধুদের কাছে কাজীর কবিতার অনেক প্রশংসা করেছেন। তাঁর কবিতা তিনি মৃত্যুর পূব পযন্ত আবৃত্তি করেছেন। কাজীর ব্যাধির সমাচার পেয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন।*

কথায় কথায় অনেকদূর এগিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু মাঝখানেব কতকগুলো কথা বলা হয়নি।

১৩২৭ বঙ্গাব্দের 'মোসলেম ভারতের' বৈশাখ সংখ্যা (প্রথম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক—কবি মোজাম্মেল হক) থেকে নজরুলের 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বেরোয। 'নারাযণ' মাসিক সাহিত্যালোচনায (নারায়ণের নিকষ-মণি) "বাধনহারার" সমালোচনা করেন,—

'বাঁধনহারা' বড় উপভোগ্য। তাহাতে বিবাহতত্ত্ব বড সরস—অবিবাহিত দ্বিপদ; বিবাহিত চতুষ্পদ·······মাঝখানে মায়ের স্নেহাশ্রুমাখা আদকের চিঠিখানি বেশ। তাহার পর করাচির বর্ণনাটিতে যৌবনজলতরঙ্গ আছে—উপমাগুলি মন-মাতান।" (ভাদ্র ১৩২৭)

"হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের সেই অনুপম 'বাধনহারা'। নজরুল ইসলাম অরূপ রসের কবি তাহা জানিতাম, এবারকার (ভাদ্র) 'বাঁধনহারা'র গোড়ায় তাঁহাকে পাই বাঘের মত কেমন যেন সুন্দর তবু ভয়ঙ্কর। কোন রস যদি অধিক হইয়া মাত্রা ছাড়ায়, ছবি আঁকিতে রঙ যদি বেশি পড়িয়া যায়, লাজের অপাঙ্গে যদি বিলোল কটাক্ষ আসে, তাহা হইলে কবিত্বের হানি হয। গোড়ায় তাহাই ঘটিয়াছে, কিন্তু কোয়ার্টার গার্ডের হাবিলদারের ছবিটি আঁকিতে রঙ কোথাও বেশি পড়ে নাই। তারপর আবার সেই রূপেঅপরূপে ভাবের রস। এই রসে

---

*-মোহিত-নজরুলের বিরোধের বিস্তৃত বিবরণ "বাংলা-সাহিত্যে মোহিতলাল" গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে।

নজরুল যেমন ফোটে তেমন আর কোথাযও নয়। এ অংশটুকু আমাদের পঞ্চপ্রদীপের ঘৃতের জোগান দিতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।" (অগ্রহাযণ ১৩২৭)।

পরবর্তীকালে কবি যে বিদ্রোহের জযগান গেয়েছেন তারই পূর্বাভাস 'বাঁধনহারার' মধ্যে রযেছে।

'মোসলেম ভারতে'ই নজরুলের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা বেরিয়েছে। যেমন ১৩২৭, জ্যৈষ্ঠে 'শাত-ইল-আরব', শ্রাবণে 'খেযাপারের তরণী', ভাদ্রে 'কোরবাণী', আশ্বিনে 'মোহরম', কার্তিকে 'বিদ্রোহী', অগ্রহাযণে 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' ইত্যাদি। 'প্রবাসী'র রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন তখনকার বাঁধাধরা লেখক, তেমনি নজরুল ছিলেন 'মোসলেম ভারতে'র। 'মোসলেম ভারত' তখন সমযমতো প্রকাশিত হত না। কাজেই নজরুলের প্রসিদ্ধ কবিতা 'বিদ্রোহী" প্রথম ১৯২১ এর সাপ্তাহিক 'বিজুলীতে' প্রকাশিত হয়। কবিতাটি প্রকাশিত হবামাত্রই বাঙালীকে চমক দিযে সাহিত্যের মধ্যগগনে নতুন জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয ঘোষিত করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কবিতাখানি বহু দৈনিকে মাসিকে পুনর্মুদ্রিত হয (যেমন 'প্রবাসী' 'দৈনিক বসুমতী' প্রভৃতি)। পরে ১৩২৮এর কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' "বিদ্রোহী" ও "কামালপাশা" কবিতা দুটি একত্রে প্রকাশিত হয। "বিদ্রোহী" কবিতাটির রচনা সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহমদ বলেছেন—

"তালতলা লেনের সম্ভবতঃ ৩/১সি নম্বরের একটা বাসায নজরুল আমার সঙ্গে একঘরে থাকত। একদিন সারারাত আলো জ্বালিযে কবিতা লেখা চলল। সকালে বিছানায শুযে আছি নজরুল কবিতাটি পড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল? কোনকালে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা স্বভাব নয, আমি বললুম, 'কাগজে ছাপ।' কবিতাটির নাম 'বিদ্রোহী'। একটু পরেই আফজল-উল হক এলো। কিন্তু 'মোসলেম ভারতের' প্রকাশ অনিযমিত দেখে নজরুল পরে 'বিজলীর' ম্যানেজার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে কবিতাটি দিল। কবিতাটি এত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল যে, সে-মাসে দু'বার 'বিজলী' ছাপতে হয়েছিল।" (নজরুলকে যেমন দেখেছি: স্বাধীনতা, ২৫শে জুন ১৯৪৭)।

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "তাকে 'বিজলী'তে একটা কবিতা বা কোন প্রবন্ধ লেখার জন্য বলি। সে একটা কবিতা লিখে দু-চার দিনের মধ্যে আনবে বলে। তিন চার দিন পরে টুকরো টুকরো এক গোছা কাগজে নম্বর দিয়ে, পেন্সিলে লেখা একটা কবিতা নিয়ে এসে বলল, 'অবিদা, শোন।' অঙ্গভঙ্গী করে সে কবিতাটি পড়ল। 'ও রকম টুকরো কাগজে লেখা হারিয়ে যেতে পারে, পেন্সিলে লেখা নষ্টও হয়ে যেতে পারে, তুমি বলে যাও আমি কালি দিয়ে ভাল করে লিখে নি।' খুশী হয়ে কাজী বলল, 'সেই ভাল, তুমি লিখে নাও অবিদা।' লেখা শেষ হয়ে গেলে নামকরণ করা হল, 'বিদ্রোহী'। আমাদের প্রেসের প্রিণ্টারকে ডেকে, কাগজগুলি তাঁর হাতে দিয়ে বললুম, 'কালকের বিজলীতে এই কবিতাটি বার করতে হবে, যত সত্বর সম্ভব এর একটা প্রুফ পাঠিয়ে দিন।' আমার কাণ্ড দেখে কবি হো-হো করে উঠেছে—'না অবিদা, ওটা মসলিম মাসিকের জন্য লিখেছি, আসছে সপ্তাহে বিজলীর জন্য আর একটা লিখে দেবো।'—'সে হবে না, তুমি আর একটা তাদের লিখে দিও।' 'আজ কালের মধ্যে তাদের দেবো বলে কথা দিয়েছি যে। আমার প্রথম কবিতা তাঁরা চেয়েছিলেন।'—'আচ্ছা, সে মাসিক বের হবে কবে?'—'এখনও দিন পনের দেরী আছে।'—'আচ্ছা, আমি এর সমাধান করে দিচ্ছি। একটা পাদটীকায় কিংবা মস্তিষ্কটীকায় লিখে দিচ্ছি—এই কবিতাটি মাসিক পত্রিকা হইতে গৃহীত, যদিও ঐ পত্রিকা আর পনের দিন পরে বাহির হইবে। কবির অনুমতি লইয়া বিজলীতে অগ্রিম প্রকাশিত হইল।'—'তোমার হাতে যখন পড়েছি অগত্যা তাই হোক।' পরের দিন সকালে এসে কবি চারখানা 'বিজলী' নিয়ে গেল, বললে, 'গুরুজীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'—'বেশ, ফিরে এসে বোলো তিনি দেখে কি বললেন।' বিকেলে এসে রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে যাওয়ার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করল। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে 'গুরুজী' 'গুরুজী' বলে চেঁচাতে থাকে। ওপর থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কী কাজী, অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন কী হয়েছে?'—'আপনাকে হত্যা করবো, গুরুজী, আপনাকে হত্যা করবো।'—'হত্যা করবো, হত্যা করবো কি, এস ওপরে এসে বোস।' —'হ্যাঁ, সত্যিই বলছি আপনাকে হত্যা করবো, বসুন, শুনুন।' কাজী

তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে 'বিজলী' হাতে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে "বিদ্রোহী" কবিতাটি তাঁকে শুনিয়ে দিলো। তিনি স্তব্ধ-বিস্ময়ে কাজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে কাজীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, বললেন, হাঁ কাজী, তুমি আমায় সত্যিই হত্যা করবে। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমার কবিপ্রতিভায় জগৎ আলোকিত হোক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।" (পুরাণো কথা : মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩৬২)।

এই "বিদ্রোহী"র মারফৎ তিনি খ্যাতির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হলেন একরাত্রে। নজরুলের নাম তখন বাঙলার সবত্র,—বিস্মিত জনসাধারণের মুখে মুখে। সভা-সমিতি মিটিং-বৈঠকে সবত্র তাঁর ডাক পড়তে আরম্ভ করল। রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করলেন নজরুলের তপ্তপ্রাণের নতুন সজীবতাকে, শক্তিদীপ্ত বিশিষ্টতাকে। অন্তরের স্নেহ ও স্বীকৃতির প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন 'ধূমকেতু'তে আশীর্বাণী দিয়ে, হুগলী জেলে প্রায়োপবেশনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে অনশন ভাঙবার জন্য টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ও পরে নজরুলকে "বসন্ত' নাটিকাটি উৎসর্গ করে। সেদিন তাঁকে যারা মৌমাছির মত ঘিরে থাকতেন তাঁরা কবির কাযে খুশি হননি; তারা লিখলেন—

: বসন্ত দিল রবি
তাইতো হয়েছ কবি।

আর 'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়েও নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কম হয়নি। সজনীকান্ত সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে (১৯২৪, ৪ঠা অক্টোবর) "ব্যাঙ" কবিতা লেখেন—

: আমি ব্যাঙ
লম্বা আমার ঠ্যাং।
ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাঙ।
আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে উগলিয়া খাই,
আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।

আমি ভীম ভুজঙ্গ মানিনী দলিত ফণা
আমি ছোবল মারিলে নরের আয়ুর মিনিট যে যায় গোণা।
আমি নাগশিশু, আমি ফণিমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি,
আমি 'বে অব বিস্কে', 'সাইক্লোন' আমি মরুসাগরের আঁধি।

গোলাম মোস্তাফা লিখলেন—

ঃ ওগো 'বীর'।
সংযত কর, সংহত কর 'উন্নত' তব শির।
'বিদ্রোহী' ?—শুনে হাসি পায়!
বাঁধন-কারার কাঁদন কাঁদিয়া বিদ্রোহী হ'তে সাধ যায় ?
সেকি সাজে রে পাগল সাজে তোর ?
আপনার পায়ে দাঁড়াবার মত কতটুকু তোর আছে জোর ?

(নিয়ন্ত্রিত ঃ বক্তরাগ)

বিরূপতা ও বিদ্রূপের চেয়ে 'বিদ্রোহী'র অভিনন্দন ব্যাপক হয়েছে। এই সময় নজরুলের বয়স মাত্র বাইশ বছর। নজরুলের এক বিশিষ্ট দিকের কবিতা "শাত-ইল-আরব" যখন মোসলেম ভারতে প্রকাশিত হয় (১৩২৭, জ্যৈষ্ঠ) তার এক মাস পরেই হিন্দুর দেবদেবী নিয়ে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় (১৩২৭ আষাঢ) সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'উপাসনা' পত্রিকায় 'একি রণবাজা বাজে ঝনঝন'।

১৯২০ সালের মাঝামাঝি মিঃ এ, কে, ফজলুল হক ৬নং টার্নার স্ট্রীট থেকে 'নবযুগ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। "নবযুগ" রয়েল (২০"×২৬") সাইজের এক শীটের কাগজ ছিল, প্রত্যহ বিকেলবেলা বের হতো। সে-পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার পড়েছিল মুজফফর আহমদ ও নজরুল ইসলামের ওপর। হক সাহেবের ভয় ছিল যে তাঁদের মত অখ্যাত লোক হয়ত ভাল বাংলা লিখতে পারবে না। এজন্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে টাকা দিয়ে কিছু কিছু লেখা লিখিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সম্পাদকেরা রাজী হননি। কৃষক-শ্রমিকের কথা 'নবযুগেই' প্রথম স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করা হয়। কাজেই সরকারের নজরে পড়ে। ফলে 'নবযুগের'

জামিনের এক হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। দু'হাজার টাকা জামানত দিয়ে আবার 'নবযুগ' বেরোয়। কিন্তু তখন হক সাহেবের রাজনীতিতে চলেছে অস্থিরতা। বাধ্য হয়ে এ অবস্থায় মুজফ্‌ফর ও নজরুলের মত স্বাধীনচেতা ব্যক্তির সম্পাদক থাকা চলল না। ১৯২২ সালে মওলানা আকরাম খাঁ মোহম্মদী প্রেস' থেকে দৈনিক 'সেবক' বের করেন। নজরুলকে তিনি সহকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্ত করেন। এখানেও মালিকের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হল না কারণ খাঁ সাহেব তখন হিন্দু-মুসলিম বিভেদ নীতি নিয়ে রীতিমত রাজনীতি শুরু করে দিয়েছেন।

'নবযুগে' নজরুলের news sense ও sense of humour-এর পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটবেলা থেকে নজরুলের খুব ভাল করে বাংলা পুরাণ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদাবলী পড়া ছিল। 'নবযুগের' সংবাদ সম্পাদনার সময়, 'সাব হেডিং' নির্বাচনের সময় এসব প্রকাশ পেত। তিনি খুব ভাল 'নিউজ এডিট' করতে পারতেন—বড় খবরকে খুব ছোট করে পরিবেশন করতে পারতেন অথচ তার মধ্যে খবরের গুরুত্ব বজায় থাকত পুরোপুরি। এমনিতে চঞ্চল হলেও এই সম্পাদনার সময় তীব্র মনোযোগ দেখা যেত। (দ্রঃ "নজরুলকে যেমন দেখেছি": মুজফ্‌ফর আহমদ)। 'নবযুগের' সম্পাদকীয় স্তম্ভে জ্বালাময়ী ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তারই কতকগুলি চয়ন করে "যুগবাণী" বেরোয়। রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়ে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার এই পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ করে দেন।

১৯২০ সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হবার বছরখানেক পরই তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলনে আইন-আদালত, স্কুল-কলেজ, রাস্তা-পার্ক এমন কি, অন্তঃপুর পর্যন্ত যখন আলোড়িত, তখন নজরুল রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, গণমানবের জয়—কারার লৌহকপাট ভেঙে লোপাট করে নতুন সমাজ গড়বার আহ্বান জানালেন—

এবার মহা-নিশার শেষে
আস্‌বে ঊষা অরুণ হেসে করুণ বেশে।

দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর!

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্॥

(প্রলয়োল্লাস : অগ্নিবীণা)

তরুণদলের হৃদয়ে নব উদ্দীপনার সাড়া জেগে উঠলো—তাদের সম্মুখে যেন একটা প্রদীপ্ত জগতের চিররুদ্ধ দ্বার মুক্ত হয়ে গেল। "অগ্নিবীণা"র কবিতাগুলি অসহযোগ ও খেলাফৎ আন্দোলনের আবহাওয়ায় লেখা। বাঙলার নগরে নগরে, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে ভ্রমণ করে দেশবাসীকে ভৈরবকণ্ঠে স্বাজাত্যবোধের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে লাগলেন। বাঙলার আকাশ বাতাস স্বদেশমন্ত্রের ধ্বনিতে মন্ত্রিত হয়ে উঠলো, দেশময় এক অপূর্ব সাড়া অননুভূত শিহরণ দেখা দিল। সমগ্র বাংলা দেশের তিনি চারণ কবি হয়ে উঠলেন। দৌলতপুর, কুমিল্লা, ঢাকা প্রভৃতি জায়গায় গিয়ে সেখানকার নেতৃবৃন্দের সহযোগে অধিবাসীদের মাতিয়ে তুললেন। দৌলতপুরে থাকাকালে নজরুল আলি আকবর খাঁ নামক জনৈক সাহিত্যিকের ভাগ্নীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের এই বিবাহিত জীবন কোন অজ্ঞাত কারণে সুখের হয়নি—উভয় পক্ষের হয়ত এমন কোন ত্রুটি ছিল যাতে বাধ্য হয়ে উভয়ে উভয়কেই মাসখানেকের মধ্যে ত্যাগ করেন। "দোলন-চাঁপা", "ছায়ানট" ও "পূবের হাওয়া"র কিছু কিছু গান কবিতা কুমিল্লা ও দৌলতপুরে থাকাকালীন লেখা। কুমিল্লার গোমতী তীরের আনন্দময় স্মৃতি তাঁর বহু কবিতায় আছে। যেমন—

: সেই পুণ্য গোমতীর কূলে
প্রথম উঠিল কাঁদি অপরূপ ব্যথা-গন্ধ নাভি-পদ্মমূলে।

(পূজারিণী : দোলন চাঁপা)

উদাস দুপুর কখন গেছে, এখন বিকাল যায় ;
ঘুম জড়াল ঘুম্‌তী নদীর ঘুমুর-পরা পায়।

(চৈতী হাওয়া : ছায়ানট)

কুমিল্লায় থাকতে থাকতে বহু পরিবারের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়। এঁদের মধ্যে বিরজাসুন্দরী অন্যতমা। পরে এঁরই ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে কবির বিবাহ হয়।

ইংলণ্ডের প্রিন্স অফ ওয়েলস যখন ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন (১৯২১ খৃঃ) তখন তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে কংগ্রেস সারা দেশব্যাপী হরতাল ঘোষণা করে (২১শে নভেম্বর)। কুমিল্লা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ মিছিলে গাইবার উপযোগী একটি গান লিখে দেবার জন্যে কবিকে ধরেন। কবি শুধু গানই লিখে দেননি, গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে সারা শহর ঘুরেছিলেন গান গেয়ে—

ঃ ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!
জাগো গো, জাগো গো,
তন্দ্রা অলস জাগো গো,
জাগো রে! জাগো রে!!

(জাগরণী : ভাঙার গান)

অসহযোগ আন্দোলনে আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন কবি গেয়ে উঠলেন—

ঃ জাগেন সত্য ভগবান যে রে আমাদেরি এই বক্ষ-মাঝ,
আল্লার গলে কে দেবে শিকল, দেখে নেবো মোরা তাহাই আজ।

(বন্দনা গান : বিষের বাঁশী)

অসহযোগ ও খেলাফৎ আন্দোলনের যুগে হিন্দু-মুসলিমের মিলন ও দেশের জন্যে কারাবরণ ও মৃত্যুবরণের চিত্র কবি আঁকলেন—

: কাঁদিব না মোরা, যাও কারা-মাঝে যাও তবে বীর-সঙ্ঘ হে,
ঐ শৃঙ্খলই করিবে মোদের ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ-অঙ্গ হে।
মুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ।
হিন্দু-মুসলিম চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরই বিজয়-গান॥
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি তরবারী
আমরা তাদেরি ত্রিশকোটি ভাই, গাহি বন্দনা গীত তারি॥ (ঐ)

অসহযোগ আন্দোলনের কার্যসূচীতে চরকায় সুতো কাটার কথা ছিল। বস্ত্রের দিক দিয়ে দেশবাসীকে স্বাবলম্বী করার জন্যে মহাত্মাজী চরকায় সুতো কাটতে বলেছিলেন এবং এরই ভিতর দিয়ে স্বাধীনতা আসবে একথাও সেদিন তিনি ঘোষণা করেছিলেন। কবি নজরুল সেই চরকা সম্বন্ধে লিখলেন—

: ঘোর্—

ঘোর্‌রে ঘোর্‌রে আমার সাধের চরকা ঘোর
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর॥
তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সদাই শুনতে যেন পাই
ঐ খুলল স্বরাজ সিংহ দুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘু'রে আস্‌ল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাটল দুখের রাত্রি ঘোর॥

(চরকার গান : বিষের বাঁশী)

অসহযোগ আন্দোলন যখন বৃটিশসিংহের দোর্দণ্ড প্রতাপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, মহাত্মাজীর অহিংস আদর্শে যখন 'স্বরাজ-সিংহ-দুয়ার' নড়ল না বরং বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলনে নিষ্ক্রিয়তা এনে দিল; বাঙলার স্বদেশী-যুগের নেতা সুরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত যখন সরকারের সাথে সহযোগিতা আরম্ভ করলেন, কারাগারের রুদ্ধকক্ষে চলল রাজবন্দীদের 'পরে অমানুষিক নির্যাতন, তখন নজরুল কম্বুকণ্ঠে নতুন করে ডাক দিলেন—

সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, ব'সে ব'সে কাল গুণি!
জাগো রে জোয়ান! বাত ধ'রে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি।

(সব্যসাচী : ফণি-মনসা)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই মন্ত্রিত্বের

নেহেরুর সহায়তায় 'স্বরাজ্য দল' গঠন করলেন। সুভাষচন্দ্রকে তিনি পেলেন সঙ্গী। স্বরাজ্য দলকে শক্তিশালী করে তোলার জন্যে বাঙলার আপামর সাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। কবি, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, উকীল সবারই তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তিনি দলে টেনে নানাস্থানে ঘুরেছেন—নজরুল ইসলামকেও প্রয়োজন হল। তখনকার দিনে কাজী নজরুল ছিলেন তরুণ বাঙলার 'মুকুটমণি', কাজেই দল গঠনের কাজে নজরুলকে টেনে আনলেন দেশবন্ধু। আর 'দেশবন্ধু'র 'নারায়ণ' কাগজে কাজীর অনেক কবিতা ও গান বেরিয়েছে। তাঁকে তিনি স্নেহ করতেন। দেশবন্ধুর বাড়ীতেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। পরে তাঁর দ্বি-পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁকে 'নবযুগের নবঋত্বিক' রূপে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

ছটি মাস কাটিয়ে কুমিল্লা থেকে নজরুল ফিরে এলেন কলকাতায়। ফিরে এসে আবার তিনি আসর জাঁকিয়ে তুললেন। এই সময় তাঁর ইচ্ছে হল একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করবার। শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ভেঙে নতুন চেতনায় সঞ্জীবিত করে তোলার জন্যে তিনি ৩২নং কলেজ স্ট্রীট থেকে তাঁর বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ করেন (১৩২৯ : ১৯২২, ১২ই আগষ্ট), ফুলস্কেপ সাইজ, চারপৃষ্ঠায় কাগজ, দাম এক পয়সা। প্রথম পৃষ্ঠাতেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আর তার ঠিক ওপরে কবিগুরুর আশীর্বাণীটি ব্লক করে ছাপানো—

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন॥

পত্রপত্রিকার প্রাণহীন লেখার মধ্যে তিনি এক নতুন ব্যক্তিত্বের স্পর্শ নিয়ে এলেন; 'ধূমকেতু' প্রতি সংখ্যায় অগ্নিবৃষ্টি করতে আরম্ভ করলো—তখন

বাঙলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েছে। তাঁরা দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একদল গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন, আরেকদল সমর্থন করেন না। পরে যখন অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হল তখন সন্ত্রাসবাদীরা একেবারে মুষড়ে পড়লেন। এই সন্ধিক্ষণে নজরুলের 'ধূমকেতু' বিপ্লবের বাণী প্রচার করে তাঁদের বুকে সাহস এনে দিল এবং বাঙলার নির্যাতিত সন্ত্রাসবাদী দলের মুখপত্র হয়ে উঠল। 'ধূমকেতু'র জনপ্রিয়তা তখন বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বিজলী' ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মশক্তির' অনেক উপরে। কাগজ যা ছাপান হত তার চেয়েও তার চাহিদা ছিল প্রচুর। প্রথম সংখ্যা দু'হাজার এক নিমেষেই শেষ হয়ে যায়। কাগজ বেরুবার আগেই হকার দাম দাদন দিয়ে যায়। চায়ের দোকানে, হোস্টেলে, রোয়াকে, বৈঠকখানায় সবত্র 'ধূমকেতু'র বিষয় নিযে আলোচনা চলে। কাগজ কেনার সময় হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। নানা বয়সী লোকেরা আসত কবির সঙ্গে পরিচয় করতে, কেউ লেখা দিতে, কেউ আদর্শের ঐক্য জ্ঞাপন করতে, কেউ বা প্রেরণা লাভ কবতে। কাজেই সারাদিন ভিড় লেগেই থাকত। ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় কাগজের অফিস স্থানান্তরিত করা হয় ৭নং প্রতাপ চাটুজ্জে লেনে। কবিকে ঘিরে ঐখানেই এক মজলিস বসত। আব্দুল হালিম, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মুজফ্‌ফর আহমদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার, শরৎ পণ্ডিত প্রভৃতি আসতেন। গান, হাসি, ঠাট্টায় বাড়ীটা যেন কাঁপতে থাকত। 'ধূমকেতু'র আড্ডায় আনন্দ প্রকাশের জন্যে মাটির ভাড়ে চা খাওয়া হত। 'দে গরুর গা ধুইয়ে' চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে চায়েব ভাড় শূন্যে নিক্ষেপ করা হত।' 'ধূমকেতু'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি বলেছেন,—

"মাভৈঃ" বাণীর ভরসা নিয়ে 'জয় প্রলয়ঙ্কর' বলে 'ধূমকেতু'কে রথ ক'রে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা-শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি—নমস্কার করছি আমার সত্যকে।...এই যে নিজেকে চেনা আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথপ্রদর্শক কাণ্ডারী বলে জানা, এটা দম্ভ নয়, অহঙ্কার নয়। এটা আত্মাকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি। ...এ দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে অস্থিমজ্জায় যে পচন

ধরেছে তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হ'লে নতুন জাত গড়ে উঠবে না। …দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামী, মেকি তা সব দূর ক'রতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী! ……'ধূমকেতু' কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোন্‌খানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।"

অন্য একটি সংখ্যায লিখেছেন, "অনেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন 'ধমকেতু'র পথ কি ?…সর্বপ্রথম, 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায। স্বরাজ-টবাজ বুঝি না। কেননা ওকথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক বকম করে থাকেন। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হ'লে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়মকানুন, বাঁধন, শৃঙ্খলমান নিষেধের বিরুদ্ধে। আব এই বিদ্রোহ করতে হ'লে—সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে।…বিদ্রোহ মানে কাউকে না মানা নয়, বিদ্রোহ মানে যেটা বুঝি না সেটাকে মাথা উঁচু ক'রে 'বুঝি না' বলা।… 'ধমকেতু'র মত হচ্ছে এই যে, তোমাব মন যা চায তাই কর। ধর্ম, সমাজ, রাজা, দেবতা কাউকে মেনো না।…সত্যকে জানবাব জন্য বিদ্রোহ চাই। নিজেকে শ্রদ্ধা প্রশংসার লোভ থেকে বেহাই দেওয়া চাই।…বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহ যদি করতে পার, প্রলয় যদি আনতে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই—কল্যাণ আসবেই।"

সম্পাদকের পরিবর্তে লেখা হত 'সারথি'। 'ধূমকেতু'র 'সারথি' মুক্তি ও স্বাধীনতা, সরকার ও সরকারের খয়েব খাঁদেব সম্পর্কে ওজস্বিনী ভাষায় প্রবন্ধ, গান, কবিতাদি লিখে বৃটিশ-সিংহকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যায় তাঁর বিদ্যুৎ জ্বালা-লেখনী 'ধূমকেতু' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গানে'র কতকগুলি কবিতা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ যেগুলি লিখেছিলেন তারই কতকগুলি চয়ন করে "রুদ্রমঙ্গল" ও "দুর্দিনের যাত্রী" বই দুটি বেরোয। পূজোর প্রাক্কালে "আনন্দময়ীর আগমনী" নামক কবিতা 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হবার পর 'ধূমকেতু' রাজরোষে পতিত হয়।

অবশ্য প্রথম থেকেই পুলিশ 'ধূমকেতুকে' দমন করবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে ওঠে, কবিতাটি একটা ছুতো মাত্র—ওর চেয়ে কড়া কড়া কবিতা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আগে লিখেছিলেন—

: রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে-পুড়ে যাক শ্বেত বসন।
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন্-ঝন্।
সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মা গো
জ্বাল সেথা জ্বাল কাল-চিতা।
তোমার খড়্গ-রক্ত হউক
স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা।
... ...
টুঁটি টিপে মারো অত্যাচারে মা,
গল্-হার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার 'ধূমকেতু'-জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি॥

(রক্তাম্বর-ধারিণী মা : অগ্নিবীণা)

এবার লিখলেন—

: আর কতকাল রইবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসী,
ভূভারত আজ কসাইখানা আসবি কখন সর্বনাশী।
সুরেন্দ্র আজ মন্ত্রণা দেন দানব রাজার অত্যাচারে
দম্ভ তাঁহার দম্ভোলি ভীম বিকিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজারে।
বারি, ইন্দ্র, বরুণ আজি করুণ সুরে বংশী বাজায়,
বুড়িগঙ্গার পুলিন বুকে বাঁধছে ঘাঁটি দস্যুরাজায়।
রবির কিরণ ছড়িয়ে পড়ে দেশ হতে আজ দেশান্তরে,
সে কর শুধু পশল না মা বদ্ধ কারার অন্ধ ঘরে!

গগন পথে রবি রথের শত সারথি হাঁকায় ঘোড়া
মর্ত্যে দানব মানব পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোঁড়া
তাজ হারা যার নাঙ্গা শিরে গরমাগরম পড়ছে জুতি
ধর্মের কথা তারাই বলে তারাই পড়ে কেতাব পুঁথি।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে 'ধূমকেতু' অফিস ঘেরাও করে, তন্ন তন্ন করে সে সংখ্যা নিঃশেষে সংগ্রহ করে। এর ফলে সম্পূর্ণ কবিতাটি পাওয়া যায় না। সম্পাদক-প্রকাশক-মুদ্রাকর হিসেবে কবির নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুল কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে তিনি পালিয়ে গেলেন কুমিল্লায়। 'ধূমকেতু' বেরুতে লাগল—গ্রাহক অনুগ্রাহকদের মধ্যে বিলি হতে লাগল। কিছুদিন বাদে এলো কালীপুজো—সেই দিনের সংখ্যায় কবির "ম্যায় ভুখা হুঁ" শীর্ষক একটি জোরাল প্রবন্ধ বেরুল। পুলিশ আবার সচেতন হয়ে উঠল। আর বেশী দিন আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না—সেখানে ধরা পড়ে গেলেন। কুমিল্লা থেকে তাঁকে কলকাতায় এনে ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের পুলিশ আদালতে হাজির করা হল। বহু উকিল এগিয়ে এলেন বিনা পারিশ্রমিকে 'ধূমকেতু'র পক্ষ সমর্থনের জন্য। কবির পক্ষে মলিন মুখোপাধ্যায় হলেন প্রধান উকীল। ১৯২৩, ৮ই জানুয়ারী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইনহোর এজলাসে ১২৪এ ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হোল। তিনি সেদিন আসামীর কাঠগড়া থেকে যে জ্বালাময়ী ভাষায় জবানবন্দী দিয়েছিলেন, তা শুধু সত্য নয় তা সাহিত্য। বাঙলাদেশে সাহিত্য করে আজ পর্যন্ত তিনি ছাড়া আর কেউ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন নি। এই জবানবন্দী পড়লে বুঝতে পারা যাবে কেন তিনি গান্ধীবাদের অসারতা বুঝতে পেরে বৈপ্লবিকপথ গ্রহণ করেছিলেন। সর্বোপরি কবি-আত্মার নির্ভীক আদর্শ এতে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত যার তুলনা বড় একটা পাওয়া যায় না। অত্যাচারী শাসকদের রোষে আরও অনেক কবি-সাহিত্যিকের দণ্ড হয়েছে কিন্তু এরূপ জবানবন্দী তাঁদের কাছ থেকেও পাওয়া যায়নি। সম্পূর্ণ জবানবন্দী এ বইয়ের 'পরিশিষ্টে' দেওয়া হয়েছে।

অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্যে 'ধূমকেতু' সাপ্তাহিক থেকে কিছুদিন অর্ধ-সাপ্তাহিক হিসেবেও বেরোয়। নজরুলের জেল হওয়ার পর দু'সপ্তাহ

কাগজ বন্ধ থাকে। এরপর তাঁর সম্বন্ধী বীরেন সেনগুপ্তের সম্পাদনায় পাক্ষিক হিসেবে দু'টো সংখ্যা বেরিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। পাক্ষিক 'ধূমকেতু'তে নজরুলের 'জবানবন্দী' প্রকাশিত হয় এবং 'প্রবর্তক' (মাঘ ১৩২৯) 'উপাসনা' (ফাল্গুন ১৩২৯) প্রভৃতি পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। কয়েক বছর পর ১৩৩৮এ কবির পরিচালনায় ও কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিকের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' সাপ্তাহিকরূপে বেরোয়। ঢাকার 'শান্তি' পত্রিকা 'ধূমকেতু'র এই পর্যায়ের একটি সংখ্যা সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন—

> " 'ধূমকেতু'—সাপ্তাহিক। কবি নজরুল ইসলাম প্রবর্তিত ও পরিচালিত। ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক। ২৫৯।১, অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲, দুই টাকা। নগদ মূল্য ৫ এক পয়সা মাত্র।
>
> চলার পথের একটা ওজস্বিনী ভাব ও বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকটি মন্তব্য নির্ভীক ও সুযৌক্তিক।
>
> আলোচ্য সংখ্যায় 'বাংলার ভাবী সমাজ'—শ্রীসুবলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত—গভীর দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের 'অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় প্রণালী' ভাল হইয়াছে। আমরা সাপ্তাহিকখানার ক্রমোন্নতি কামনা করিতেছি। (আশ্বিন ১৩৩৮)।"

ইতিমধ্যে ১৩২৯-এর বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে, (প্রথম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা) তাঁর "তূর্যনিনাদ' কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। "অগ্নি-বীণা' গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। প্রচ্ছদপট আঁকেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বই বেরুতে না বেরুতেই দু'এক মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। কবিতার ক্ষেত্রে এই দুর্লভ সম্মান অনেক কবির ভাগ্যে ঘটেনি। কারাদণ্ডের পর কবিকে কিছুদিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়, তারপর কোমরে দাঁড় বেঁধে সাধারণ কয়েদীরূপে হুগলী জেলে তাঁকে আনা হয়। হুগলী জেলে তখন রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত আরো অনেক কয়েদী ছিলেন। সেদিনের কারাজীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর ও দুর্বিষহ, তখন বন্দীদের কোন শ্রেণী-বিভাগ ছিল না। জেল কর্তৃপক্ষ তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করতেন। বিশেষ শ্রেণীর (special class) নাম করে রাজনৈতিক কর্মীদের সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে রাখা হত; এক জায়গার নাম করে নিয়ে গিয়ে অন্যস্থানে তোলা হোত।

চিঠি লেখার কাগজ, খবরের কাগজ দিত না, ক্ষুদ ও ধানকণা মিশিয়ে দুর্গন্ধ লাপসী দিত খেতে, কুটকুটে খোঁচা খোঁচা লোমের কাল কম্বল দিত শুতে। নজরুল তাঁদের নিয়ে জেলের নিয়মকানুন ভাঙতে আরম্ভ করলেন, জেল কর্তৃপক্ষের আচরণও তেমান কঠোর হতে লাগলো। এই আচরণের প্রতিবাদে নজরুল রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করলেন। জেলের আইনে কয়েদীদের জন্য যত রকমের শাস্তি আছে তার সবকটিই একে একে কবির ওপর প্রয়োগ করা হোল। অন্যান্য কয়েদী থেকে দূরে সরিয়ে হাতে কড়া পায়ে বেড়ি দিয়ে কবিকে একটি পৃথক সেলে বন্দী করে রাখল। এতে কবি দমলেন না বরং অধিকতর উৎসাহে নানারূপ ব্যঙ্গ-সঙ্গীত রচনা করে জেল কর্তৃপক্ষকে নাজেহাল করে তুললেন। "সুপার (জেলের) বন্দনা" তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই কবিতাটির ফুটনোটে লেখা আছে, "হুগলী জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল প্রকার জুলুম আমাদের ওপর দিযে পরখ ক'রে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় জেলের মূর্তিমান 'জুলুম' বড-কর্তাকে দেখে এই গান গেযে আমরা অভিনন্দন করতাম।" এই সময় বিখ্যাত সঙ্গীত "এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল" (শিকল পরার গান) 'ভাঙার গান', 'সেবক', 'মরণ-বরণ'গুলি রচনা করেন। কাগজ পেন্সিলের অভাবে কবি এ সব গান স্মৃতিশক্তির জোরে সুর ও দরদ দিযে চেচিযে চেচিযে প্রতিবাদের আগুন বন্দীদের প্রাণে প্রাণে ছডিযে দিতে লাগলেন। প্রথম প্রথম অনশন ধর্মঘটের কথা বাহিরে প্রকাশ করা হযনি তবু এই সংবাদ আগুনের মত সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পডল। দেশের সর্বশ্রেণীর লোকেরা বিক্ষুব্ধ হযে উঠল। এমন কি নজরুলের অনশনের খবর পেযে শিলঙ থেকে কবিগুরু উপবাস ভঙ্গ করবার জন্যে তার করলেন—"Give up hunger strike, our literature claims you." অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়, জেলকর্তারা ঐ তার নজরুলকে না দিয়ে বা তাঁকে কিছু না জানিয়েই রবীন্দ্রনাথকে লিখে পাঠালেন—"Addressee not found." কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও নজরুলের সঙ্গে জেলে দেখা করতে যান, কিন্তু জেলকর্তৃপক্ষ তাঁকে কবির সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেয় নি। শরৎচন্দ্র ঐ সময় জনৈক ব্যক্তিকে একখানি পত্রে লেখেন, "হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম উপোস করিয়া মর মর হইয়াছে। বেলা ১টার গাড়ীতে যাইতেছি। দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে খাইতে রাজী

হয়। না হইলে তার কোনো আশা দেখি না। একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া বোধ হয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।" (শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র পৃঃ ২০৯) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নলিনীকান্ত সরকার, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মিঃ আবদুল্লাহ শোহরওয়ার্দী প্রভৃতি জেলে গিয়ে অনশন ভাঙতে অনুরোধ জানালেন। তাঁর মা কারাগারে গিয়ে দেখা করতে চাইলেন কিন্তু তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন না। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটতে লাগল। অনশনের উন-চল্লিশ দিবসে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে কলকাতায় এক বিরাট জনসভা আহূত হয়; ঐ সভায় জেল-কর্তৃপক্ষের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং কবিকে অনশন ত্যাগের জন্য দেশবাসীর তরফ হতে অনুরোধ জানানো হয়। পরিশেষে বাইরের আন্দোলনের চাপে ও রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে সরকার বন্দীদেব দাবী মানবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর কবি চল্লিশ দিনের দিন তাঁর মাতৃসমা কুমিল্লার বিরজাসুন্দরীব হাতের লেবুর রস পান করে উপবাস ভঙ্গ করলেন। এর সম্বন্ধে তিনি পরে একটি কবিতাও লিখেছিলেন (মার শ্রীচরণারবিন্দে : সর্বহারা)।

নজরুলের জেলে থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় বসন্তোৎসব করেন এবং "বসন্ত" নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন এই লিখে—

শ্রীমান কবি কাজি নজরুল ইসলাম
স্নেহভাজনেষু

১০ ফাল্গুন
১৩২৯

এই বার্তা জেলে বহন করে নিয়ে গেলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে 'কল্লোল' পত্রিকার জন্যে কবিতা লিখতে বললেন। কিছুদিন পরেই লাল কালিতে লিখে পাঠালেন 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'। এটি প্রকাশিত হয় 'কল্লোলে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় ১৩৩০, জ্যৈষ্ঠ। কবিতাটির জন্যে তাঁকে পাঁচ টাকা দেওয়া হয়েছিল।

হুগলী জেল থেকে নজরুলকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানেও চলেছে কবিতা গান ইত্যাদি রচনা; 'প্রবাসী', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'নারায়ণ', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে সে-সব প্রকাশিত

হয়েছে। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছোট বা বড় প্রত্যেকটি কবিতার জন্যে তাঁকে দশটাকা হিসেবে সম্মান-দক্ষিণা দিতেন; তখনকার দিনে কবিতা লিখে কেউ টাকা পেতেন না একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। এই সময় তাঁর "দোলনচাঁপা" বইটি প্রকাশিত হয় (১৩৩০); এর ভূমিকা ('দুটি কথা') লেখেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

কারাদণ্ডের মেয়াদের একমাস আগেই ছাড়া পান নজরুল। জেল থেকে বেরিয়ে নজরুল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে মেদিনীপুরে আসেন (১৩৩০, ১১ই ফাল্গুন: ১৯২৪, ২২শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার)। এখানে তিনি চারদিন ছিলেন। এই অধিবেশনে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ, সুপণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, শৈলেশনাথ বিশী প্রভৃতি এসেছিলেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা। মেদিনীপুর কলেজ প্রাঙ্গণে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন অপরাহ্ণ ৪টায় সভাপতি ভাষণ দেন ও রাত্রি ন'টায় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকখানি অভিনীত হয়। নজরুল এ দুটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিন সকাল ৭৷৷টায় কান্ত কবি রজনীকান্তের জীবনচরিতকার নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতকে সম্বর্ধিত করা হয়। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে কবি স্বরচিত কয়েকটি কবিতা ও গান গেয়ে সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন। অপরাহ্ণে পরিষদের পক্ষ থেকে কবিকে অভিনন্দিত করা হয়। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কবি সম্পর্কে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দেন। কাজী তাঁর স্বভাবসুলভ সরল সুমধুর উক্তি সহকারে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে কয়েকটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। তৃতীয় দিন মেদিনীপুর কলেজে বিকেল ৪টায় মহিলারা পৃথকভাবে কবিকে সম্বর্ধনার্থে একটি সভার ব্যবস্থা করেন। সভায় কবি নিজের রচিত গান ও কবিতা আবৃত্তি করেন। তাঁর গান ও আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে জনৈক হিন্দু মহিলা নিজ গলার হার খুলে নজরুলকে উপহার দেন। তখনকার সমাজ এই সামান্য জিনিসটাকে সুস্থচিত্তে ও খোলাচোখে গ্রহণ করতে পারেনি; মুসলমান তরুণের উপর হিন্দু মেয়ের এই টান তাঁর পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন ধিক্কারের চোখে দেখেছিলেন। সমাজের গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হয়ে মেয়েটি নাইট্রিক এসিড পান করে আত্মহত্যা করেন।

সন্ধ্যায় বাংলা স্কুলে (অধুনা নাম বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ) এক বিরাট জনসভায় মেদিনীপুর সহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁকে অভিনন্দন-পত্র দেন। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি শুধু কতকগুলি গানই গান। চতুর্থ দিন বিকেল ৫টায় ঈদগায় একটি জনসভা হয়। মৌলবীরা কোরাণ থেকে আয়েত উদ্ধৃত করে কবিকে আশীর্বাদ করেন। বিভিন্ন স্কুলের ছেলেরা, ভদ্রমহোদয়েরা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এরকম হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা অন্য কোন কবি বা সাহিত্যিকের ভাগ্যে জোটেনি। পরকে আত্মীয় করে নেওয়া নজরুল-চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। মেদিনীপুরবাসীর প্রীতি সম্পর্ক ও তাঁদের জাতীয় চেতনায় মুগ্ধ হয়ে 'ভাঙার গান" মেদিনীপুরকে উৎসর্গ করে মেদিনীপুরবাসীর সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

এ ছাড়া আর একবার তিনি মেদিনীপুরে আসেন রাজা দেবেন্দ্রলাল খানের উদ্যোগে নাড়াজোল রাজ-কাছারীতে 'শিল্প প্রদর্শনী' উপলক্ষ্যে—১৯২৯এর এপ্রিলের মাঝামাঝি। সন্ধ্যাবেলা রাজ-কাছারীর খোলা ছাদের ওপর গানের জলসায় তিনি 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর', 'অরুণ প্রাতের তরুণ দল' প্রভৃতি ৭।৮টি গান করেন। এ জলসায় তাঁর বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারও কয়েকটি হাসির গান গান।

এবার বাঁধন-হারা নজরুল আবার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। ১৯২৪ খ্রীঃ ২৪শে এপ্রিল, শুক্রবার (১৩৩১ বৈশাখ) কলকাতায় ৬নং হাজী লেনে গিরিবালা সেনগুপ্তর কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তকে বিবাহ করেন। 'মা ও মেয়ে' উপন্যাসের লেখিকা বেগম এম, রহমানের উদ্যোগে এই বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হয়। এই মহিলার নামে তিনি পরে একটি কবিতা লিখেছিলেন। (মিসেস এম, রহমানের জিঞ্জীর) ও তাঁর নামে "বিষের বাঁশী" উৎসর্গ করেন। ১৩৩১এ "বিষের বাঁশী" কল্লোল পাবলিশিং হাউস থেকে বেরোয়। প্রচ্ছদপট আঁকেন দীনেশরঞ্জন দাশ। কিছুদিন পরেই সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়, 'কল্লোল' অফিস (২৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) তল্লাস হয়। তা সত্ত্বেও পুস্তকখানির আকর্ষণ বেড়েছিল বই কমেনি। ফরিদপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯২৫ খ্রীঃ) গোপনে শত শত কপি বিক্রী হয়েছিল। এই সম্মেলনেই কবির সঙ্গে গান্ধীজীর প্রথম পরিচয় ঘটে। নজরুল তাঁর "চরকার গান" গেয়ে তাঁকে মুগ্ধ করেন। ১৯২৪ সালে

তারকেশ্বরের মোহন্তর অনাচার নিবারণকল্পে বাঙলাদেশে প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সেই উপলক্ষ্যে নজরুল লেখেন 'মোহন্তের মোহ-অন্ত গান'।

বিয়ের পর সপরিবারে হুগলীতে গিয়ে বাসা বাঁধলেন। এখানেই কবির প্রথমপুত্র কৃষ্ণমহম্মদ জন্মাষ্টমীর দিন ভূমিষ্ট হয়। ছেলের 'আকীকা'য (একুশ দিনে একটি উৎসব) তিনি সাহিত্যিক-শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কয়েক মাস পরেই ছেলেটি মারা যায়। এ সময় তাঁকে দারুণ অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিল। নজরুলকে সপরিবারে অনেকদিন অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটাতে হয়েছে। অবশেষে দুঃখকষ্টের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করা সত্ত্বেও কবির কবিত্বশক্তি হোঁচট খায় নি। "সুবেহ উম্মেদ", "মুক্তিকাম", "দ্বীপান্তরের বন্দিনী", "আশু-প্রয়াণ গীতি", "অশ্বিনীকুমার", "চিত্তনামা", "ফাল্গুনী", "বিদায়-স্মরণে", "বধূবরণ", "চাঁদনী রাতে", "পূবের হাওয়া", "ঝড" প্রভৃতি ১৩৩১-৩২ সালের মধ্যে লেখা। ১৩৩২, ১লা আষাঢ দেশবন্ধু ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে নজরুল হুগলীতে বসেই "অর্ঘ", "সান্ত্বনা", "রাজ-ভিখারী", "ইন্দ্রপতন", 'দেশবন্ধু" প্রভৃতি গান ও কবিতা রচনা করেন। সে বছর দেশবন্ধু সম্পর্কে যে সব কবিতা গান লেখেন সেগুলি একত্র করে "চিত্তনামা" কাব্য বেরোয। এ বইয়ের প্রচ্ছদপটও এঁকেছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল দেশবন্ধু-পত্নী বাসন্তী দেবীকে। ১৩৩২, ৮ই আশ্বিন দার্জিলিঙে মারা যান 'কল্লোলে'র সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ। এর তিরোধানে কবি লেখেন "গোকুল নাগ" কবিতা। সেটি প্রকাশিত হয সেই বছরের অগ্রহায়ণের 'কল্লোলে'। ১৩৩২এর আষাঢ মাসে বাকুডার যুব ও ছাত্র সমাজের আমন্ত্রণে বাঁকুড়া জেলা পরিভ্রমণ করেন। এসময অনেকেই নজরুলের কবিতার ত্রুটি ধরে যা-তা বিরূপ সমালোচনা লিখতে আরম্ভ করেন। কবি তাঁদের উত্তর দিলে "আমার কৈফিয়ৎ' নামক কবিতায।

নজরুল হুগলীতে থাকলেও কলকাতায যাতাযাত করতেন। সে সময লোকচক্ষুর অগোচরে কলকাতায কমিউনিস্ট পার্টির একটি সংসদ গঠনের আযোজন চলেছিল। ৩৭নং হ্যারিসন রোড থেকে ১৩৩২, ১লা পৌষ (১৯২৫, ১৬ই ডিসেম্বর) হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবুদ্দিন, শামসুদ্দিন হোসেন, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির পরিচালনায় 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ' সম্প্রদায়ের (লেবার স্বরাজ পার্টি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস—কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম পর্যায়) সাপ্তাহিক মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশিত হয়. প্রধান পরিচালক নজরুল

ইসলাম; নামে সম্পাদক ছিলেন মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। 'লাঙলের, প্রথম সংখ্যায় তাঁর বিখ্যাত "সাম্যবাদী" কবিতা সমষ্টি বেরোয়। "কৃষাণের গান", "শ্রমিকের গান", "ছাত্রদলের গান", "সব্যসাচী" প্রভৃতি 'লাঙলে' লিখে 'লাঙল'কে জনপ্রিয় করে তোলেন। বিপ্লবী ও অহিংসদল মিলিত হয়ে হুগলীতে কংগ্রেসের একটি শাখা স্থাপন করেন। কবির গানের জনপ্রিয়তা দেখে তাঁরা কবিকে হুগলীতে এনেছিলেন। নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেবার পর কবির দিকে তেমন পূর্বের মত আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। কবিও তখন তাঁদের সঙ্গে থেকে লক্ষ্য করেছেন যে, দেশের সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে এই তথাকথিত বিপ্লববাদীদের কোন সংযোগ নেই,—দেশের আপামর জনসাধরণের সঙ্গে যোগ না রেখে মহৎ কর্ম করা যায় না। তাই তিনি ধীরে ধীরে সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে নজরুল কোন দলের সদস্য ছিলেন না। যে দল যখনই তাঁর সাহায্য চেয়েছেন তখনই তিনি তাঁদের হয়ে কাজ করে দিয়েছেন। হুগলীতে থেকে কংগ্রেসী আন্দোলনকে জোরদার করে তোলেন। আবার মীরাটে যখন কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল, সাম্রাজ্যবাদী সরকারেব অত্যাচারে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন, দেশের অন্যান্য শ্রেণীর কাছ থেকে সমর্থনের অভাবে মামলা পরিচালনা করার জন্যে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না সেই দুঃসময়ে নজরুল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে মামলা পরিচালনার অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

হুগলীতে থেকে নজরুল ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন 'লাঙল' অফিসে ঋণের কথা তুলতেই হেমন্তকুমার সরকার কবিকে কৃষ্ণনগরে যাবার প্রস্তাব করেন। হেমন্তবাবু তখন নদীয়া থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হবার তোড়জোড় করছিলেন। নিজের কাজের সুবিধার জন্যে কবিকে সপরিবারে কৃষ্ণনগরে নিয়ে এলেন।

১৩৩২, ২৯শে চৈত্র (১৯২৬, ২রা এপ্রিল) কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়—নজরুল তখন সপরিবারে ছিলেন কৃষ্ণনগরে। সেখানেই তিনি উৎকর্ষের শিখরস্পর্শী সঙ্গীত "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার" রচনা করেন এবং কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে (২২শে মে, ১৯২৬) গানটি প্রথম গাওয়া হয় এবং 'বঙ্গবাণী'র ১৩৩৩, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়। ওখানে একই সময়ে লেবার স্বরাজ পার্টির প্রথম সম্মেলন ডাকার ব্যবস্থা করা হয়।

কনফারেন্সে গান লেখার ভার দেয়া হোল নজরুলকে। তিনি লিখলেন 'ধ্বংস-পথের যাত্রীদল', 'ওঠ রে চাষী জগৎবাসী ধর কসে লাঙল।' যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের সম্মেলন হলো রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে আর লেবার পার্টির কনফারেন্স হলো টাউন হলে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের পৌরোহিত্যে। সেদিনই দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সভাপতিত্বে যুব-ছাত্র সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের জন্যে কবি 'ছাত্রদলের গান' (আমরা শক্তি আমরা বল) রচনা করেন।

'প্রবর্তকের ঘুর চাকায', 'সব্যসাচী', 'যা শত্রু পরে পরে', 'হিন্দু-মুসলিম যদ্ধ', 'হিন্দু-মুসলমান,' 'খালেদ', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'ভীরু', 'এ মোর অহঙ্কার', 'নওরোজ', পথচারী', 'অগ্র পথিক' প্রভৃতি কবিতা, "কুহেলিকা", "মৃত্যুক্ষুধা" উপন্যাস কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন লেখা (১৩৩৩-৩৪)। ১৩৩৩, বৈশাখের 'কল্লোলে' "মাধবীপ্রলাপ" ও পরের মাসের 'কালি-কলমে' "অ-নামিকা" প্রকাশমাত্রই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। প্রেম সম্পর্কে তখনকার সমাজের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে কুঠারাঘাত হানে। "শনিবারের চিঠি" প্রভৃতি পত্রিকা কবিতা দুটির তুমুল সমালোচনা করে। ঐ সময় কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় 'লাঙলে'র নাম পরিবর্তিত হয়ে 'গণবাণী' রাখা হয়। (১৩৩৩, ২৭শে, ১৯২৬, ১২ই আগস্ট)। "গণবাণী'র একাদশ সংখ্যায় নজরুল "রেড ফ্ল্যাগ" ও "ইন্টারন্যাশন্যাল সঙ্গীতে"র অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই সময় শোনা যায় যে, নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতাসমষ্টি রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। 'লাঙল' ও 'গণবাণী'র যুগে নজরুলের কবি-মন নতুন দিকে প্রবাহিত হয়—নিরন্ন, নিগৃহীতের বেদনাকে কবি নতুন ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলেন। "ফণিমনসা", সর্বহারা', "প্রলয়-শিখা", "সন্ধ্যা" প্রভৃতি কাব্যে এর সুস্পষ্ট ছাপ আছে। তাঁর কবি-মনের এই নতুন দিকের পরিচয় মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের মাণিকগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেস-সম্মেলনের সাহিত্য-সভার (১৩৩৫) সভাপতির ভাষণে কিছু আভাস পাওয়া যাবে। তিনি সেদিন বলেছিলেন,—

"......তাঁহার কবিতার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিলাম—এ তো কম নয়। এ খাঁটি মাটি হইতে উঠিয়াছে। আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দোতলা প্রাসাদে থাকিয়া কবিতা লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথ দোতলা হইতে

নামেন নাই। কর্দমময় পিচ্ছিল পথের উপর পা পড়িলে কেবল তিনি নন, দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিতেন। নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মিয়াছেন জানি না; কিন্তু তাঁহার কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটীর গন্ধ পাই। দেশের যে নতুন ভাব জন্মিয়াছে তাহার সুর পাই। তাহাতে পালিশ নাই, আছে লাঙলের গান, কৃষকের গান।...... মানুষে মানুষে একাত্মসাধন এ অতি অল্প লোকেই করিয়াছে—কাজী নজরুল ইসলাম নতুন যুগের কবি।· হাততালি দিয়া নজরুলকে নষ্ট করিবেন না—তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিন। সমবয়স্ক যাঁহারা তাঁহারা তাঁকে সহায়তা করুন, কনিষ্ঠ যাঁহারা তাঁহারা নমস্কার করুন। ....দেখিয়া দুঃখ হয়—শরৎবাবু ও নজরুল ইসলাম ছাড়া গত দশ বৎসরের মধ্যে কোনো ভাবুক লেখকের উদয় হয় নাই। .জাতির প্রাণে লাঙ্গল আসিয়াছে, নতুন ডিমোক্র্যাট নজরুলের বীণার ঝঙ্কারে তাই পাই।" (কল্লোল, ১৩৩৬, জ্যৈষ্ঠ।

কৃষ্ণনগরেও কবিকে দুঃখকষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। এখানেই তাঁর প্রিয়পুত্র বুলবুলের জন্ম হয়। (৯ই অক্টোবর ১৯২৬)। কপর্দকহীন হয়ে নজরুল সপরিবারে কলকাতায় ফিরে আসেন। প্রথমে কিছুকাল 'সওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দীনের ১১নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের ছাপাখানার একতলা ঘরের একখানি কামরায় থাকেন। তারপর মুজফ্‌ফর আহমদের চেষ্টায় তিনি অন্যত্র বাসা নিয়ে উঠে যান। মুজফ্‌ফর সাহেবকে কবি খুবই ভালবাসতেন। ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ "ছায়ানট" বইখানা তাকে ও কুতুবুদ্দিন সাহেবকে উৎসর্গ করেন। ১৩৩১ সালে চট্টগ্রামে নিখিলবঙ্গ ছাত্র ও যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল-সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, আর উদ্বোধন করেছিলেন নজরুল ইসলাম। 'উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটি এই উপলক্ষ্যে রচিত হয়। চট্টগ্রামের পথে তিনি সন্দ্বীপে মুজফ্‌ফর আহমদের বাড়ী গিয়েছিলেন। সেখানে সমুদ্র-দৃশ্য ও সমুদ্র-স্নান পরম আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন। এই অঞ্চলের 'সাম্পান' ও 'সাম্পানে'র মাঝি, গুবাক-সারির সৌন্দর্য যুগিয়েছে বহু গান ও কবিতার রস-প্রেরণা। তাঁর "সিন্ধু-হিন্দোল", "চক্রবাক", "চোখের চাতকে"র অধিকাংশ গান ও কবিতা সমুদ্র প্রেরণায় রচিত। সম্মেলনের শেষে হবিবুল্লা বাহার সাহেবের তামাকুমণ্ডির বাড়ীতে বেশ কিছুদিন ছিলেন। বাহার সাহেব এবং তাঁর ভগ্নী সামসুন নাহার তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনে যথেষ্ট নাম

করেছিলেন। এঁদেরই সঙ্গে তিনি চট্টগ্রামের নানা জায়গা ভ্রমণ করেন। দুই ভাইবোনের আদর-যত্নে কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের সম্পর্কে তিনি কবিতা লেখেন ও "সিন্ধু-হিন্দোল" কাব্য উৎসর্গ করেন। এঁদের বাড়ীতে বসেই তিনি 'চক্রবাক,' 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি', 'শীতের সিন্ধু', 'কর্ণফুলী' প্রভৃতি রচনা করেন। চট্টগ্রাম বুলবুল সোসাইটি কবিকে সম্বর্ধনা জানান। এর উদ্যোক্তা ছিলেন বাহার সাহেব ও তাঁর ভগ্নী। তার উত্তরে কবি বলেন,—

"তরবারি গ্রহণ করতে হয় উচ্চশিরে, উদ্ধত হস্ত তুলে। মালা গ্রহণ করতে হয় উচ্চশির অবনমিত ক'রে, উদ্ধত হস্ত মুক্ত ক'রে ললাটে ঠেকিয়ে। তোমাদের মুক্ত করের অঞ্জলির বিনিময়ে আমার মুক্ত করের রিক্ত নমস্কার গ্রহণ করো। ...আমার জন্য যদি আসনই দাও তোমরা, তা যেন বুকের আসন হয় বন্ধু, সভার কোলাহলের নির্বাসন আমি চাই না। কোনদিন তোমাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারব—এ ঔদ্ধত্য আমার নেই, সম্বলও নেই, আমি যাযাবর কবি, আমার ঝুলি ভ'রে যে পাথেয় দিলে তোমরা, তাই যেন আমার ভাবী পথের সহায়ক হয়। বিনিময়ে আমি রেখে গেলাম তোমাদের সিন্ধুতে তোমাদের কর্ণফুলিতে আমার দুই বিন্দু অশ্রু। তোমাদের হাতের দানকে চোখের জলে ভিজিয়ে গেলাম। জীবনে কোন সাধই তো পূর্ণ হ'ল না, ভবিষ্যতে যে হবে সে আশাও রাখিনে। তবু এই প্রার্থনাই ক'রে যাই আজ তোমাদের সিন্ধুবেলায় দাঁড়িয়ে, মনেই যদি হয়, তবে শেলীর মত তোমাদের এই সিন্ধুজলেই যেন সে মৃত্যু-দেবতার দর্শন পাই।

এ সময় দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দল কবিকে ধরে-বেঁধে পূর্ববঙ্গ থেকে আইন সভার নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়ে ছিলেন। শরৎচন্দ্র বসুর বিশেষ অনুরোধে কবিকে এই ভূমিকায় নামতে হয়। এখানে-ওখানে নির্বাচনী ইস্তেহার বিলি করা ছাড়া তিনি আর কিছুই করেননি। ভোট পাওয়া অত সোজা ছিল না, জনপ্রিয়তা থাকলেই চলে না, অনেক কিছু কারচুপি চলে বিশেষ করে যেখানে শিক্ষার হার সবচেয়ে কম। স্বাভাবিক কারণে তিনি পরাজিত হন।

কাউকে কিছু না বলে তিনি মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেতেন—বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্র পড়ে রইল, তারা কি খাবে, কি ভাবে থাকবে তার কিছুই ব্যবস্থা না করেই চলে গেলেন। কোথায় গেলেন আর কবে ফিরবেন কিছুই জানালেন না। পুত্রদের নিয়ে কবি-পত্নীকে কবির খেয়ালীপনার জন্যে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কোথাও সভা-সমিতির জন্যে একদিনের জন্যে গেলেন, রয়ে গেলেন একমাস, এক জাযগায যাওয়ার কথা, চলে গেলেন আরেক জাযগায। একবার ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় মশাইয়ের বাড়ীতে দীর্ঘকাল রযে গেলেন। অপরিচিতকে এক নিমেষে আত্মীয় করে তোলা নজরুল-চরিত্রের এক বিশেষত্ব। সুরেনবাবুকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে 'বাবা' বলে ডাকতেন। মৈত্রেয মশাইকে তিনি 'চক্রবাক' বইটি উৎসর্গ করেছিলেন। মৈত্রেয মশাই ছিলেন কবি এবং মজলিসি ব্যক্তি। তাঁর "ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা" অনুবাদ-কবিতা বাংলা কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আর একবার সম্ভবতঃ ১৯২৭ সাল মোহনবাগান গোরা দলকে হারিযে শীল্ড পেযেছে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খেলা দেখতে গেছেন। মোহনবাগান জিতেছে, সবাইকে নিযে চন্দননগরে গঙ্গার ধারে স্ফূর্তি করার প্রস্তাব তুললেন তিনি। মাঝপথে মনে হলো চন্দননগরে না গিযে ঢাকা থেকে ঘুরে আসা যাক। এক জামা-কাপড়ে বন্ধুদের নিয়ে চললেন শিযালদ' স্টেশন। পকেটে যা টাকা আছে তা দিয়ে সবার টিকিট করা যায় না। টিকিট পরীক্ষককে পটিযে গাড়ীতে চাপলেন। গোযালন্দ থেকে জাহাজে যেতে হবে। এবার এক ফন্দী আঁটলেন—একখানি টিকিট করলেন ও একখানি মাদুর কিনে জাহাজের ডেকে গিযে গজল গান জুড়ে দিলেন— তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা মাথা নাড়িযে হাততালি দিযে তালের সমতা রক্ষা করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে ভীড় জমে গেল। যাত্রীরা শুধু নয় জাহাজের কর্মচারীরাও আকৃষ্ট হলেন। জাহাজের কাপ্তেন, টিকিট পরীক্ষক গান শুনে অভিভূত হলেন। টিকিট পরীক্ষা করার কথা আর তাঁরা তুললেন না বরং তাঁদের সুখ-সুবিধের দিকে দৃষ্টি দিলেন। এরকম করে ঢাকা পৌঁছানো গেল। কার ওখানে থাকা যায়। ইতিপূর্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হযে গেছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব নেই—আচার-

বিচারের দিক দিয়ে ছ'জনেই সমান। নজরুল মুসলমান বলে হিন্দুর ঘরের দরজা বন্ধ আর মুসলমান ঘরে তিনি কাফের। এরকম অবস্থায় কি করা যায়। বুদ্ধদেব বসুর ভগ্নিপতি সেসময় ঢাকায় উচ্চপ্রদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তাঁরই বাড়ীতে স্বামী রামানন্দ সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হোল। আর নজরুল পরতেন বাউলদের মত বেশ আর মাথাতেও ছিল ঝাঁকড়া সুদীর্ঘ কেশ। বেলুড় মঠের স্বামীজী হিসেবে পরিচয় দেওয়া হল। বাড়ীর মধ্যে আদর-আপ্যায়নের ঢেউ পড়ে গেল। বেদ-বেদান্ত উপনিষৎ, রামায়ণ মহাভারত পুরাণতন্ত্র ইত্যাদি তাঁর বেশ পড়া ছিল—কোথাও কিছু আটকাল না। শ্যামাসঙ্গীত তিনি জানতেন, সর্বোপরি লোকের হস্তরেখা বিচার তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। এভাবে তিনি দিন চার-পাঁচ কাটিয়ে কলকাতায় ফেরেন।

১৩৩৩-এর মাঘ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের (১৯২৭, ২৭শে ফেব্রুয়ারী) উদ্বোধন করেছিলেন। এখানে "আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালী" ও "বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে কে গো উদাসিনী" গান দুটি রচনা করেন। পরের বছরও তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন। "আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী", "এ বাসি বাসরে কে গো এলে ছলিতে," "চল্ চল্ চল্, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল" প্রভৃতি গান রচনা করেন। এগুলি স্বরলিপি সমেত বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের সম্পাদনায় 'প্রগতি' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৩৪, আষাঢ় মাসে ৪৫বি, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট থেকে আফজল-উল হকের সম্পাদনায় 'নওরোজ মাসিক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কবি এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ মত সম্পাদক চলতেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তাঁর 'নওরোজ' কবিতা ছাপা হয় এবং 'কুহেলিকা' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বেরোয়। পত্রিকাটি অর্থের অভাবে ছ'মাসের বেশী চলেনি।

১৩৩৬এর ২৯শে অগ্রহায়ণ, (১৯২৯, ১৫ই ডিসেম্বর) কলকাতা এলবার্ট হলে (অধুনা কফি হাউস) কবিকে জাতির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্বর্ধনা সভায় পৌরোহিত্য করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রধান অতিথি ছিলেন

সুভাষচন্দ্র বসু আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক এস, ওয়াজেদ আলী। কবিকে রূপার কাসকেট সোনার দোয়াত আর কলম উপহার দেওয়া হয়। অভিনন্দনের উত্তরে কবি বলেছিলেন—

"আমাকে বিদ্রোহী বলে খামখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনদিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, আমারো অনেক আগে থেকে মরণ তাদের তাড়া ক'রে নিয়ে ফিরছে। আমি ওতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

"একথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দররূপ সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীট্‌সের মত আমারও মন্ত্র—Beauty is Truth, Truth is Beauty. আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে—কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি; আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটেনি। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পলাতকা সাগর সন্ধানী জলস্রোত আমি, সেই গিরি-শিরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি। যেন মরু-পথে পথ না হারাই।—এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

"বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান-সেনাদলের তূর্যবাদকের একজন আমি। এই হোক আমার সব চেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথ-যাত্রার পাকে পাকে, বাঁকে বাঁকে কুটিল-ফণা ভুজঙ্গ, প্রখরদশন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি! এবং তাদের নখরদশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে-অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।

"ঈশানকোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষার ঘন প্রশান্তি দেখে, নির্লিপ্ততা দেখে। ঝড়ের বাঁশী যেদিন বাজবে, ও-উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে আসবে তার পূর্ণ-পরিচয় নিয়ে। নব বসন্তের জন্য সারা শীতকাল অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়।

"যারা আমার নামে অভিযোগ করেন, তাঁদের মত হলুম না ব'লে—তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের ক'রে দেখেন।

"আমি এই দেশে, এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল কালের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব-গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে বর্ণে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি ব'লেই কবি। বনের পাখী নীড়ের উর্ধ্বে উঠে গান করে ব'লে বন তাকে কোনদিন অনুযোগ করে না। কোকিলকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কাক তাড়া করে ব'লে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটিকে কেউই হয়ত সমর্থন করবেন না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেইটুকুই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন। আমগাছকে চৌমাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠ্যাঙান, সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পারবে না। উল্টে ঐ ঠ্যাঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও যাবে লোপ পেয়ে।

'যৌবনের রক্ত-শিখা মশাল ধ'রে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে বর-যাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই ব'লে যারা অনুযোগ করেন, তারা জানেন না আমিও আছি তাঁদের দলে ; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে। ফুল-মেলার নওরোজে আমায় খরিদদাররূপে না দেখতে পেয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন,—তাঁদেরও বলি, আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যানমূর্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। যেদিন উঠবে, সেদিন আমিও আসব ঐ মেলায় শাহজাদা খুররমের মতই আমার চোখে তাজের স্বপন নিয়ে। আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে তাঁকে ক্ষুধা-জীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ ক'রে দেখার স্তব-স্তুতি।"

১৯৩৭ সালে ফরিদপুর মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কনফারেন্সে এলেন সভাপতি হয়ে, সঙ্গে ছিলেন আব্বাসউদ্দিন ও গোলাম মোস্তাফা। ছাত্রদের

অনুরোধে 'জাতের নামে বজ্জাতি','খেলিছ এ বিশ্ব নিয়ে', 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়েব কোলে', 'যদি আরব হতাম', গান গেয়ে শোনান।

১৩৪৫-এর চৈত্রমাসে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের কাব্যশাখার সভাপতি হন (১৯৩৮, ৮ই ও ৯ই এপ্রিল)। মুসলিম ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত ১৩৪৭এর চৈত্র (১৯৪১, এপ্রিল) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জয়ন্তী অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তিনি সেদিনকার লিখিত ভাষণে বলেছিলেন,

"সকল ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা বিসর্জন দিতে হবে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নয়, ন্যায়ের অধিকারের দাবীতেই আমাদিগকে বাঁচতে হবে। আমরা কারও নিকট মাথা নত করব না—রাস্তায় বসে জুতো সেলাই করব, নিজের শ্রমার্জিত অর্থে জীবন যাপন করব—কিন্তু কারও দয়ার মুখাপেক্ষী হব না।...আমি আমার জীবনে এ শিক্ষাকেই গ্রহণ করেছি। দুঃখ সয়েছি, আঘাতকে হাসিমুখে বরণ করেছি কিন্তু আমার অবমাননা কখন করিনি। নিজের স্বাধীনতাকে কখনও বিসর্জন দিইনি। 'বল বীর চির উন্নত মম শির।' এখানে আমি আমার এ শিক্ষা অনুভূতি থেকেই পেয়েছি।" (মাসিক মোহাম্মদী—মাঘ ১৩৪৭)

১৯৪৫এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী পদক' পুরস্কার দিয়ে কবিকে সম্মানিত করেন। তখন অবশ্য কবির কোন চেতনা ছিল না। ১৯৬০এ ভারত-সরকার "পদ্মভূষণ" খেতাব প্রদান করেন।

ছন্দের সূক্ষ্ম কারুকার্য তাঁর মনকে টেনে নিয়ে যায় সুরের মায়াজালের দিকে। প্রথম প্রথম তিনি রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন। ১৩২৭এর মোসলেম ভারতের ফাগুন সংখ্যায় নজরুলের "ওরে এ কোন্ স্নেহ-সুরধুনী নামলো আমার সাহারায়" গানটির স্বরলিপি করেন মোহিনী সেনগুপ্ত। প্রধানতঃ তাঁরই অনুরোধে নজরুল তখন গান লিখতে শুরু করেছিলেন। তখনকার গানগুলিতে রবীন্দ্র-প্রভাব লক্ষ্য করা যেত। ১৩৩৩ সাল থেকে তিনি গজল গান রচনা আরম্ভ করেন। ঐ বছরের 'কল্লোলে' তাঁর গজল গান কিছু বেরিয়েছিল, যেমন 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে', 'পানিয়া ভরণে চল লো গোরী' প্রভৃতি। পূর্বে গজলগান ছিল, কিন্তু সে সব উর্দু গানের অনুকৃতি। নজরুলের গজলের গড়ন সম্পূর্ণ নতুন, বাঙালাদেশীয় সুর-সংক্রামিত

এবং কবিত্বেও তারা সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধ। নজরুল কিরূপে গজল গান রচনায় মেতে উঠলেন সে সম্বন্ধে তাঁর বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার লিখেছিলেন,—

"…দুটি হিন্দুস্থানী পথচারী ভিখারী—একজন পুরুষ, অপরটি নারী—হার্মোনিয়মের সঙ্গে উর্দু গজল গেয়ে ঊর্ধ্বমুখে চলেছে সারা পল্লীতে মধু-বর্ষণ করতে করতে। নজরুলের একান্ত আগ্রহে আমার বৈঠকখানায় তাদের ডেকে এনে গান শোনার ব্যবস্থা হ'লো। অনেকগুলো গান শুনিয়ে তারা বিদায় নিল। নজরুল তক্ষুণি বসলেন গান লিখতে। তাদের "জাগো পিয়া" গানটির রেশ তখনও আমাদের কানে যেন ধ্বনিত হচ্ছে। এই গানের সুর অবলম্বন ক'রে নজরুল কয়েক মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন—'নিশি ভোর হ'লো জাগিয়া, পরাণ পিয়া' গানটি। তাঁর গজল গান লেখার শুরু এইখান থেকে। গজল গানের নেশা তাঁকে যেন পেয়ে বসলো। অসি ছেড়ে এই বাঁশী ধরবার জন্য কয়েকজন উগ্রপন্থী বন্ধু ব্যঙ্গবিদ্রূপও করেছিলেন যথেষ্ট। রসের সন্ধান পেলে কবিপ্রাণের অপ্রতিহত গতিমুখে সকল বাধাই তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হ'লো। নজরুল এ জন্য কয়েকজন চরমপন্থী রাজনৈতিকদের বিরাগভাজন হ'য়ে পড়লেন।" (শ্রদ্ধাস্পদেষু)।

গজল গান রচনার পর থেকেই সুর-সৃষ্টিতে তাঁর স্বকীয়তা ফুটে উঠে। তাঁর গজল গানকে জনপ্রিয় করে তুললেন দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমার রায়। দিলীপকুমারকে কবি 'বুলবুল' বইটি উৎসর্গ করেন এবং তাঁর ইউরোপ যাত্রা উপলক্ষ্যে একটি কবিতা (সুর-কুমার ঃ ফণি-মনসা) লেখেন। কবির গজল গানকে ব্যঙ্গ করে সজনীকান্ত দাস পৌষ ১৩৩৪এর 'শনিবারের চিঠি'তে 'কে উদাসী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে', 'তেপায় ট্যাঁকঘড়ি তুই টিক্‌টিকিয়ে ক'স কি নিশিদিন' গান দুটি লেখেন। দিলীপকুমার বিভিন্ন সভাসমিতিতে কবির গজল গান গাইতেন বলে 'চিঠি' তাঁকেও রেহাই দেয়নি।

তাঁর ইসলামী সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করেন আব্বাসউদ্দীন আহমদ। কিভাবে কবি ইসলামী সঙ্গীত রচনার প্রেরণা পান তার একটি সুন্দর চিত্র আব্বাসউদ্দীন সাহেব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—

"একদিন কাজীদাকে বললাম, 'কাজীদা, আপনি বাঙলা দেশে আলেম-সমাজে কিন্তু ঠাঁই পেলেন না, ওরা তো আপনাকে কাফের

ফতোয়া দিয়েছে! আচ্ছা পিয়ারু কাওয়াল, কাল্লু কাওয়াল, এঁরা উর্দুতে কী সুন্দর কাওয়ালি গান করেন। এই ধরণের বাংলা গান যদি লিখে দেন তাহলে সমাজের অনেক কাজ করা হবে।' তিনি বললেন, 'ভগবতীবাবুর কাছ থেকে অনুমতি নাও এ-ধরণের গান লিখবার।' ভগবতী ভট্টাচার্য মহাশয় তখন গ্রামোফোন কোম্পানীর Representative। আমি তাঁর কাছে এ-প্রস্তাব করা মাত্র তিনি বলে উঠলেন, 'আরে না না না না—ওসব গান চলবে না। ও ধরণের রেকড বিক্রিই হবে না।' দিন যায় আমিও ছাড়বার পাত্র নই।...এক ঠোঙা পান এনে কাজিদা'র সামনে রেখে দরজা বন্ধ করে দিলাম। আধ ঘণ্টার ভেতরেই তিনি লিখে ফেললেন, 'ও মন, রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ,' 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর'। ...চারদিনের ভেতরেই গান দু'খানা রেকর্ড করে আমি দু-মাসের জন্যে বাড়ীতে এলাম। ঈদের পর কলকাতায় ফিরে গিয়ে শুনি কলকাতার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ'। রোজ বিকেলে, গড়ের মাঠে গিয়ে বসি, পাশে কেউ না কেউ গুন গুন করে গেয়ে ওঠে, 'রমজানের ঐ রোজার শেষে'। শুনে কী যে আনন্দ হতো। গ্রামোফোন কোম্পানীর আসতে লাগলো অজস্র অর্থ।...ভগবতীবাবু তখন আমাকে দেখা হলেই বলতেন, 'কাজী সাহেবের কাছে এই ধরণের ইসলামী গান আদায় করুন।' কাজীদাকে বললাম, 'কাজীদা, মুসলিম বাংলার ঘরে ঘরে আজ ধ্বনিত হচ্ছে 'ইসলামের ঐ সওদা নিয়ে এলো নবীন সওদাগর'—এই শুভ মুহূর্তে এই ঘুমন্ত জাতির প্রাণে জ্বালিয়ে দিন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার তীব্র মশাল।' তিনি তখন লিখলেন, 'দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দীন-ই ইসলাম লাল মশাল', তারপর লিখলেন, 'শহীদী ঈদগাহে জমায়ত ভারি', 'বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান' ইত্যাদি জাতীয় গানগুলি শুনে বাঙলার সহর, বন্দর এবং সুদূর পল্লী অঞ্চল থেকে আসতে লাগল তরুণ ছাত্রদের আহ্বান। ...এইসব ইসলামী রেকর্ড পেয়ে যখন মুসলমান সমাজ উল্লাসে মেতে উঠেছে তখন কে, মল্লিক সাহেব একদিন আমাকে বললেন, 'আব্বাস, জীবন ভরে ত শ্যামা সঙ্গীতই গেয়ে গেলাম, বাঙলার লোক জানতেও পারলো না আমি

কে, কাজেই কাজি সাহেবকে বলে আমার জন্য দু-খানা ইসলামী গান লিখে দাও। আমার নাম মহম্মদ কাসেম লোকে জানুক।' কাজীদা তাঁর জন্যে প্রথম ইসলামী গান লিখে দিলেন, 'বাজলো কিরে ভোরের শানাই নিজ মহলার আঁধার পুরে।' প্রায় প্রতিমাসেই ইসলামী রেকর্ড বের হতে লাগলো। বাঙলাদেশ থেকে বহু মুসলমান ভাইএর কাছ থেকে অজস্র চিঠি পেতে লাগলাম: আপনি যদি কুকুর মার্কা H. M. V. রেকর্ডে গান না দিয়ে অল্প দামের Twin রেকর্ডে গান দেন তবে আমাদের পক্ষে কেনা সহজসাধ্য হয়। H. M. Vতে গান না দিয়ে Twinএ গান দিলে শিল্পীর পক্ষে আর্থিক ক্ষতি জেনেও তবু ইসলামী গানের বহুল প্রচারের জন্যেই কোম্পানীকে বলে Twin রেকর্ডে গান বের করা আরম্ভ করলাম। প্রতিমাসে একই শিল্পীর গান বের হলে সে গান একঘেয়ে হয়ে যায়। অথচ ইসলামী গানে গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রচুর অর্থাগম হচ্ছে, তাই মুসলমান গায়কের অভাব হলো। ধীরেন দাস রেকর্ড করলেন 'গণি মিঞা' নামে, চিত্ত রায় 'দেলোয়ার হোসেন' নামে, গিরিন চক্রবর্তী 'সোনা মিঞা' নামে, হরিমতী 'সাকিনা বেগম' নামে। যাই হোক এটি করেও ইসলামী গানের হতে লাগলো বহুল প্রচার।' (আমার শিল্পী-জীবনের কথা)

ঠুংরী, গজল, কীর্তন, খেয়াল, ধ্রুপদ, টোড়ী, ভাটিয়ালী, সাঁওতালী, ঝুমুর, বাউল প্রভৃতি এদেশীয় রাগরাগিনীতে এবং আরব-তুরস্ক প্রভৃতি দেশের গানের সুরে প্রেম সঙ্গীত, বৈষ্ণব সঙ্গীত, ইসলামী সঙ্গীত, গ্রাম্যসঙ্গীত, স্বদেশী সঙ্গীত প্রভৃতি অনেক লিখেছেন। ভাবের ব্যঞ্জনায় ও সুরের ঝঙ্কারে এগুলি সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে 'নজরুল-গীতি' নামে পরিচিত। তার অধিকাংশ গান বেতারে গেয়েই শৈল দেবী, ইলা ঘোষ, সুপ্রভা সরকার, বিমলভূষণ, আব্বাসউদ্দীন, সত্য চৌধুরী, সন্তোষ সেনগুপ্ত, মৃণালকান্তি ঘোষ, কমল দাশগুপ্ত, চিত্ত রায় প্রভৃতি সঙ্গীত-আসরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

নজরুলের কবিতা জনপ্রিয়তা আনলেও কবি-প্রতিভা সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর গানে।

হরেন ঘোষ নামে একজন গায়ক কবির দুটি গানের অংশ 'হিজমাষ্টারস্ ভয়েস' প্রথম রেকর্ড করেন গীতিকারের নাম অপ্রকাশিত রেখে, কেননা নজরুলের

উপর পুলিশের সুনজর ছিল না। সেজন্য বিলিতি রেকর্ড কোম্পানীও তাঁকে পরিহার করে চলত। শ্রোতৃমহলে উক্ত গান দুটি প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে, কবির আরও গান রেকর্ড করার তাগিদা কোম্পানীর কাছে আসতে আরম্ভ করে। তখন গ্রামোফোন রেকর্ড ব্যবসায়ীরা কবির গান রচনার শক্তি ও তাঁর গানের বিপুল অর্থকরী দিক দেখে তাঁকে বেঁধে ফেলল। মেগাফোন, হিন্দুস্থান, সেনোলা তাঁর গানের রয়ালটি উচ্চ মূল্যে কিনতে লাগল। ১৯২৯এর মার্চ মাসে এইচ্-এম-ভি কোম্পানী পূর্ব গানের রয়ালটি মিটিয়ে দিয়ে তাঁর কতকগুলি গানের রেকর্ড করে। এ সময়ে কোম্পানীর ট্রেণার ছিলেন জমিরউদ্দিন খাঁ। এর কাছে কবি মার্গসঙ্গীত রপ্ত করে নেন। ১৯৩৯, ২৯শে নভেম্বর খাঁ সাহেবের মৃত্যু হয়। ১০ই ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁর শোকসভায় সভাপতিরূপে কবি বলেন,—

"আমি ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের একজন দীনভক্ত সাগরেদ।...বাংলার হিন্দু-মুসলমান তরুণ গায়করা, যারা সঙ্গীত জগতে নাম কিনেছে, তাঁরা প্রায় সবাই ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের শিষ্য।...জমিরুদ্দীন পাঞ্জাবী ছিলেন সত্য, কিন্তু মানুষহিসাবে তিনি ছিলেন সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে। বাংলা দেশে ছোটবেলায় তিনি এসেছিলেন, বাংলাকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন।...জমিরুদ্দীন খান সাহেব ছিলেন ঠুংরী সম্রাট।...গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে তিনি হাজার হাজার সুর রেখে গিয়েছেন। যে কোন সুর তিনি adopt করতে পারতেন। বহু নতুনতর সুর তিনি আবিষ্কার করতে পারতেন।

খাঁ সাহেবের মৃত্যুর পর এইচ এম-ভি কবিকে ট্রেণার নিযুক্ত করে। এতে নজরুলের আর্থিক সমস্যার সমাধান হল বটে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হল সবচেয়ে বেশী। কারণ গ্রামোফোন কোম্পানীর ফরমায়েস মত সকাল থেকে রাত্রি অবধি কোম্পানীর মহলাঘরে বৃষ্টির ধারার মত গান লিখে চলেছেন। বলা বাহুল্য এই সব গান প্রাণের প্রেরণায় লেখা নয়, নেহাতই পেটের জ্বালায় লেখা। ফরমাসী রচনায় তিনি এমন হাত পাকিয়ে ছিলেন যে, কেউ এসে বলল গজল চাই, কেউ এসে বলল শ্যামাসঙ্গীত চাই, কেউ বলল ইসলামী গান চাই। একই সময় বসে তিনি অত ধরণের গান লিখে ফেলতেন ও মুখে একটু সুর না ভেঁজেই সুরের সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি

তৈরি করে দিতেন। এ পর্যন্ত একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কাউকে একই দিনে বিভিন্ন ধরণের গান লেখা ও সেগুলিতে সুর সংযোজন করার শক্তি দেখিনি। তাই নলিনীকান্ত সরকার বলেছেন,—

"অমুক গায়ক বা গায়িকার জন্য, এই ধরণের গান, এই জাতীয় সুরের কাঠামোতে, এতটুকু পরিসরে, এতটা সময়ের মধ্যে বেঁধে দিতে হবে—এই ধরণের ফরমাইসে রচিত পাইকারী গানে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি আচান্তপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু নজরুল প্রতিভার প্রকাশ স্বাধীন-প্রেরণা-সম্ভূত, স্বতঃস্ফূর্ত হ'তে পারলো না,—বাংলা-সাহিত্য তথা বাংলা দেশের এ দুঃখ চিরকাল রয়ে যাবে।" (নজরুল ইসলাম: শ্রদ্ধাস্পদেষু)

মেগাফোন, হিন্দুস্থান, সেনোলা, হিজ্ মাষ্টারস ভয়েস রেকর্ড কোম্পানীদের বহু গান লিখে দিয়েছেন। বেতারে আসবার আগে পর্যন্ত তিনি এইচ-এম-ভি-তে গান লিখতেন। কবি নিজে কতকগুলি গান গেয়েছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শিক্ষিত ওস্তাদদের মত ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতার গুণে প্রত্যেকটি গান রূপে-রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠত, শ্রোতার মনকে অনুক্ষণ টেনে রাখত। তাঁর কণ্ঠস্বর নিম্নোক্ত রেকর্ডে রেখায়িত হয়ে আছে: মেগাফোন রেকর্ডে 'দিতে এলে ফুল হে প্রিয়,' 'কেন আসিলে ভালবাসিলে,' 'দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি,' 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম' এবং হিজ মাষ্টারস্ ভয়েসে তাঁর আবৃত্তি 'ব্রবিহারা' (N 27188) ও 'নারী' কবিতা (P 11520)।

১৯৩৪ সালে ১৬, বিবেকানন্দ রোডে 'কলগীতি' নাম দিয়ে একটি গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান খোলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাপ্তাহিক "ছায়া" পত্রিকায় এসম্পর্কে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, "আমাদের দোকানের বিশেষত্ব কলগীতির যাঁরা নিয়মিত খরিদ্দার হবেন তাদের বাড়িতে পাচটি কোম্পানীর প্রতিমাসের সমস্ত রেকর্ড শুনে পছন্দ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়।...তাঁদের অর্ডারি রেকর্ড ইত্যাদি আমাদের লোক গিয়ে বাড়িতে দিয়ে আসবে।' দোকানটি নজরুলের বেশীদিন চলেনি। দিনের পর দিন ধারে রেকর্ড দিয়ে দিয়ে দোকান ডকে উঠে গেল। পাওনা টাকা মুখ ফুটে তিনি চাইতেও পারতেন না।

নজরুল-গীতির জনপ্রিয়তা দেখে কলকাতা বেতারকেন্দ্র তাঁকে সুর ও গান রচনায় নিযুক্ত করলেন। নজরুল এইচ-এম-ভি ছেড়ে পরিপূর্ণভাবে যোগ

দিলেন বেতারে। তখন কলকাতা বেতারের সঙ্গীত বিভাগের কর্ণধার ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি বেছে বেছে প্রতিভাবান গুণীদের ধরে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে আনতেন। যন্ত্রী-সংঘের পরলোকগত সুরেন্দ্রলাল দাসের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই সময় সুরেশচন্দ্র—সুরেন্দ্রলাল—নজরুল—এই ত্রয়ীর প্রচেষ্টায় কলকাতা বেতারের সঙ্গীত-বিভাগে যে বৈচিত্র্য এবং জনপ্রিয়তা দেখা গেছল তা আর কোন কালে দেখা যায়নি। "হারমণি", "নবরাগ মালিকা" অনুষ্ঠানগুলিতে সঙ্গীতকার নজরুলের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছল। যাঁর প্রতিভা ও প্রাণ কলকাতা বেতারকে সমৃদ্ধ করল অথচ বেতারে তাঁর যোগ্য সমাদর হলো না। হীন দলগত চক্রান্তে নজরুলকে বিদায় দেওয়া হোল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গান গাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। এখন অবশ্য বেতারে আবার তাঁর গান শোনা যাচ্ছে অনেকের কণ্ঠে

গান ছাড়া তিনি নাটক উপন্যাসও লিখেছেন (রচনাপঞ্জী লক্ষিতব্য) তাঁর "আলেয়া' নাটকখানি 'নাট্য-নিকেতনে' প্রথম অভিনীত হয়—প্রথম অভিনয় রজনী, ৩রা পৌষ ১৩৩৮। একদিন কোন কারণে "আলেয়া' নাটকের 'কবির' ভূমিকার অভিনেতা অনুপস্থিত ছিলেন, প্রথম দৃশ্যেই 'কবি'কে দরকার। কর্তৃপক্ষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ওদিকে যবনিকা উঠতে দেরি হচ্ছে দেখে দর্শকরা খুব গোলমাল সুরু করে দিয়েছে। রঙ্গালয়ের কর্তা অগত্যা নজরুলকে ধরলেন। উপরোধ ঠেলতে না পেরে নজরুল নিমরাজী হলেন। যবনিকা উঠলে দেখা গেল কবি দর্শকদের পিছন হয়ে বসে আছেন—যা তাঁর থাকবার কথা নয়। সে-অবস্থাতেই তিনি অভিনয় করলেন, একবারও মুখ ফেরালেন না দর্শকদের দিকে। দৃশ্য পরিবর্তনের পর নজরুল পালিয়ে গেলেন সকলের অলক্ষ্যে। বিভিন্ন রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে অনেকের নাটকে গান লিখেছেন, গানে সুর দিয়েছেন। সর্বত্রই তাঁর সুর হয়েছিল কথার অনুসারী, যা না হলে ব্যর্থ হয়ে যায় নাটকীয় সঙ্গীত। মন্মথ রায়ের "মহুয়া" নাটকের মহুয়ার গান, "কারাগার" নাটকের ধবিত্রীর গান, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "রক্তকমল" নাটক, "সিরাজদ্দৌলা" নাটকের আলেয়ার গান, প্রবোধকুমার সান্যালের "শ্যামলীর স্বপ্ন" নাটকের গানগুলি তাঁর রচনা। এদেশের সিনেমায় যখন বাণী-চিত্রের পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী চলেছে তখন পাইওনিয়ার ফিল্ম কোম্পানী গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌরাণিক নাটক "ধ্রুব" ছায়াচিত্রে রূপ দেবার

মনস্থ করেন। এ সময় নজরুল গীতিকার সঙ্গীত ও সুর যোজনারূপে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ১৯৩৩এর নভেম্বর মাসে কোম্পানী কবিকে 'ধ্রুব' চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী তাঁকে 'নারদের' ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কবি তাতেও রাজী হলেন। 'ধ্রুব' চিত্রে মোট গান ছিল আঠারোটি—একখানি বাদে বাকী গানগুলি নজরুলের রচনা। এই চিত্রে কবি একক কণ্ঠে গেয়েছিলেন, 'মধুর ছন্দে নাচে আনন্দে', 'গহন বনে শ্রীহরিনামের মোহন বাঁশী কে বাজায়', 'ফুটিল মানস-মাধব-কুঞ্জে প্রেম-কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে', দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছিলেন 'হৃদি-পদ্মে চরণ রাখ বাঁকা ঘন-শ্যাম'। নারদের চিরাচরিত পোষাক পরিবর্তন করে কবি ধুতি ও পাঞ্জাবী-পোষাকে নারদের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল ১৯৩৫, ১লা জানুয়ারী। নারদের নতুন সাজের জন্যে প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল। এ চিত্রে কবি আশানুরূপ অর্থ পান নি। তাঁর দুটি কাহিনী ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে—'বিদ্যাপতি' (প্রথম আরম্ভ ২।৪।১৯৩৮) ও 'সাপুড়ে' (প্রথম আরম্ভ ২৭।৫।১৯৩৯)। তাঁর গানও বহু ছায়াচিত্রের গৌরব বৃদ্ধি করেছে যেমন, 'পাতালপুরী', 'সাপুড়ে', 'চৌরঙ্গী', 'দিকশূল', 'নন্দিনী', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন', 'শ্রীশ্রীতারকেশ্বর' প্রভৃতি। ছায়াচিত্রের সঙ্গীত পরিচালনাও তিনি করেছেন শৈলজানন্দের 'পাতালপুরী'তে কবিগুরুর 'গোরা' চিত্রে।

শোক-ঝঞ্ঝা

আনন্দের মধ্যে কালো মেঘের ছায়া পড়ল। ১৩৩২, ১২ই জ্যৈষ্ঠ তাঁর মা ইহলোক ত্যাগ করেন। মাতার মৃত্যুশোক তাঁর প্রাণে গভীর হয়ে বাজলো; —সেই হুগলী জেলে মাতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হবার পর থেকে আর মায়ের সঙ্গে পুত্রের সাক্ষাৎ হয়নি। মাতার প্রতি পুত্রের এই ঔদাসীন্যকে কবির খেয়াল ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। হঠাৎ তাঁর চার বছরের প্রিয় শিশু বুলবুল বসন্তরোগে মারা গেল (১৩৩৭)। কাজীর এখন দু'পুত্র বর্তমান—কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম।

বুলবুলের স্মৃতিশক্তি ছিল অদ্ভুত—একবার যা শুনত তা মনে গেঁথে রাখত। কবি গানে যা সুর দিতেন সে তা শুনে মনে রাখত। নানা ঝঞ্ঝাটে কবি

হয়ত কোন সুর ভুলে গেছেন, সে তখন কবিকে সুর মনে করিয়ে দিত। তার মৃত্যুতে কবি একেবারে ভেঙে পড়লেন। অভাব-বেদনায় জর্জরিত হয়ে কাউকে কোনদিন মুখ ফুটে বলেন নি যত গভীর বেদনাই হোক না কেন, তিনি তা অন্তরের মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছেন, বাইরে প্রকাশ করেন নি। কিন্তু বুলবুলের মৃত্যু তাঁকে আর সান্ত্বনা দিতে পারে নি। "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ" বইখানা তাকেই উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছেন—

: বাবা বুলবুল !

তোমার মৃত্যু-শিয়রে বসে "বুলবুল-ই-শিরাজ" হাফিজের রুবাইযাতের অনুবাদ আরম্ভ করি, যেদিন অনুবাদ শেষ করে উঠলাম, সেদিন—তুমি আমার কাননের বুলবুলি উড়ে গেছ। যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্তান্ ইরাণের চেয়েও সুন্দর ?

জানিনা তুমি কোথায়। যে-লোকেই থাক, তোমার শোকসন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান শেষ চুম্বন ব'লে গ্রহণ করো।......

শিরাজি-বুলবুল কবি হাফেজের কথাতেই তোমাকে স্মরণ করি—

সোনার তাবিজ, রূপার সেলেট
মানাত না বুকে রে যাব,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায়, কবরের শিয়রে তার !

নিজের সকল দুঃখ বেদনা ভুলে যাবার জন্যে ডুবে থাকতে চাইলেন অধ্যাত্মরাজ্যে শান্তি পাওয়ার আশায়। বরদাচরণ মজুমদারের নিকট হতে অধ্যাত্মশিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথা জেনে তিনি কোরাণ, গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি গভীরভাবে অনুশীলন করতে লাগলেন। গেরুয়া পরিধান করতে আরম্ভ করলেন। বাড়ির চিলেকোঠায় কালীপ্রতিমা স্থাপন করে সকাল-সন্ধ্যা মন্ত্রজপ করতে শুরু করলেন। কোন কোন বার নিরম্বু উপবাস করে ভিতর থেকে দরজা লাগিয়ে পূজা-গৃহেই দিন-দুই কাটিয়ে দিতেন।

অধ্যাত্ম-সাধনে তাঁর মন অন্তর্মুখী হবার ফলে তাঁর সৃজনী প্রতিভার নতুন নতুন পর্ব উন্মোচিত হল। এই সময়কার তাঁর সাধন-সঙ্গীতগুলি সেই সাধনারই বহিঃপ্রকাশ। 'নির্ঝরিণী', 'রেণুকা', 'মীনাক্ষী', 'সন্ধ্যামালতী', 'বনকুন্তলায়,' 'দোলনচম্পা' নাম দিয়ে কয়েকটি নতুন রাগিনীর সৃষ্টি করলেন।

আবার ফজলুল হক সাহেব কাজীকে প্রধান সম্পাদক করে আপার সারকুলার রোড থেকে "দৈনিক নবযুগ" বার করলেন (১৩৪২ : ১৯৩৫)। এই দৈনিকে তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বেশী কিছু দেবার সময় পেলেন না, জীবনে যখন নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা নিয়ে নতুন বসন্ত এল তখন চির-আনন্দ-মুখর কবি পারিবারিক অশান্তিতে পীড়িত ও বিপর্যস্ত। নজরুল প্রতিভার অপমৃত্যু হল এইভাবে—এ দুঃখ চিরকাল কাব্যরসিকদের দীর্ঘনিঃশ্বাস আকর্ষণ করবে।

শোকের সংসারে আবার দুঃখের ঝড় উঠলো। কবির স্ত্রী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন (১৩৪৭); রোগ সারাবার জন্য কবি প্রচুর অর্থব্যয় করলেন; কবিরাজী, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি নানা চিকিৎসায় ব্যর্থকাম হলেন। এমন কি, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ক্রিয়াসাধন ইত্যাদি করলেন। স্ত্রীকে সুস্থ করার জন্যে মোটর, বলিগঞ্জের জমি বিক্রী, বইয়ের স্বত্ব, রেকর্ড করা গানের রয়্যালটি অপরের কাছে বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়েছেন। রোগ সারাবার উপায় সম্বন্ধে যে যা বলেছে তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন—কালীমন্দিরে পাঁঠাবলি দিযেছেন। যে তারকেশ্বরের মোহন্তকে তাড়াবার জন্যে গান লিখেছিলেন, সেইখানে গিযেও দাঁতে কুটো দিয়ে হত্যা দিযে পড়েছেন।

বীরভূম জেলার বেলে গ্রামে দৈব ঔষধ পাওযা যায বলে তাঁর কানে খবর এল। তিনি শোনামাত্র একজন বন্ধু নিয়ে বেলে গ্রামে রওনা হলেন; সেখানকার দেবস্থানের প্রতিনিধিদের নির্দেশে এঁদো পচাপুকুরে স্নান করে পবিত্র হয়ে সেই পুকুরের শ্যাওলা ও সেখানকার তেল নিযে কলকাতা ফিরলেন। রোগ সারল না, দিনের পর দিন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠলো। আর একবার কবির কানে এসে পৌঁছল যে, ডায়মণ্ডহারবার রোড থেকে তিন মাইল পশ্চিমে একজন ভূতসিদ্ধ সাধু আছেন, তিনি মন্ত্রবলে রোগ নিরাময় করে দিতে পারেন, ঘর-ভর্তি লোকের সামনে ভূত হাজির করতে পারেন। শোনামাত্র কবি লোক পাঠালেন তাঁর কাছে। চুক্তি হোল, রোগ সারলে পাঁচ শ' টাকা আর প্রথম দিন সেলামী হিসেবে পঁচিশ টাকা দিতে হবে। এই চুক্তিতেই রাজী হয়ে তিনি এবং নলিনীকান্তবাবু শীত ও মশার কামড় সহ্য করে তাঁর কাছে হাজির হলেন। নলিনীকান্তবাবু 'বিশ্বাসী নজরুল' প্রবন্ধে এই বুজরুকি বাবাজীর বর্ণনা

দিয়েছেন এইভাবে, …"চেহারা, গাত্রচর্ম, চর্মের উপরকার বর্ণ, অঙ্গসৌষ্ঠব ও অঙ্গকান্তি দেখে মনে হলো যেন তিনি জমি চাষ করতে করতে লাঙল ও বলদ ফেলে সদ্য সদ্য ছুটে এসেছেন।" কবির বিশ্বাস কিছুমাত্র কমল না, কোন ব্যাপারেই মানুষকে অবিশ্বাস করার কথা তিনি চিন্তা করতে পারতেন না। বাবাজী ঘরে প্রবেশ করেই হুকুম করলেন যে তাঁর কাছে টর্চ ও দিয়াশলাই জমা রাখতে; পাছে না কেউ তাঁর জালিয়াতি ধরে ফেলে। তাঁর আদেশ মত সকলেই তাঁর কাছে জমা দিলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকার গৃহে বাবাজী খুব ভোজবাজী দেখালেন। কিছুক্ষণ পর আলো জ্বালিয়ে দেখালেন ঘরের চার কোণে চারখানি সদ্য তোলা শিকড় পড়ে রয়েছে। পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে নজরুল সেই শিকড়গুলি নিলেন। নানা জায়গায় পীরসাহেবদের মজার-শরীফে শিন্নী দিয়ে এবং পড়াপানী নিয়েও রোগ সারে কি না দেখলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। জীবনের সবদিক দিয়ে যখন বিফলকাম হলেন তখন তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মাল ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট আন্দোলনের সময়। শেষের দিকে পরলোকতত্ত্ব নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। প্রায় তিনি স্বপ্নে ভগবানকে দেখেছেন, তার সঙ্গে কথা বলেছেন—এই সব আজগুবি কথা বলতেন। শেষ পর্যন্ত এসব তাঁকে কোন শান্তি বা সান্ত্বনার সন্ধান দিতে পারেনি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। নেতাজী যখন ভারতের বাইরে চলে যান, তাঁর সহকর্মীরা যখন অনেকেই জেলে তখন সুভাষ-দিবস পালন করতে 'কিন্তু' 'কিন্তু' করেছিলেন। কিন্তু কবি অসুস্থতার মধ্যেও বীডন স্কোয়ারের জনসভায় সুভাষচন্দ্রের কর্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

জীবন-সায়াহ্নে

জীবন-সায়াহ্নের কবিকে আমি দেখতে গেছলুম। কবি তখন ছিলেন বাদুড়বাগান লেনে, এখন আছেন বেলগাছিয়ার ১৬৫সি, মন্মথ দত্ত রোডে। (মাঝে ছিলেন মাণিকতলায় ১৬নং রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীটে)। কবিকে কিরূপ দেখেছিলুম তার পরিচয় নিম্নে আমার ডায়েরী থেকে তুলে দিলুম।—

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯। কলকাতা গেছলুম জরুরী কাজে। ইচ্ছে হল কবি নজরুলকে দেখবার। মনে ভয়ও ছিল কেমন না জানি তাঁকে দেখব। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে কবিকে দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখলুম কবির স্ত্রী

একটি খাটে শায়িত, তাঁর পালিত মেয়েটি কাপড় সেলাই করছেন ও অনিরুদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা পত্রিকা ওলটাচ্ছেন। আমাকে হঠাৎ দেখে একটু থমকিয়ে গেলেন; আমি কেন এসেছি জিজ্ঞাসা করলেন অনিরুদ্ধ; আমার ইচ্ছে তাঁকে জানালুম। কবির স্ত্রীর সঙ্গে প্রথমে এমনি সাধারণ পরিচয়ের কথাবার্তা হল; কথাবার্তায় জানলুম তিনি পাশ ফিরতেও পারেন না, নীচের অঙ্গ পক্ষাঘাতে একেবারে অচল, অতি কষ্টে চিঠি-পত্রের উত্তর দেন। কথাবার্তা হতে হতে হঠাৎ দেয়ালে টাঙ্গানো কবির ছবি দেখলুম। কি অপরূপ সুন্দর ছবিখানা। ছবিটি দেখে মনটা একটু গুমড়িয়ে উঠল—সেই উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল মহান্ মুখশ্রী, সেই তীক্ষ্ণ আরক্ত অপাঙ্গ চোখ, সেই উদার গম্ভীর স্বচ্ছ ললাট আর কি দেখবো? ছবি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলুম। মুখ নীচু করে বসে আছি। এমন সময় কবির পালিতা কন্যা উঠে গিয়ে পাশের ঘরের কপাট খুললেন। কবি নজরুল বেরিয়ে এলেন। চমকে উঠলুম; এ নজরুলকে দেখে চোখ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে ইনিই বিদ্রোহী কবি নজরুল। পরণে একটি লুঙ্গি ও ধূসর বর্ণের হাফসার্ট। মুখে একটা উত্তেজনার ভাব ফুটে বেরুচ্ছে, তাঁর সেই বিদ্রোহী প্রাণশক্তির ছাপ অস্তরাগের বিলীয়মান আভার মত মুখে খেলা করছে। দরজার পাশেই আসন পাতা, চারদিকে বিভ্রান্তের মত তাকিয়ে আসনে বসে পড়লেন; পাশেই পুরোনো মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো ছেঁড়া অবস্থায় গুটান রয়েছে। সেগুলো পাতার 'পর পাতা উলটিয়ে চলেছেন—পড়েন না। যখন সবগুলো ওলটানো শেষ হয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে ফিরিয়ে গোছ করে আবার উলটিয়ে চলেছেন। কথাবার্তা বলেন না—মাঝে মাঝে কি একটা বলছেন তা জড়িয়ে যাচ্ছে—বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কবির স্ত্রী বললেন, 'কথাবার্তা তো বলেন না। যখন কপাট খুলে দেওয়া হয় বা কখনো নিজে কপাট খুলে ঐ জায়গাটিতে বসে ঐ বইগুলো ওলটাতে থাকেন; এই ওলটানোর ফলেই বইগুলোর অবস্থা এরূপ হয়েছে।' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন কি?' উত্তরে তিনি বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। আমরা সময়মতো খাইয়ে দি—যা দেওয়া হয় তাই খেয়ে নেন; দুপুরবেলা কোন কোন দিন একটু ঘুমোন নইলে ঘরে বসে শুধু পাগলের মত চলাফেরা করতে থাকেন বা চুপ করে বসে থাকেন আর ঐ বিড়বিড় করে বকে চলেন। রাত্রে

তাঁর বেশ ঘুম হয়। স্মৃতিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই যেন তাঁর কাছে অন্ধকার। পুরাণো বন্ধু-বান্ধবদের দেখলেও চিন্‌তে পারেন না।' কবি মাঝে মাঝে আমার দিকে উদাসভাবে তাকাচ্ছেন আর ভিজে আঙুল দিয়ে পাতা উলটিয়ে চলেছেন, কি যেন একটা জরুরী জিনিস খুঁজছেন। একটি একটি ক'রে পাতা ওলটান না; একসঙ্গে ১০।১২ পাতা ওলটান হয়ে যাচ্ছে। পূবের পাঠাভ্যাস ছাড়তে পারছেন না যেন। আমাব দিকে তাকিয়ে কি যেন বললেন। কবির স্ত্রীকে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলুম। কবি-পত্নী বললেন, 'কিছু বুঝতে পারলুম না।' আবার কবির টাঙ্গানো ছবির দিকে দৃষ্টি পড়ে গেল, শিউরিয়ে উঠলুম, যেন চিনতে পারছিনে। এ কবি আর ছবির কবি যেন এক নয়—ভিন্ন। যে কবি বলেছিলেন "আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির," তাঁব উন্নত শিরের ও ইন্দ্রিয়ের দরজাগুলো একে একে রুদ্ধ হয়ে আসছে। মুখ তাব শীণ, আগুনের মত গায়ের রং ফিকে হয়ে গেছে, কেশবের মতো যে কেশগুচ্ছ তাঁর ঘাড বেয়ে নামত তা উঠে গেছে, সে সৌম্য মূর্তি আব নেই। তাঁর কবিতার বই রইল, রইল তাঁর বিচিত্র বহুকর্মান্বিত জীবনের উজ্জ্বল অবিনশ্বর ইতিহাস—কিন্তু সমস্ত কীর্তির অন্তরালে ছিলেন যে কবি নজরুল, তিনি আব নেই—তার স্থানে আছে বোগে জীর্ণ নজরুল।

কবির স্ত্রীকে তাদের সাংসারিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলুম। তিনি বললেন, 'পূর্বে যে অবস্থায় চলত সেই অবস্থা।' কবির স্ত্রীকে অনুরোধ করলুম যে আমার খাতায় কবি যেন তাঁর নামটি লিখে দেন। তখন অনিরুদ্ধ আমার খাতা আব ফাউন্টেন পেনটি নিয়ে কবিকে দিয়ে বললেন, লেখো তো বাবা, কা…জী…নজ…রুল…ইস…লাম…' কবি নামটি লিখে দিলেন। কবি-পত্নী সেটা দেখে আমাকে বললেন, 'আপনার ভাগ্য দেখছি খুব ভাল, কেননা আজকাল উনি কোন কিছু লিখতে চান না—যদিও লেখন তাও দু'একটা অক্ষর লেখার পরই খাতা-কলম ছুঁড়ে ফেলে দেন কিম্বা একটা আঁকাবাঁকা লাইন টেনে দেন।' কবি এখনো আনমনে বইয়ের পাতা উলটিয়ে চলেছেন; বেলাও বেশ হয়েছে। কবির স্ত্রীকে নমস্কার জানিয়ে আর নির্মম দেহবন্ধনে জর্জরিত কবিকে অন্তরেই আমার শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানিয়ে বিদায় নিলুম।

আমাদের অবহেলা

বিষাক্ত সমাজের কদর্য পরিবেশ ও দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত হয়ে কবি নজরুল আজ মৃত্যুপথযাত্রী হয়েছেন। অর্থের অভাবে প্রথম আট দশ বছর কবির কোন ভাল চিকিৎসা হয়নি।

১৯৫২, ২৭শে জুনে বাঙলার সাহিত্যিক প্রধানগণ মিলিতভাবে একটি 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন করেছেন। যখন নিরাময়ের আশা তিরোহিত-প্রায় তখন কবিকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করে সমাজের সহজ জীবনে ফিরে পাবার একটা সংঘবদ্ধ চেষ্টা এতদিনে দেখা দিয়েছে। ২৫শে জুলাই (১৯৫২) কবি ও তাঁর পত্নীকে 'রাঁচী মেণ্টাল হসপিটালে' প্রেরণ করা হয়। প্রায় চার মাসব্যাপী চিকিৎসা করে উক্ত হাসপাতালের অধ্যক্ষ মেজর ডেভিস মূল ব্যাধি নির্ণয় করতে পারেন নি। ১৯৫৩-এর ১০ই মে রবিবার রাত্রে কবি ও কবি-পত্নীকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়। লণ্ডনে পাঁচজন স্নায়ুবিজ্ঞানবিদ্ ও মনো-রোগ চিকিৎসাবিদ তাঁদেরকে পরীক্ষা করেন। লণ্ডনে প্রায় ছয়মাস কাল অবস্থানের পর কবি ও কবি-পত্নীকে ৭ই ডিসেম্বর (১৯৫৩) ভিয়েনায় স্থানান্তরিত করা হয়। ডাঃ অশোক বাগচী 'ভিয়েনায় নজরুল' রচনায় বলেছেন,—

"লণ্ডনের ডাঃ রাসেল ব্রেন, ডাঃ উইলিয়াম স্যারগ্যাণ্ট এবং ডাঃ ম্যাককিস্‌ক্ প্রমুখ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কবিকে একাধিকবার পরীক্ষা করেছেন। প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ রাসেল ব্রেণের মতে কবির মস্তিষ্ক-বিকৃতি দুরারোগ্য। রোগীর রোগ সম্বন্ধেও লণ্ডনেই দুইদল বিশেষজ্ঞের মধ্যে প্রবল মতভেদ হয়েছে। এক দল বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, রোগী 'ইনভলুশনাল সাইকোশিস' রোগে ভুগছেন, অপর দল কলিকাতায় বিশেষজ্ঞদের ডায়োগোনেসিসকেই সমর্থন করেছেন। তবে উভয় দলীয় বিশেষজ্ঞদের মতেই প্রাথমিক চিকিৎসা অত্যন্ত অপরিমিত ও অসম্পূর্ণ হয়েছে। লণ্ডনের 'লণ্ডন ক্লিনিক' নামক হাসপাতালে কবির মস্তিষ্কে বাতাস পুরে 'এয়ার এনকেফ্যালোগ্রাফী' নামক এক্স-রে পরীক্ষা করা হয়। ঐ পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় যে, কবির মস্তিষ্কের পুরোভাগ অর্থাৎ 'ফ্রনট্যাল লোব'দ্বয় সঙ্কুচিত হয়ে গেছে।

ডাঃ ম্যাককিস্‌ক প্রমুখ ডাক্তারগণ বলেন যে, 'ম্যাককিস্‌ক অপারেশন' নামক অস্ত্রোপচার বিধির দ্বারা যদি কবির মস্তিষ্কের পুরোভাগে অবস্থিত ফ্রন্টোথ্যালমিক ট্রাক্ট নামক স্নায়ুপথ মস্তিষ্কের অপরাংশ হতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তবে হয়ত রোগীর বর্তমান অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বদভ্যাসগুলির উপশম হবে, কিন্তু ডাঃ রাসেল ব্রেণ এই মতের বিরোধিতা করেন। অতঃপর কবির রোগ-বিবরণী ও পরীক্ষার রিপোর্টসমূহ ভিয়েনা ও ইউরোপের অন্যান্য বহুস্থানের দ্বারা পরীক্ষা করান হয়। জার্মাণীর বন ইউনিভারসিটির মস্তিষ্ক শল্যবিদ্যার অধ্যাপক প্রোঃ রোয়েটগেণ বলেন যে, ম্যাককিস্‌ক অপারেশন কবি নজরুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভিয়েনার মস্তিষ্ক শল্যবিদ ডাঃ ম্যাককিস্‌ক-এর মতের বিরোধিতা করেন। উপরি উক্ত তিনজনেই কবির মস্তকে সেরিব্রাল অ্যানজিওগ্রাফি নামক পরীক্ষা (এক্সরে) করাব পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কবির সুহৃদগণের ইচ্ছায় কবিকে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রোঃ হ্বাগনার ইযাউরেগ-এর সুযোগ্য ছাত্র ডাঃ হানস হফ-এর অধীনে ভর্তি করা হয়। গত ৯ই ডিসেম্বর (১৯৫৩) বুধবার কবির উপর সেরিব্রাল অ্যানজিওগ্রাফি পরীক্ষা করা হয়। ডাঃ হফ এই পরীক্ষার ফলদৃষ্টে দৃঢ় মত প্রকাশ করেন যে, কবিবর পিক্‌'স ডিজিস নামক মস্তিষ্কের রোগে ভুগছেন। উক্ত রোগে মস্তিষ্কের সম্মুখ ও পার্শ্ববর্তী অংশগুলি সঙ্কুচিত হযে যায। ডাঃ হফের মতে রোগীর বর্তমান রোগলক্ষণগুলি এই রোগের সহিত মিলে যায। ডাঃ হফ বলেন যে, কবির ব্যাধি এতদুর অগ্রসর হযেছে যে, নিরাময়ের বিশেষ কোনই আশা নেই। বর্তমানে কবির আচার ব্যবহার ঠিক একটি শিশুর মত। কেক বিস্কুট প্রভৃতি দেখলেই খেতে চান। কোন ছবির বই হাতের কাছে পেলে পর পর পাতা উল্‌টিয়ে ছবি দেখেন ও অবশেষে বইটি টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে বালিসের নীচে রেখে দেন। চশমা পরা কোন লোক দেখলেই রেগে যান এবং অস্পষ্টভাবে বলেন, 'চলে যাও'। দরজা খোলা রাখা উনি বরদাস্ত করতে পারেন না, বলেন 'বন্ধ করো'। কেউ যদি কবির সামনে পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকেন তবে তিনি রেগে যান এবং পা নামিযে নিলেই চুপ করেন। ডাঃ হফ্‌ একটি চিকিৎসা-বিধি সাব্যস্ত করেছেন; ওতে হযত বা কিঞ্চিৎ উপকার হতে পারে। এই

চিকিৎসা কলকাতাতে থেকেও করা চলবে।" (যুগান্তর ২৭।১২।৫৩)। কবি-পত্নীকেও লণ্ডন ও ভিয়েনায় পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা তাঁর পূর্ণ আরোগ্যের আশা না করলেও উল্লেখযোগ্য উন্নতির আশা প্রকাশ করেছেন। তাঁরও চিকিৎসা কলকাতায় চলবে। ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৫৩, সোমবার শেষ রাত্রে কবি ও তাঁর সহধর্মিণী বিমানযোগে রোম হতে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

নজরুল প্রকৃতি

নজরুল-প্রকৃতি জানতে হলে গোলাম মোস্তাফার ছড়াটাই যথেষ্ট—

কাজি নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম।
ভায়া লাফ দেয় তিন হাত,
হেসে গান গায় দিন রাত,
প্রাণে ফুর্তির ঢেউ বয়,
ধরায় পর তার কেউ নয়।

নজরুল ইসলামের সঙ্গে যাঁরা অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন তাঁদের কয়েকজনের বিবরণ থেকে এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি এই কারণে যে মানুষ নজরুলকে যদি বুঝতে হয় তাহলে তাঁদের লেখা থেকেই বুঝতে হবে।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"নজরুলের বিদ্রোহ ও বেহিসেবী যৌবনশক্তি শুধু যে তাঁর কাব্যেই রূপায়িত হয়েছিল তাই নয় তাঁর জীবনেও পরিপূর্ণভাবে তা ফুটে উঠেছিল। সাবধানী পথিকের মত পা ফেলে চলা তাঁর স্বভাবে ছিল না, তাই সে করেছে যখন চেয়েছে মন যা। কিন্তু তাঁর মন ত শয়তানের আবাস ছিল না। তাঁর মন ছিল সকলের জন্য প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসায় ভরপুর। সেই মনের খুশি মেটাতে অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দেখেন নি তিনি কোনদিন। অনেকে বলেন, তার জন্য জীবনে অনেকখানি মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে। বন্ধু ঠকিয়েছে জেনেও সেই বন্ধুর কথায় আবার বিশ্বাস করেছেন, ঠেকে শেখেন নি কোনদিন। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও

তিনি এ বিশ্বাস কোনদিন হারান নি যে মানুষ মাত্রই সৎ, অবস্থার বিপাকে পড়ে সাময়িকভাবে যতখানি নীচতাই সে প্রকাশ করুক না কেন! আমি জানি নিজের দুঃসহ অর্থাভাবের মধ্যেও বন্ধুর দুঃখ-কাহিনীতে বিগলিত হয়ে কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করে সাহায্য করেছেন তাকে। পরে যখন জানতে পেরেছেন, যে-কথা বলে বন্ধু টাকা নিয়েছে, সেগুলি বানানো গল্প তাতে এতটুকু দুঃখ বা উষ্মাবোধ করেন নি তিনি, বলেছেন, তার অভাবটা সত্য, আমাকে হয়ত ঠিক কথা বলতে সংকোচবোধ করেছে। গল্পটা কল্পিত হলেও তার অর্থের আত্যন্তিক প্রয়োজন কল্পিত ছিল না। বলা বাহুল্য, সে টাকা নজরুলকেই পরিশোধ করতে হয়েছিল। একটা পয়সা যখন হাতে নেই, মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত হওয়ায় দিন চলে যাচ্ছে, সেই সময়ও একটি ছোট্ট মেয়ের কাছে কথা রাখবার জন্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বিশ পঁচিশ টাকার দায়ে পড়েছিল সে আমি তখন কলকাতায় সবে বাসা করেছি। প্রথমা কন্যাটির বয়স তখন তিন বছর। একদিন আদর করে নজরুল তাকে বলেছিল, মোটরে চড়িয়ে তোকে সারা কলকাতা দেখিয়ে আনব। কয়েক মাসের মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে আমার স্ত্রী-কন্যাকে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হল। এমন অবস্থায় নজরুল এসে সকালবেলায় হাঁক দিয়েছে আমাকে। আমি তখন বাড়ীতে অনুপস্থিত। শ্রীমতী জানালা দিয়ে তাকিয়ে বললে, 'কাজীকাকু' আমায় মোটরে চড়ালে না, কালই দেশে চলে যাচ্ছি। দাদু ডেকেছে।' এক মুহূর্ত বিলম্ব হল না নজরুলের, বলে উঠল, 'বৌদি, ওকে কিছু খাইয়ে দিন, বেড়িয়ে নিয়ে আসি।' তারপর ট্যাক্সিতে বসে সারাদিন ঘুরল ওরা, কোথায় চিড়িয়াখানা, কোথায় খিদিরপুরের ডক, দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ী— তারপর এখানে ওখানে ওর যত আড্ডাখানা ছিল। ট্যাক্সিখানা সঙ্গে সঙ্গেই থেকেছে। বিকেলবেলা যখন ওকে বাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে যায়, তখনও আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু ট্যাক্সিভাড়ার টাকা? তা পরিশোধ করার কোন উপায়ই নেই ওর। এবার ট্যাক্সি নিয়ে ঘোরা সুরু হল ওই ট্যাক্সির ভাড়ার টাকা সংগ্রহে। মুজফ্ফরকে ধরতে পারলে না অনেক চেষ্টা করেও, রাত আটটার সময় তালতলায় বন্ধু কুতবউদ্দীনের

কাছ থেকে চেয়ে ট্যাক্সি ভাড়া যখন পরিশোধ করলে, তখন প্রায় পঁচিশ টাকার কাছাকাছি উঠে গেছে। আমি যথেষ্ট তিরস্কার করেছিলাম নজরুলকে এর জন্য। ও জবাব করেছিল, 'টাকা দিয়েই কি আনন্দের পরিমাপ করা যায় রে? যা ব্যয় হয়েছে, তার অনেক বেশী পেয়েছি আমি।'

"যে নজরুল পরবর্তী জীবনে কালীর উপাসক হয়েছিলেন, মৌলোভী যত 'মৌলবী আর মোল্লারা' দেবদেবী নাম মুখে আনার অপরাধে যে 'পাজীটা'র জাত মারবার ফতোহা দিয়েছিলেন, 'কাফের কাজি ও', সেই নজরুলকেই জন্মত মুসলমান হওয়ার অপরাধে তদানীন্তন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে কম নাকাল হতে হয়নি। আমার বাড়ীতে নজরুলের অবাধ যাতায়াত এবং খাওয়া-দাওয়া চলত—এই অপরাধে আমার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের লোক আমার স্ত্রীর হাতে খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। অথচ কলকাতায় এসে আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী নজরুলের গানে এবং আলাপে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'এ ছেলে হিন্দু কি মুসলমান, তা ভাববার অবকাশ নেই। ওর বন্ধুত্বের জন্য যদি সমাজে একঘরে হতে হয় সে মূল্যও যথেষ্ট নয়।'…

"নজরুল যখন হিন্দুনারীর পাণিগ্রহণ করেন, তখন বাঙলার তদানীন্তন প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দও এর মধ্যে সমাজ-ধ্বংসের বীজ দেখে শিউরে উঠেছিলেন। সে যুগের প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দৈনিক যার প্রতিষ্ঠা আজও অটল—সেই পত্রিকার স্তম্ভেই অজস্র কুৎসা রটনা করা হয়েছিল নজরুল দম্পতি ও তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের সম্বন্ধে। নজরুলের বন্ধু ও বিবাহের পাণ্ডা হিসেবে আমাকে চাকরি পর্যন্ত খোয়াতে হয়েছিল।" (পরিচয়; জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯)

কবি জসিমউদ্দীন লিখেছেন'—

"চারিটা না বাজিতেই কবির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম কবি আমারই কবিতার খাতাখানা লইয়া অতি মনোযোগের সঙ্গে পড়িতেছেন। খাতা হইতে মুখ তুলিয়া সহাস্যে তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। অতি মধুর স্নেহে বলিলেন, 'তোমার কবিতার মধ্যে যেগুলি আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে আমি দাগ দিয়ে রেখেছি।

এগুলি নকল করে তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিও। আমি কলকাতার মাসিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশ করব।' এমন সময় কবির কয়েকজন বন্ধু কবির সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। কবি তাঁহাদিগকে আমার কয়টি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন।...নজরুল ইসলাম সাহেবের নিকট কবিতার নকল পাঠাইয়া সুদীর্ঘ পত্র লিখিলাম।...কিছুদিন পরে 'মোসলেম ভারতে'র যে সংখ্যায় কবির 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সংখ্যায় 'মিলন গান' নামে আমারও একটি কবিতা ছাপা হইযাছিল। চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত 'সাধনা' পত্রিকাযও আমার দুই তিনটি কবিতা ছাপা হয। ইহা সবই কবির চেষ্টায। আজও ভাবিযা বিস্ময লাগে, তখন কি-ই বা এমন লিখিতাম। কিন্তু সেই অখ্যাত অস্ফুট কিশোর কবিকে তিনি কতই না উৎসাহ দিয়াছিলেন।...

"বুলবুলের মৃত্যুর সময় আমি কলিকাতায ছিলাম না। কলিকাতা আসিযা কবিগৃহে কবির অনুসন্ধান করিযা জানিলাম, কবি ডি এম লাইব্রেরীতে গিয়াছেন। আমি সেখানে যাইয়া দেখিতে পাইলাম কবি এক কোণে বসিয়া তাঁহার হাস্যরসপ্রধান 'চন্দ্রবিন্দু' নামক কাব্যের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেছেন। পুত্রশোক ভুলিবার এমন অভিনব উপায দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, কবির সমস্ত অঙ্গে বিষাদের ছাযা। চোখ দুটি কাঁদিতে কাঁদিতে ফুলিযা গিয়াছে। কবি তাঁহার দু' একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। এখনও আমি ভাবিযা স্থির করিতে পারি না, কোন শক্তিবলে কবি তাঁর সেই পুত্রশোকাতুর মনকে এক অপূর্ব হাস্যরসে রূপান্তরিত করিযাছিলেন। আর কবিতা লিখিবার স্থানটিও আশ্চর্যজনক। যাঁহারা তখনকার দিনের ডি. এম লাইব্রেরীর সেই স্বল্প পরিসর স্থানটি দেখিয়াছেন তাঁহারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন, দোকানে অনবরত বেচা-কেনা হইতেছে, আর বাহিরের হট্টগোল কোলাহল, তার এককোণে বসিয়া কবি রচনাকার্যে রত।...

"একদিন গ্রীষ্মকালে হঠাৎ কবি আমার পদ্মাতীরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত (বুলবুলের মৃত্যুর আগে)। তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার সভ্য হইবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন। ফরিদপুর আসিয়াছেন এই উপলক্ষ্যে প্রচারের জন্য।...

"...ভোর হইলেই আমরা দুইজনে উঠিয়া ফরিদপুর সহরে মৌলবী তমিজউদ্দিন খানের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ...আমাদের বিশ্বাস ছিল, তমিজউদ্দিন সাহেবের দল নিশ্চয়ই কবিকে সমর্থন করিবেন।... কবি যখন তাঁহার ভোট অভিযানের কথা বলিলেন, তখন তমিজউদ্দিন সাহেবের একজন সংসদ বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি তো কাফের? তোমাকে কোন মুসলমান ভোট দিবে না।'...কবি কিন্তু একটুও চটিলেন না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'আপনারা আমাকে তো কাফের বলেছেন, এর চাইতেও কঠিন কথা আমাকে শুনতে হয়। আমার গায়ের চামড়া এত পুরু যে আপনাদের তীক্ষ্ণ কথার বাণ তা ভেদ করতে পারে না। তবে আমি বড়ই সুখী হব আপনারা যদি আমার রচিত দু'একটি কবিতা শোনেন।'

"সবাই তখন কবিকে ঘিরিয়া বসিলেন। কবি আবৃত্তি করিয়া চলিলেন। কবি যখন তাঁহার "মহরম" কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন, তখন যে ভদ্রলোক কবিকে কাফের বলিয়াছিলেন তাঁরই চোখে সকলের আগে অশ্রুধারা দেখা দিল।...কবি আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন। বেলা দুইটা বাজিল। কবির সেদিকে হুঁশ নাই।

"...পথে আসিতে কবিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তমিজউদ্দিন সাহেবের দল ত আমাদের সমর্থন করিবে, এবার তবে কেল্লা ফতে।' কবি তাঁহার স্বাভাবিক স্বরে উত্তর করিলেন, 'নারে, ওঁরা তো বাইরে ডেকে নিয়ে আমাকে আগেই বলে দিয়েছেন, ওঁরা আমাকে সমর্থন করবেন না।' তখন রাগে-দুঃখে কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল। রাগ করিয়াই কবিকে বলিলাম, 'আচ্ছা কবি-ভাই! এ যদি আপনি আগে হতেই জানতেন তবে সারাটা দিন ওদের কবিতা শুনিয়ে নষ্ট করলেন কেন?'

"কবি হাসিয়া বলিলেন, 'ওরা শুনতে চাইলে, শুনিয়ে দিলুম।' একথার আর কি উত্তর দিব?

"আমি আগেই বলিয়াছি, বিষয়বুদ্ধি কবির মোটেই ছিল না। একবার কবির বাড়িতে যাইয়া দেখি, খালা আম্মা কবিকে বলিতেছেন, 'ঘরে আর একটিও টাকা নেই। কাল বাজার করা হবে না।' কবি আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন তাঁর গ্রন্থ-প্রকাশকের দোকানে। পথে আসিয়াই কবি ট্যাক্সী ডাকিলেন। প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল। কবির

দেখা নাই। এদিকে ট্যাক্সীতে মিটার উঠিতেছে। যত দেরী হইবে কবিকে ট্যাক্সীর জন্য তত বেশী ভাড়া দিতে হইবে। বিরক্ত হইয়া আমি উপরে উঠিয়া গেলাম। দেখি কবি তাঁর প্রকাশকের সঙ্গে একথা-ওকথা লইয়া আলাপ করিতেছেন। আসল কথা অর্থাৎ টাকার কথা সেই গল্পের মধ্যে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। আমি কবিকে কানে কানে তাহা সমঝাইয়া দিলাম, কিন্তু কবির সেদিকে খেয়ালই নাই। তখন রাগতঃভাবেই বলিলাম, 'ওদিকে ট্যাক্সীর মিটার উঠছে সেদিকে আপনার খেয়াল নেই? কবি তখন তাহার প্রকাশককে কানে কানে টাকার কথা বলিলেন। প্রকাশক অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কবির হাতে পাচটি টাকা দিলেন। অল্পে তুষ্ট কবি মহাখুশী হইয়া তাহাই লইয়া গাড়ীতে আসিলেন। তখন দেখা গেল গাড়ীর মিটারে পাঁচ টাকাই উঠিয়াছে। ট্যাক্সীওয়ালাকে তাহাই দিয়া কবি পায়ে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।" (কাজী নজরুলকে যেমন দেখেছি: শারদীয়া দৈনিক বসুমতী ১৩৫৯)।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—

"নজরুল যে ঘরে ঢুকতেন সে ঘরে ঘড়ির দিকে কেউ তাকাতেন না। আমাদের প্রগতির আড্ডায় বার কয়েক এসেছেন তিনি, প্রতিবারেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। এমন উদ্দাম প্রাণশক্তি কোনো মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি। দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময় উছলে পড়ছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত ক'রে, মনের যত ময়লা, যত ক্লেদ, যত গ্লানি সব ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তার আপন, সব বাড়ীই তাঁর নিজের বাড়ী। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিনি যখন যার তখন তার। জোর ক'রে একবার ধ'রে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর ওঠবার নাম করবেন না—বড়ো বড়ো এনগেজমেন্ট ভেসে যাবে। ঝোঁকে প'ড়ে, দলে প'ড়ে সবই করতে পারেন।

"হয়তো দু'দিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথাও গান গাইতে গিযে সেখানেই একমাস কাটিয়ে এলেন। সাংসারিক দিক থেকে এ-চরিত্র আদর্শ নয়, কিন্তু এ-চরিত্রে রস আছে তাতে সন্দেহ কী। সেকালে বোহিমিয়ানের চাল-চলন অনেকেই রপ্ত করেছিলেন—মনে-মনে তাঁদের হিসেবের খাতায় ভুল ছিল না—জাত বোহিমিয়ান এক নজরুল ইসলামকেই দেখেছি। অপরূপ তাঁর দায়িত্বহীনতা।" (কালের পুতুল)

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় তেমন-তেমন বড়লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি,—অতি বাক্‌পটুকেও ঢোঁক গিলে কথা বলতে শুনেছি—কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর বাড়ীতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বলত, তোব এসব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, সাহসই হবে না তোর এমন ভাবে কথা কইতে। নজরুল প্রমাণ করে দিলে যে তিনি তা পারেন। তাই একদিন সকালবেলা—'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই রব তুলতে তুলতে তিনি কবির ঘরে গিয়ে উঠলেন—কিন্তু তাকে জানতেন বলে কবি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হলেন না।...

"নজরুল ধর্মের চেয়ে মানুষকে বড় করে দেখেছেন সব সময়,—তাই ধর্মনির্বিশেষে নজরুলকে ভালবাসতে কারো বাধেনি। কতদিন আমাদের বাড়ীতে গানের মজলিস বসেছে, খাওয়া দাওয়া করেছি আমরা একসঙ্গে, গোড়া বামুনের ঘরের বিধবা মা, নজরুলকে নিজের হাতে খেতে দিয়েছেন—নিজেব হাতে বাসন মেজে ঘরে তুলেছেন, বলেছেন 'ও ত আমারও ছেলে—ছেলে বড় না আচার বড়।'

"এই যে নজরুল আপনাকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিল তার প্রাণের প্রাবল্যে, হৃদয়ের মাধুর্যে—এই তো মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম, বড় আদর্শের কথা।" (কবিতা, কার্তিক, পৌষ—১৩৫১)।

কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন,—

"প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে ঢাকার কয়েকজন খান-বাহাদুর নজরুলের সঙ্গে এক আলাপ-আলোচনার আয়োজন করেছিলেন। ঠিক হয়েছিল গঙ্গায় এক বজরায় তাঁরা কবির সঙ্গে মিলিত হবেন। নির্দিষ্ট সময়ে খান-বাহাদুররা সেই বজরায় গিযে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কবির দেখা নেই। অনেক কষ্টে কবিকে উদ্ধার করা গেল এক বন্ধু-সম্মেলন থেকে—তাঁর উচ্চ হাসি হয়ত দিয়েছিল তাঁব সন্ধান। কিন্তু যখন কবিকে বলা হলো সম্মানিত খান-বাহাদুররা অনেকক্ষণ ধরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন, তখন কবি বলেছিলেন, 'আমি দেশের কবি, খান-বাহাদুর রায়-বাহাদুর রাস্তার দুই পাশ থেকে আমাকে কুর্নিশ করতে করতে এগিয়ে যাবে, এই

তো আমাদের মধ্যেকার সত্যকার সম্পর্ক।'—নিঃস্ব গুণীর এমন আত্মমহিমা-বোধের ইতিহাসবিশ্রুত দৃষ্টান্ত বেটোফেনে। আমাদের দেশে নজরুল ভিন্ন আর কোনো দরিদ্র গুণী এমন কথা বলতে পেরেছেন বলে' আমার জানা নেই।" (শাশ্বত বঙ্গ)

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"একদিন সন্ধ্যাবেলা বসে আছি তাঁর ঘরে। একদল ছেলে এলো—আমার চেয়ে বয়সে বড়। ছেলেরা একে একে নজরুলকে প্রণাম করলো, তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলো। আমি বিস্মিত। কেনন' এমন দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে আমি কাজেই পায়ের ধুলো সম্পর্কে জ্ঞান টনটনে। পরিচয়ে জানলাম, শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্রদল শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে নজরুলকে। হিন্দুর ছেলে, ব্রাহ্মণের ছেলেরা মুসলমানকে প্রণাম করে গেল। বললে, কবিদের কোন জাত নেই…।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন,—

"যেমন লেখায় তেমনি পোষাকে-আশাকেও ছিল একটা রঙিন উচ্ছৃঙ্খলতা।…নজরুলের ঔদ্ধত্যের মাঝে একটা কবিতার সমারোহ ছিল, যেন বিহ্বল বর্ণাঢ্য কবিতা। গায়ে হলদে পাঞ্জাবী, কাঁধে গেরুয়া উড়ুনি। কিম্বা পাঞ্জাবি গেরুয়া, উড়ুনি হলদে। বলত, আমার সম্ভ্রান্ত হবার দরকার নেই, আমার বিভ্রান্ত করবার কথা। জমকালো পোষাক না পরলে ভিড়ের মধ্যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব কি করে?

"মিথ্যে কথা। পোষাকের প্রগলভতার দরকার ছিল না নজরুলের। বিস্তীর্ণ জনতার মাঝেও সহজে চিহ্নিত হত সে, এত প্রচুর তার প্রাণ, এত রোধবন্ধহীন তার চাঞ্চল্য। সব সময়ে উচ্চরোলে হাসছে, ফেটে পড়ছে উৎসাহের উচ্ছলতায়, বড় বড় টানা চোখ, মুখে সবল পৌরুষের সঙ্গে শান্ত কমনীয়তা। দূরে থাকলেও মনে করিয়ে দেবে অন্তরের চিরন্তন মানুষ বলে। রঙ শুধু পোষাকে কি, রঙ তার কথায় তার হাসিতে তার গানের অজস্রতায়।" (কল্লোলযুগ)

হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন,—

"নজরুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে কতটা মধুর ঘনিষ্ঠ, কোন রকম

বর্ণনা করেই সেটা আমি বোঝাতে পারব না। আমাকে তিনি খালি মুখেই দাদা বলে ডাকতেন না, সত্যই বড় ভাইয়ের মত দেখতেন। যখন তখন ছুটে আসতেন আমার কাছে। প্রায়ই আমার বাড়ীতে কাটিয়ে দিতেন একটানা চার, পাঁচ, ছয় দিন। আমরা একসঙ্গে আহার ও শয়ন করতুম। বাকি সব সময়টা কোথা দিয়ে চলে যেত তাঁর কণ্ঠে গান আর গান আর গান শুনে। তখন তিনি সংসারী, তাঁর বাড়ীতে খোঁজ খোঁজ রব উঠেছে কিন্তু এটা বুঝেও তিনি কিছুমাত্র ব্যস্ত নন, নিশ্চিন্তভাবে চায়ের পেয়ালা খালি করছেন, পান মুখে পুরছেন আর গাইছেন।

"আমার বড মেয়ের বিয়েতে নজরুলকে নিমন্ত্রণ করতে সাহস করি নি। হিন্দুর বাড়ী, আত্মীয়স্বজনের অধিকাংশই ছুঁতমার্গ মেনে চলেন। কিন্তু বিবাহের দিন সন্ধ্যাবেলায় অনাহূত নজরুল নিজেই এসে হাজির অম্লানবদনে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অসন্তোষের সাড়া জাগতেও বিলম্ব হল না। কিন্তু আমি দুই কূল বজায় রেখেছিলুম, বন্ধুদের ও আত্মীয়দের পৃথক স্থানে আহারের ব্যবস্থা করে।

"গঙ্গার উপরে আমার নূতন বাড়ী। পূর্ণিমার রাত্রি। অকস্মাৎ নজরুলের আবির্ভাব! চীৎকার করে উঠলেন, 'দে গরুর গা ধুইয়ে। বাঃ কি জায়গায় বাড়ী করেছ দাদা? আজ আমার এইখানেই আহার ও শয়ন।' তারপরেই হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে চন্দ্রকর পুলকিত গঙ্গার দিকে তাকিয়ে গান গাইতে বসলেন।

"স্মৃতির গ্রামোফোনে সেই সব গান রেকর্ড করে রেখেছি, আজও তা শুনতে পাই যখন আবার আসে পূর্ণিমার রাত, গঙ্গাজলে সাঁতার কাটে চাঁদের আলো। কিন্তু নজরুল আজ থেকেও নেই। নিষ্ঠুর সত্য।" (যাঁদের দেখেছি ২য় পর্ব)

নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন,—

"স্বার্থবিমুখ নজরুল কোনদিনই পরার্থপরতায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না। মাত্র একটি ঘটনার কথা বলি। দক্ষিণ কলিকাতায় একটি দুঃস্থা কন্যার বিবাহ। কোনরূপে দায়-নির্বাহ করবার আয়োজন চলেছে। কন্যাপক্ষ নজরুলের পরিচিত। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নজরুল তাঁর গাড়ি নিয়ে

আমার কাছে উপস্থিত। এসে বললেন, তোমার এখন কোনো কাজ আছে? একটু এসো না আমার সঙ্গে।' 'কোথায় যাচ্ছ?' 'এসো, পরে বলছি।' নজরুল প্রথমে কিছুই ভাঙলেন না। গাড়ি সটান চৌরঙ্গি অভিমুখে চ'লে থামলো 'বেঙ্গল-স্টোরস'-এর সম্মুখে। 'বেঙ্গল-স্টোরস'-এ নেমে তখন তিনি সমস্ত কথা প্রকাশ করলেন আমার কাছে। হিন্দু-বিবাহের লৌকিক ব্যাপারের সঙ্গে নজরুলের বিশেষ পরিচয় ছিল না, সেইজন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসা। 'বেঙ্গল-স্টোরস' থেকে নজরুল ফুলশয্যার তত্ত্বের বহু জিনিস কিনলেন। গাড়ি-বোঝাই সেই সকল সামগ্রী কন্যার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নজরুল।" (পরার্থপর নজরুল : শ্রদ্ধাস্পদেষু)

নজরুলের হাত এবং মন দুই ছিল দরাজ; টাকা-পয়সার হিসেব তাঁর মাথায় যেত না। মাসে কত আয়, কত ব্যয় তিনি জানতেন না। টাকা-পয়সার আলোচনায় তিনি অস্বস্তিবোধ করতেন। বন্ধুবান্ধবদের খাইয়ে-দাইয়ে কিম্বা কারুর অভাব-অনটনের কথা শুনলে নিজের সংসারের চিন্তা না করে পকেটে যা থাকত তাই দিয়ে দিতেন।

মুক্তহস্ত কবি অর্থবিত্ত কিছুই সঞ্চয় করে রাখেন নি, অর্থাভাবে এখন তাঁকে সীমাহীন দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। সাহিত্যিকদের বিশেষ করে তরুণ সাহিত্যিকদের শক্তি ও প্রতিভাকে উৎসাহিত করে তুলতেন নানাভাবে। নজরুলের জীবনে কোনদিন গোড়ামি দেখা দেয় নি। তাঁর কাব্যই তার প্রমাণ। দাবা খেলতে তিনি খুব ভালবাসতেন। ফুটবল, ক্রিকেট খেলতে ভালবাসতেন। খেলা দেখার দিকেও তাঁর ঝোঁক ছিল। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, হস্তরেখা পাঠে তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসামান্য। বিশিষ্ট শখ বলে তাঁর কিছু ছিল না, যা ভাল লাগত তাই তার বাতিক হয়ে উঠত। তবে চা, পান, জর্দা অকাতরে খেতে পারতেন আর এগুলি তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। তিনি বলতেন, "চালাক যদি হতে চাও, লাখ পেয়ালা চা খাও।" রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতা ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর গুরুদেব; গুরুনিন্দা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। যুদ্ধে যাবার আগে একবার একজন রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করেছিল তাঁর সামনে। তিনি তাতে এতই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে যুক্তি দিয়ে তাকে না বুঝিয়ে সোজাসুজি ইঁট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেন। লোকটি তখন আদালতে মামলা রুজু করে। বিচারক তাঁকে আদালতের কার্য

শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক থাকার দণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পরে ঝগড়াও করেছেন। দেশের জাতীয় আন্দোলন নিয়ে কবির সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি রেগেমেগে 'নবশক্তি' কাগজে দু'একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। কিন্তু তা খেয়ালী কবির খেয়াল ছাড়া কিছু না। তিনি কবি-জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁকে প্রণাম করেছেন।

সাহিত্যিকদের মধ্যে দলাদলি আজ আর নূতন কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের উপরেও একদলের কম ঈর্ষা ছিল না ; নজরুলকেও বহু ঈর্ষার আঘাত সহ্য করতে হয়েছে ; তা বলে কখনো আঘাতের পরিবর্তে প্রতি-আঘাত কাউকে দেননি। কবিশেখর কালিদাস রায় খাঁটি কথা বলেছেন,—

"কাজী ছিল অসূয়ার অতীত।" (গুলিস্তাঁ—নজরুল সংখ্যা)

এবার কবির পত্নীপ্রেম ও পুত্রদের প্রতি অপত্যস্নেহের একটি গল্প বলে এ প্রসঙ্গে সমাপ্তি টানা যাক। গল্পটি কবির স্ত্রীর কাছ থেকেই শোনা। খুব বেশী দিনের কথা নয়। উন্মাদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর কবিকে যখন চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে পাঠানো হল সেই সময়কার কথা। তখন কবি একটি পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন—এর থেকে সামান্য যে পারিশ্রমিক পেতেন তাতেই সংসার চলত। কবির অবর্তমানে পত্রিকা-মালিক সে-টাকা বন্ধ করে দেন ! কিছু টাকা কবির পাওনা ছিল তাও আত্মসাৎ করার মতলবে ছিলেন। এ খবর কবির কানে যেদিন গেল সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ পথ্য খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলেন তিনি। স্ত্রী-পুত্রকে অভুক্ত রেখে নিজের উদরপূর্তি তাঁর কাছে অন্যায়। তাই শতলোকের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি জলগ্রহণে সম্মত হলেন না। সংবাদ যখন পেলেন অর্থপ্রাপ্তির তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন।

রচনাপঞ্জী

আজকের দিনে নজরুলের অমূল্য রচনাগুলি শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হওয়া উচিত কারণ নিদ্রাবশে আচ্ছন্ন জাতিকে কাব্যের ভেতর দিয়ে তিনি জাগ্রত করেছেন। এসব ছাড়াও তাঁর সাহিত্যে আছে চিরকালীন আবেদন, মানবতার চিরন্তন সত্যের প্রকাশ। আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁর বেশীর ভাগ রচনা অধুনা দুষ্প্রাপ্য, অনেকেই এর সন্ধান রাখেন না। এগুলিকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করলে দেশ ও জাতির একটি মহোপকার করা হবে। নজরুলের রচনাবলী সম্বন্ধে বাঙালীকে

সচেতন করার জন্যে সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ তাঁর গ্রন্থাবলীর একটি পঞ্জী সংকলন করে দিলুম—

কাব্য—

১. **অগ্নিবীণা**। প্রথম প্রকাশ—১৩২৯। উৎসর্গ—ভাঙা বাঙলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু।

"অগ্নি-বীণার" প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি চিত্রকর-সম্রাট শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং এঁকেছেন তরুণ চিত্রশিল্পী শ্রীবীরেশ্বর সেন।···

"ধূমকেতু"র পুচ্ছে জড়িয়ে পড়ার দরুণ যেমনটি চেয়েছিলাম, তেমনটি ক'রে "অগ্নি-বীণা" বের করতে পারলাম না।···যেসব কবিতা ও গান দেবো ব'লে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম সেগুলি দিতে পারলাম না।··· বাকী কবিতা ও গানগুলি দিয়ে এবং আরো কতকগুলি কবিতার সমষ্টি নিয়ে এই রকম আকারেরই "অগ্নি-বীণা"র দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন পনরর মধ্যেই বেরিয়ে যাবে।" (মুখবন্ধ ঃ কাজী নজরুল ইসলাম)

সূচী ঃ—উৎসর্গ কবিতা ; প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বধারিণী মা, আগমনী, ধূমকেতু, কামালপাশা, আনোয়ার, রণভেরী, শাত্-ইল-আরব, খেয়াপারের তরণী, কোরবানী, মোহর্‌রম।

২. **দোলনচাঁপা**। প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন ১৩৩০।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

সূচী ঃ—দোদুল দুল, বেলাশেষে, পউষ, পথহারা, ব্যথা-গরব, উপেক্ষিত, সমর্পণ, পূবের চাতক, অবেলার ডাক, চপল-সাথী, পূজারিণী, অভিশাপ, আশান্বিতা, পিছু-ডাক, মুখরা, সাধের ভিখারিণী, কবি-রাণী, আশা, শেষ প্রার্থনা॥

তৃতীয় সংস্করণে (শ্রাবণ ১৩৬১) কবিতার অদল বদল করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণের পউষ, পথহারা, অবেলার ডাক, পূজারিণী, অভিশাপ, পিছু-ডাক, কবি-রাণী কবিতাগুলি বাদ দিয়ে হংস-দূতী, সে যে চাতকই জানে তার মেঘ এত কি, লাল ন'টের ক্ষেতে, মদালস ময়ূর-বীণা কার বাজে গান, না মিটিতে সাধ মোর বেণুকা, তোমার ফুলের মত মন, বরষা, ঐ নীল গগনের নয়ন-পাতায়, মাত্‌লা-

হাওয়া, সবুজ শোভায় ঢেউ খেলে যায়, বনমালি, বেদনা-অভিমান, নিশীথ-প্রতিম, অ-বেলায়, হার-মানা-হার, বেদনা-মণি, পরশ-পূজা, অনাদৃতা, নীল পরী, স্নেহ-ভীতু, অকরুণ-পিয়া, মরমী, মুক্তি-বার, বিরাগিনী, হারামণি, প্রিয়ার রূপ, পাপড়ি-খোলা, বিধুরা পথিক প্রিয়া, প্রতিবেশিনী, বাদল-দিনে, মনের মানুষ, কার বাঁশী বাজিল, দহনমালা, দুপুর-অভিসার, শেষের গান, রৌদ্র-দগ্ধের গান, আলতা-স্মৃতি কবিতাগুলি সংযোজিত করা হয়েছে। এই কবিতাগুলি "ছায়ানটে"র অন্তর্গত ছিল॥

৩. **বিষের বাঁশী।** প্রথম প্রকাশ ঃ—১৬ই শ্রাবণ ১৩৩১। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৬ই শ্রাবণ ১৩৫২। উৎসর্গ—বাঙলার অগ্নি-নাগিনা মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম, রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে।

"অগ্নিবীণা" দ্বিতীয় খণ্ড নাম দিয়ে তাতে যে-সব কবিতা ও গান দেবো ব'লে এতকাল ধ'রে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলাম, সেই সব কবিতা ও গান দিয়ে এই "বিষের বাঁশী" প্রকাশ করলাম।·········বিশেষ কারণে কয়েকটি কবিতা ও গান বাদ দিতে বাধ্য হলাম। কারণ আইন-রূপ আয়ান ঘোষ যতক্ষণ তার বাঁশ উঁচিয়ে আছে, ততক্ষণ বাঁশীতে তথাকথিত "বিদ্রোহ"-রাধার নাম না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ঐ ঘোষের পো'র বাঁশ বাঁশীর চেয়ে অনেক শক্ত। বাঁশে ও বাঁশীতে বাঁশাবাঁশি লাগলে বাঁশীর ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বেশী। কেননা, বাঁশী হচ্ছে সুরের, আর বাঁশ হচ্ছে অসুরের।······

এ "বিষের বাঁশীর বিষ জুগিয়েছেন, আমার নিপীড়িতা দেশমাতা আর আমার উপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।"

(কৈফিয়ৎ ঃ নজরুল ইসলাম)

সূচী ঃ—উৎসর্গ কবিতা ; নাম-কবিতা ; ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম (আবির্ভাব ও তিরোভাব) ; সেবক ; জাগৃহি ; তূর্য-নিনাদ ; বোধন ; উদ্বোধন ; অভয়-মন্ত্র ; আত্ম-শক্তি ; মরণ-বরণ ; বন্দী-বন্দনা ; বন্দনা-গান ; মুক্তি-সেবকের গান ; শিকল-পরার গান ; মুক্ত-বন্দী ; যুগান্তরের গান ; চরকার গান ; জাতের বজ্জাতি : সত্য-মন্ত্র ; বিজয়-গান ;

পাগল পথিক ; ভূত-ভাগানোর গান ; বিদ্রোহীর বাণী ; অভিশাপ ; মুক্ত-পিঞ্জর ; ঝড় ॥

৪. **ভাঙার গান।** প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৩১। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৯৪৯। উৎসর্গ—মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে।

সূচী :—ভাঙার গান ; জাগরণী ; মিলন-গান ; পূর্ণ-অভিনন্দন ; ঝোড়ো গান ; মোহান্তের মোহ-অন্তের গান ; আশু-প্রয়াণ গীতি ; দুঃশাসনের রক্তপান ; ল্যাবেণ্ডিশ-বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত ; সুপার (জেলের) বন্দনা ; শহিদী-ঈদ ॥

৫. **ছায়ানট।** প্রথম প্রকাশ—১৩৩১। উৎসর্গ—মুজফ্‌ফর আহমদ ও কুতুবউদ্দীন আহমদ।

সূচী :—বিজয়িনী ; কমল-কাঁটা ; চৈতী-হাওয়া ; বেদনা অভিমান ; নিশীথ প্রীতম্‌ ; অবেলায় ; হার মানা হার ; লক্ষ্মীছাড়া ; শেষের গান ; নিরুদ্দেশের যাত্রী : চিরন্তনী প্রিয়া ; বেদনা-মণি ; পরশ-পূজা ; অনাদৃতা ; শায়ক বেঁধা পাখী ; হারামণি ; নীল পরী ; স্নেহভীতু ; পলাতকা ; চিরশিশু ; মানস-বধূ ; দহন-মালা ; বিদায়-বেলায় ; অকরুণ পিয়া ; ব্যথা নিশীথ ; সন্ধ্যাতারা ; দূরের বন্ধু ; আশা ; মরমী ; মুক্তিবার ; আপন-পিয়াসী ; বিবাগিনী ; প্রতিবেশিনী ; দুপুর-অভিসার ; ছল-কুমারী ; পাপড়িখোলা ; বিধুরা পথিক-প্রিয়া ; মনের মানুষ ; প্রিয়ার রূপ ; বাদল-দিনে ; কার বাঁশী বাজিল ; অ-কেজোর গান ; স্তব্ধ বাদল ; চাঁদ মুকুর ; চির চেনা ; পাহাড়ী গান ; অমর কানন ; পূবের হাওয়া ; ঝড়পূর্ব তরঙ্গ ; আলতা-স্মৃতি ; রৌদ্রদগ্ধের গান ॥

৬. **পুবের হাওয়া।** প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন ১৩৩২।

সূচী :—মরমী ; স্মরণে ; অবসর ; নিকটে ; মানিনী ; আশা ; বেদনা-মাণিক ; বেদন-হারা ; নিরুদ্দেশের-যাত্রী ; পথিক শিশু ; স্নেহ-ঋণী ; হোলি ; বে-শরম ; সোহাগ ; শরাবন্‌ তহুরা ; দুপুর অভিসার ; দহন-মালা ; পথিক-বধূ ; স্নেহ-পরশ ; বাঁশী বাজিল ; গৃহ-হারা ; অনাদৃতা ; স্নেহাতুর ; বিরহ-বিধুরা ; নিশীথ-প্রীতম্‌ ; রেশমী ডোর ; দূরের পথিক ; প্রণয় নিবেদন ; ফুল-কুঁড়ি ; পুলক ; প্রণয়-ছল ; বরষায় ;

বিদায়-বাঁশী ; শেষের ডাক ; অভিমানিনী ; শেষের প্রীতিম্ ; বিজয়িনী ॥

বেদনা-মাণিক ; বেদন-হারা ; স্নেহ-ঋণী ; দহন-মালা ; বাঁশী বাজিল ; নিশীথ-প্রীতম্ ; বরষায় কবিতাগুলি, দোলন চাঁপার তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত ॥

৭. **সাম্যবাদী**। প্রথম প্রকাশ—১৩৩২।

সূচী :—সাম্য ; সাম্যবাদী ; ঈশ্বর ; মানুষ ; পাপ ; চোর-ডাকাত ; বারাঙ্গনা ; মিথ্যাবাদী ; নারী ; রাজা-প্রজা ; কুলি-মজুর ॥

কবিতা কয়টি 'সর্বহারা' কাব্যের মধ্যে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে (২০শে ফাল্গুন ১৩৫৯) তা পরিত্যক্ত—'সঞ্চিতা'র মধ্যে সংযোজিত।

৮. **চিত্তনামা**। প্রথম প্রকাশ—১৩৩২। উৎসর্গ—মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে।

সূচী :—অর্ঘ ; অকাল সন্ধ্যা ; সান্ত্বনা ; ইন্দ্রপতন ; রাজ-ভিখারী ॥

৯. **সর্বহারা**। প্রথম প্রকাশ—১৩৩৩।

বাংলা ১৩৩৩ সালে 'সর্বহারা' প্রথম পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন ইহাতে সর্বসমেত একুশটি কবিতা ছিল। নানান কারণে বর্তমান সংস্করণে (২০শে ফাল্গুন ১৩৫৯) পূর্বের কিছু কবিতা বর্জন করা হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে কিছু নূতন কবিতা ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। (মুখবন্ধ)

সূচী :—কৃষাণের গান ; শ্রমিকের গান ; ধীবরদের গান ; চোর-ডাকাত ; মিথ্যাবাদী ; রাজাপ্রজা ; সাম্য ; প্রার্থনা ; চাষার গান ; ছাদপেটার গান ; চীন ও ভারত ; নারী ; চাষীর গান ; এই দেশ কার ; বিদায় মাভৈ ; ডাকাত লইতে এসেছে ডাকাত চাঁদ ; শ্রীমান আব্দুল মুহিত চোধুরী স্নেহভাজনেষু॥ (দ্বিতীয় সংস্করণের সূচী অনুসারে)

প্রথম সংস্করণের "সাম্যবাদী" কবিতা সমষ্টি,' ফরিয়াদ', 'আমার কৈফিয়ৎ', 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'ছাত্রদলের গান', 'সর্বহারা', 'গোকুল নাগ', কবিতাগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত কবিতাগুলি 'সঞ্চিতা'য় রয়েছে ॥

১০. **ফণি-মনসা।** প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৩৪।

সূচী :—প্রবর্তকের ঘুর-চাকায় ; যা শত্রু পরে পরে ; মুক্তিকাম ; রক্ত-পতাকার গান ; শ্রমিক মজুর ; জাগর তূর্য ; অশ্বিনীকুমার ; দীনদরদী ; ইন্দুপ্রযাণ ; সাবধানী ঘণ্টা ; বাঙলায় মহাত্মা ; সত্যেন্দ্র প্রযাণ ; হেমপ্রভা ; ক্ষুধিত ব্যাঘ্র ; বিবাগিনী · আশীর্বাদ ; দেশবন্ধু ; দে দোল দে দোল ; সুরকুমার ; যুগের আলো ॥ (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৯এর সূচী অনুসারে)

প্রথম সংস্করণের 'সব্যসাচী', 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী', 'সত্য-কবি', 'সত্যেন্দ্র প্রযাণ-গীতি', 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'পথের দিশা,' হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' কবিতাগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত কবিতাগুলি 'সঞ্চিতা'য় পাওয়া যাবে। এগুলির পরিবর্তে নতুন কবিতা দেওয়া হয়েছে ॥

১১. **সিন্ধু-হিন্দোল।** প্রথম প্রকাশ—১৩৩৪। উৎসর্গ—হবিবল্লা বাহার, শামসুন নাহার।

সূচী :—সিন্ধু (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, তরঙ্গ) ; গোপন-প্রিয়া ; অনামিকা ; বিদায়-স্মরণে ; পথের স্মৃতি ; উন্মনা ; অতল পথের যাত্রী ; দারিদ্র্য ; বাসন্তী ; ফাল্গুনী ; মঙ্গলাচরণ ; বধূ-বরণ ; অভিযান ; রাখীবন্ধন ; চাঁদনী রাতে ; মাধবী-প্রলাপ ; দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর ॥

১২. **ঝিঙেফুল।** প্রথম প্রকাশ—১৯২৬। ছোটদের কবিতা।

সূচী :—ঝিঙেফুল ; খুকু ও কাঠবিড়ালী ; খোকার খুশী ; খাডু দাডু ; দিদির বে'তে খোকা ; মা ; খোকার বুদ্ধি ; খোকার গল্প বলা ; চিঠি ; প্রভাতী ; লিচুচোর ; হোঁদল কুৎকুঁতের বিজ্ঞাপন ; ঠ্যাংফুলী ; পিলে পটকা ॥

১৩. **সাত ভাই চম্পা।** ছোটদের কবিতা।

১৪. **পুতুলের বিয়ে।**

সূচী :—পুতুলের বিয়ে ; কালো জামাই রে ভাই ; জুজুবুড়ীর ভয ; কে কি হবি বল ; ছিনিমিনি খেলা ; কানা মাছি ; নবাব ; নামতা পাঠ ; সাত ভাই চম্পা ; শিশু-যাদুকর ॥

১৫. **জিঞ্জীর।** প্রথম প্রকাশ—১৩৩৫।

সূচী :—বার্ষিক সওগাত; অঘ্রাণের সওগাত; মিসেস এম. রহমান; নকীব; খালেদ; সুবেহ-উম্মেদ; খোশ্ আমদেদ্; নওরোজ; ভীরু; অগ্রপথিক; ঈদ মোবারক; আয় বেহশ্‌তে কে যাবি আয়; চিরঞ্জীব জগলুল; আমানুল্লাহ্; উমর ফারুক; এ মোর অহঙ্কার॥

১৬. **চক্রবাক**। প্রথম প্রকাশ—১৩৩৬। উৎসর্গ—বিরাট প্রাণ, কবি, দরদী—প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু।

সূচী :—উৎসর্গ কবিতা; নাম কবিতা; তোমারে পড়েছে মনে; বাদল-রাতের পাখী; স্তব্ধরাতে; বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি; কর্ণফুলী; শীতের সিন্ধু; পথচারী; মিলন-মোহানায়; গানের আড়ালে; ভীরু; এ মোর অহঙ্কার; তুমি মোরে ভুলিয়াছ; হিংসাতুর; বর্ষা-বিদায়; সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে; অপরাধ শুধু মনে থাক; আড়াল; নদীপারের মেয়ে; ১৪০০ সাল; চক্রবাক; কুহেলিকা॥

হালের সংস্করণে (১৩৬১) ভীরু; বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি; পথচারী; গানের আড়াল; এ মোর অহঙ্কার; বর্ষাবিদায় কবিতাগুলি 'সঞ্চিতা'য় আছে বলে পরিত্যক্ত হয়েছে॥

১৭. **সন্ধ্যা**। প্রথম প্রকাশ—১৩৩৬।

সূচী :—তরুণ তাপস; আমি গাই তারি গান; জীবন-বন্দনা; ভোরের পাখী; কাল-বৈশাখী; নগদ কথা; জাগরণ; জীবন; যৌবন; তরুণের গান; চল চল্ চল্; ভোরের সানাই; যৌবন-জল-তরঙ্গ; রীফ সর্দার; বাংলার আজীজ; সুরের দুলাল; নিশীথ অন্ধকারে; শরৎচন্দ্র, অন্ধ স্বদেশ-দেবতা; পাথেয়; দাড়ি-বিলাপ; তর্পণ; না-আসা দিনের কবির প্রতি॥

১৮. **প্রলয়-শিখা**—প্রথম প্রকাশ—১৯৩০। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র ১৯৫৬।

সূচী : প্রলয়-শিখা; নমস্কার; হবে জয়; পূজা-অভিনয়; যৌবন; ভারতী-আরতি; বহ্নি-শিখা, খেয়ালী; রঙীন খাতা; বৈতালিক; সমর-সঙ্গীত; চাষার গান; গান; যতীন্দ্র-প্রয়াণ; নব-ভারতের হলদি-ঘাট; জাগরণ; যতীন দাস; বিংশ শতাব্দী; শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র; রক্ত-তিলক॥

১৯. নতুন চাঁদ প্রথম প্রকাশ—১৯৪৫।

সূচী :—নতুন চাঁদ ; চির জনমের প্রিয়া ; আমার কবিতা তুমি ; নিরুক্ত ; সে যে আমি ; অভেদম্ ; অভয়-সুন্দর ; অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি ; কিশোর রবি ; কেন জাগাইলি তোরা ; দুর্বার যৌবন ; আর কতদিন ; ওঠ রে চাষী ; মোবারকবাদ ; কৃষকের ঈদ ; শিখা ; আজাদ। দ্বিতীয় সংস্করণে ঈদের চাঁদ ও চাঁদনী রাতে কবিতা দুটি সংযোজিত॥

২০. মরু-ভাস্কর। প্রথম প্রকাশ—১৯৫০।

"মরু-ভাস্কর" বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনী কাব্য। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় এই অমর কাব্যের অংশবিশেষ প্রকাশিত হইয়াছিল।······যদিও শেষ নবীর সম্পূর্ণ জীবনী ইহাতে নাই—জীবনী শেষ হইবার পূর্বেই কবির লেখনী নীরব হইয়া গিয়াছে—তবুও এখানে যতটুকু আছে, তাহাই আমি ত্রুটিহীনভাবে পাঠকদের সম্মুখে পরিবেশন করিবার প্রয়াস পাইলাম॥ (আমাদের আরজ : প্রকাশক)

২১. সঞ্চয়ন। প্রথম প্রকাশ—১৩৬২।

সূচী :—প্রার্থনা ; কোথায় ছিলাম আমি ; আগমনী ; মা এসেছে ; মোরা দুই সহোদর ভাই ; ছাত্র-সঙ্গীত ; নব-ভারতের হল্‌দিঘাট ; ঝুমকো লতায় জোনাকী ; জননী জাগো ; ঘুমপাড়ানী গান ; মটকু মাইতি বাঁটকুল রায় ; বর প্রার্থনা ; আমি যদি বাবা হতাম বাবা হ'ত খোকা ; প্রজাপতি ; পার্থ-সারথি ; আমরা সেই সে জাতি ; সুপার (জেলের) বন্দনা ; জল্‌সা ; চন্দ্র-মল্লিকা ; বাঙালীর দাড়ি ; খোকার গল্প বলা ; বগ দেখেছ ; অপরূপ সে দুরন্ত ; ফ্যাসাদ ; আগুনের ফুলকি ছোটে ; মায়ামুকুর ; জাগো সুন্দর চিরকিশোর (নাটক)॥

২২. শেষ সওগাত। প্রথম প্রকাশ—২৫শে বৈশাখ ১৩৬৫।

ভূমিকা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনি ভূমিকায় জানিয়েছেন, "নজরুল ইসলামের পরিণত প্রতিভার দান বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা 'শেষ সওগাত' রূপে এই সঙ্কলনে তাঁর অগণন অনুরাগীদের কাছে উপস্থিত করতে পেরে এ গ্রন্থের প্রকাশকের সঙ্গে আমিও অত্যন্ত আনন্দিত।"

সূচী :—জাগো সৈনিক-আত্মা ; কেন আপনারে হানি ; হেলা ; নবাগত উৎপাত ; বন্ধুরা এসো ফিরে ; নারী ; নিত্য প্রবল হও ; আগ্নেয়গিরি বাঙ্‌লার যৌবন ; তুমি কি গিয়াছ ভুলে ; চিরবিদ্রোহী ; ভয় করিও না হে মানবাত্মা ; সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি ; হুল ও ফুল ; কোথা সে পূর্ণযোগী ; রবির জন্মতিথি ; করুণ বেহাগ ; বড়দিন ; নবযুগ ; শোধ করো ঋণ ; মোহরম ; আর কত দিন ; বিশ্বাস ও আশা ; ডুবিবে না আশাতরী ; সকল পথের বন্ধু ; তোমারে ভিক্ষা দাও ; বকরীদ ; আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও ; এ কি আল্লার কৃপা নয় ; মহাত্মা মোহসিন ; এক আল্লাহ জিন্দাবাদ ; গোড়ামি ধর্ম নয় ; জোর জমিয়াছে খেলা , বোমার ভয় ; কচুরীপানা ; টাকাওয়ালা ; কবির মুক্তি ; ছন্দিতা ; পূববঙ্গ ; আরতি ; পার্থ-সারথি ; আত্মগত ; কাবেরী-তীরে ; অমৃতের সন্তান ॥

২৩. **ঝড়**। প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ ১৩৬১ ।

সূচী : উঠিয়াছে ঝড় ; জীবনে যাহারা বাঁচিল না ; আমানুল্লাহ্‌ ; ভোরের পাখী ; বাংলার আজাজ ; শাত-ই-অরব্‌ ; খোকার গপ্‌প বলা ; গদাই-এর পদ বৃদ্ধি ; কর্থ্যভাষা ; দীওয়ান-ই-হাফিজ ; ক্ষমা ক'রো হজরত ; সাম্পানের গান ; চিঠি ; রীফ্‌ সদার ; খালেদ ; শরৎচন্দ্র ; তরুণের গান ; অ-নামিকা ; জীবন ; যৌবন ; তর্পণ ; নগদ কথা ; জাগরণ ; আরবী ছন্দের কবিতা ॥

২৪ **সঞ্চিতা**। প্রথম প্রকাশ—১৩৩৫ । উৎসর্গ—বিশ্বকবি সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু।

একই বছরে একই সঙ্গে 'সঞ্চিতা'র দুটি সংস্করণ বেরোয় । বর্মণ পাবলিশিং হাউস থেকে যে সংকলন বেরোয় (২রা অক্টোবর ১৯২৮ ; পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩০) তাতে অগ্নি-বীণা, ঝিঙেফুল, সর্বহারা, ফণিমনসা, ছায়ানট, দোলন-চাঁপা, সিন্ধু-হিন্দোল, চিত্তনামা থেকে কবিতা সংকলিত করা হয়েছিল । একই সময়ে (১৪ই অক্টোবর ১৯২৮) ডি. এম. লাইব্রেরী থেকে যে সঞ্চয়ন বেরোয় (পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৩) তাতে অগ্নিবীণা, দোলন চাঁপা, ছায়ানট, সর্বহারা, ফণি-মনসা, সিন্ধু-হিন্দোল, চিত্তনামা, ঝিঙেফুল, বুলবুল, জিঞ্জীর কাব্যগুলির

কবিতা বাছাই করা হয়েছিল। অধুনা এই সংস্করণটি প্রচলিত আছে এবং চক্রবাক, সন্ধ্যা, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ থেকে কিছু কবিতা সংযুক্ত করা হয়েছে ॥

শোনা যায় কবির 'প্রলয়ংকর', 'নমস্কার' ও 'নির্ঝর' নামক আরও তিনখানি কাব্য রয়েছে। জানি না এ তথ্য কতদূর সত্য। 'নমস্কারে'র পাণ্ডুলিপি পুলিশ নষ্ট করে দিয়েছে। 'নির্ঝর' নামপৃষ্ঠা বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ বইটি নাকি ছাপা হয়েছিল কিন্তু গ্রন্থরূপে কোনদিন বাজারে প্রকাশিত হয়নি।

গান ও স্বরলিপি

১. **বুলবুল** (১ম খণ্ড)। প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন ১৩৩৫। উৎসর্গ—সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলেষু।

গজল গানের বই। ৪৯টি গান আছে। গ্রন্থের প্রথমে অমলেন্দু দাশগুপ্ত গানের আলোচনা করেছেন। পরে 'নজরুল-গীতিকা'য় এই বই থেকে ৩৩টি গান গ্রহণ করা হয়েছে ॥

২. **বুলবুল** (২য় খণ্ড)। প্রথম প্রকাশ—১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।

"কবির আধুনিক গানগুলি সংকলন করে বুলবুল (২য়) প্রকাশ করা হল। …এই গানের বইটির আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে কবির আধুনিক অপ্রকাশিত কতকগুলি গান আমরা দিতে পেরেছি।" (প্রকাশিকার নিবেদন)

১০১টি গান আছে ॥

৩. **চোখের চাতক**। প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।

প্রধানতঃ গজল গানের বই। ৫১টি গান আছে ॥

৪. **চন্দ্রবিন্দু**। উৎসর্গ—পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলে।

সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়; নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় ১৩।১২।১৯৪৫। দ্বিতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৫২।

এই বইতে ৪৩টি গান ও ১৮টি কমিক গান রয়েছে ॥

৫. **সুরসাকী**। প্রথম প্রকাশ—১৩৩৮। দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৬১। ৯৯টি গান আছে ॥

৬. **জুলফিকার**। প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র ১৩৩৯। দ্বিতীয় সংস্করণ—পৌষ ১৩৫৯।

ইসলামী গানের বই। ৫৪ খানি গান রয়েছে। (দ্বিতীয় সংস্করণের সূচী অনুসারে)॥

৭. **বন-গীতি**। প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন ১৩৩৯। উৎসর্গ—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত্-মোবারকে।

প্রথম সংস্করণে গানের সংখ্যা ৭১ : দ্বিতীয় সংস্করণে (আষাঢ় ১৩৫৯) ৭৭টি গান রয়েছে॥

৮. **গুলবাগিচা**। প্রথম প্রকাশ—১৩৪০। উৎসর্গ—আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রকুমার ঘোষ অভিন্নহৃদয়েষু।

৮৮টি গান রয়েছে। নূতন সংস্করণে ৯৬টি গান আছে॥

৯. **গানের মালা**। প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর ১৯৩৪।

১০. **গীতি-শতদল**। প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৪১।

"গীতি-শতদলে"র সমস্ত গানগুলিই "গ্রামোফোন" ও স্বদেশী "মেগাফোন" কোম্পানীর রেকর্ডে রেখা-বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। (দু'টি কথা : নজরুল ইসলাম)

১০১ খানি গান আছে॥

১১. **নজরুল-স্বরলিপি**। প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৩৮। উৎসর্গ—গীত-শিল্পী বন্ধু শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য এম. এ. করকমলেষু।

ইহাতে স্বদেশী ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, গজল, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি বিভিন্ন ঢংএর গানের স্বরলিপি দেওয়া হইল। ······ইহার অধিকাংশ গানই "নজরুল-গীতিকা"র। (কৈফিয়ৎ : নজরুল ইসলাম)

৩০ খানি গানের স্বরলিপি রয়েছে॥

১২. **সুরলিপি**। প্রথম প্রকাশ—অগাষ্ট ১৯৩৪।

"'সুরলিপি'তে প্রকাশিত প্রায় সব গানগুলিই গ্রামোফোন রেকর্ড হ'য়ে গেছে, গীত-শিল্পীদের মুখে মুখে গীত হয়েও গানগুলি লোকপ্রিয় হয়ে আছে—কাজেই 'সুরলিপি' অন্ততঃ তাঁদের আনন্দদান করবে যাঁরা স্বরলিপি দেখে গানের নির্ভুল সুর শিখতে চান।" (মুখবন্ধ : নজরুল ইসলাম)

৩১টি গানের স্বরলিপি রয়েছে। স্বরলিপি তৈরী করেছেন জগৎ ঘটক ॥

১৩. **সুর-মুকুর।** প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর ১৯৩৪।

২৭ খানি গানের স্বরলিপি রয়েছে। গানে সুর দিয়েছেন কবি নিজে আর স্বরলিপি তৈরী করেছেন নলিনীকান্ত সরকার ॥

১৪. **নজরুল-গীতিকা।** প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র ১৩৩৭।

বিভিন্ন গানের বই থেকে গীত সংকলন। জাতীয় সঙ্গীত ১৪টি, ঠুংরী ২২টি, হাসির গান ৬টি, গজল ৩৫টি, ধ্রুপদ ৬টি, কীর্তন ২টি, বাউল-ভাটিয়ালী ৭টি, টপ্পা ৬টি, খেয়াল ২৯টি—মোট ১২৭ খানি গান রয়েছে ॥

অনুবাদ

১. **রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ।** প্রথম প্রকাশ—আষাঢ় ১৩৩৭। উৎসর্গ—বুবুল।

"আমি অরিজিন্যাল (মূল) ফার্সি হ'তেই এর অনুবাদ করেছি। আমার কাছে যে কয়টি ফার্সি দীওয়ান-ই-হাফিজ আছে, তার প্রায় সব কয়টিতেই পঁচাত্তরটি রুবাইয়াৎ দেখতে পাই।......আমি হাফিজের মাত্র দুটি রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি—যদিও আরও তিন চারটি বাদ দেওয়া উচিত ছিল। আমি এ দুটির অনুবাদ মুখবন্ধেই দিলাম। (মুখবন্ধ ঃ নজরুল ইসলাম)

অনুবাদের শেষে কবি হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী কবি লিখেছেন।

২. **কাব্যে আমপারা।** প্রথম প্রকাশ—১৩৪০ (১৯৩৩)। উৎসর্গ—বাঙলার নায়েবে-নবী মৌলবী সাহেবানদের দস্ত-মোবারকে।

"আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র 'কোর-আন' শরীফের বাঙলা পদ্যানুবাদ করা।......'কোর-আন' শরীফের মত মহাগ্রন্থের অনুবাদ করতে আমি কখনো সাহস করতাম না বা তা করবারও দরকার হত না— যদি আরবী ও বাঙলা ভাষায় সমান অভিজ্ঞ কোনো যোগ্য ব্যক্তি এদিকে অবহিত হতেন।

"...আজ যদি আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই 'কোর-আন' মজীদ, হাদিস, ফেকা প্রভৃতির বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন, তাহলে বাঙালী মুসলমানের তথা বিশ্ব-মুসলিম সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন।

"আমার বিশ্বাস, পবিত্র কোর-আন শরীফ যদি সরল বাঙলা পদ্যে অনুদিত হয় তাহ'লে তা অধিকাংশ মুসলমানই সহজে কণ্ঠস্থ করতে পারবেন—অনেক

বালক-বালিকাও সমস্ত 'কোর-আন' হয়ত মুখস্থ ক'রে ফেলবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি যতদূর সম্ভব সরল পদ্যে অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছি। খুব বেশী কৃতকার্য যে হয়েছি তা বলতে পারিনে—কেননা কোর-আন-পাকের একটি শব্দও এধার ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে কবিতায় সঠিক অনুবাদ করার মত দুরূহ কাজ আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানিনে।......

"মক্তব-মাদ্রাসা, স্কুল-পাঠশালার ছেলে-মেয়েদের এবং স্বল্প-শিক্ষিত সাধারণের বোধগম্য ভাষাতেই আমি অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি। যদি আমার এই দিক দিয়ে এই প্রথম প্রচেষ্টাকে পাঠকবর্গ সাদরে গ্রহণ করেন—আমার সকল শ্রম সার্থক হ'ল মনে করব।" (আরজ : নজরুল ইসলাম, আগষ্ট ১৯৩২)

সূচী :—ফাতেহা, নাস, ফলক্, ইখ্লাস, লহব্, নসর, কাফেরুন, কাওসার, মাউন, কোরায়শ, ফীল, হুমাজাত, আস্‌র্, তাকাসুর, কারেয়াত, আ'দিয়াত, জিল্‌জাল, বইয়েনাহ্, কদর্, আলক্, তীন, ইনশেরাহ, দোহা, লায়ল, শামস্, বালাদ্, ফজর, গাসিয়া, আ'লা, তারেক, বুরুজ্, ইন্‌শিকাক, তাৎফিক, ইনফিতার, তকভীর, আবাসা, নাজেযাত, নাবা। শানেনজুল (অর্থাৎ এই অধ্যায়ে সূরাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে ॥)

৩. **রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম।** প্রথম প্রকাশ—১৯৬০। ভূমিকা—সৈয়দ মুজতবা আলী। ১৯৩টি রুবাইয়ের অনুবাদ ॥

গল্প ও উপন্যাস

১. **ব্যথার দান**। প্রথম প্রকাশ—১৩২৯। উৎসর্গ—মানসী আমার। মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম ব'লে ক্ষমা করনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রলুম।

সূচী :—ব্যথার দান, হেনা, বাদল বরিষণে, ঘুমের ঘোরে, অতৃপ্ত কামনা, রাজবন্দীর চিঠি ॥

২. **রিক্তের বেদন**। প্রথম প্রকাশ—১৯২৫।

সূচী :—রিক্তের বেদন, বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী, মেহের-নেগার, সাঁজের বাতি ; রাক্ষুসী, সালেক ; স্বামীহারা ; দুরন্ত-পথিক ॥

৩. **শিউলি-মালা**। প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর ১৯৩১।

সূচী ;—পদ্ম-গোখ্‌রো ; জিনের বাদশাহ্ ; অগ্নি-গিরি ; শিউলি-মালা ॥

৪. **বাঁধন হারা**। প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৩৪। উৎসর্গ—সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু। পত্রোপন্যাস॥

৫. **কুহেলিকা**। প্রথম প্রকাশ—জুলাই ১৯৩১। উপন্যাস॥

৬. **মৃত্যুক্ষুধা**। প্রথম প্রকাশ—১৩৩৬ ফাল্গুন। উপন্যাস।

চিত্র-কাহিনী

১. বিদ্যাপতি

২. সাপুড়ে

নাটক

১. **ঝিলিমিলি**। প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর ১৯৩০।

সূচী:—ঝিলিমিলি, সেতুবন্ধ, শিল্পী, ভূতের ভয়—এই চারটি একাঙ্ক নাটিকা॥

২. **আলেয়া**। প্রথম প্রকাশ—১৩৩৮। উৎসর্গ—নট-রাজ্যের চির-নৃত্য-সাথী সকল নট-নটীর নামে "আলেয়া" উৎসর্গ করিলাম।

'কল্লোল' সাহিত্য-সংবাদে মন্তব্য করেন—"নজরুল ইসলাম একখানি অপেরা লিখেছেন। প্রথমে তার নাম দিয়েছিলেন 'মরু-তৃষা'। সম্প্রতি তার নাম বদলে 'আলেয়া' নামকরণ হয়েছে। গীতিনাট্যখানি সম্ভবত মনোমোহনে অভিনীত হবে। এতে গান আছে ৩০ খানি। নাচে গানে অপরূপ হয়েই আশা করি এ অপেরাখানি জনসাধারণের মন হরণ করবে।" (১৩৩৬, আষাঢ়)

আলেয়ার বর্তমান সংস্করণে (১৩৬৩) ঝিলিমিলি নাটিকা সংযোজিত॥

৩. **মধুমালা**। প্রথম প্রকাশ—মাঘ ১৩৬৫। গীতি-নাট্য।

মধুমালার গোড়ার কথা লিখেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

রেকর্ড নাট্য

১.	**বিদ্যাপতি**	হিজ মাষ্টারস ভয়েস	N9766—72. সেট নং ১১৯
২.	**বিয়েবাড়ী**	"	N7326—8, সেট নং ৪৩
৩.	**শ্রীমন্ত**	"	N7424—6, সেট নং ৭২
৪.	**পুতুলের বিয়ে** ১-২	"	GT24—29
৫.	**ইদলফেতর** ১-৪	"	

৬. **প্রীতি-উপহার** ১-৬ হিজ মাষ্টারস ভয়েস

৭. **বনের বেদে**

প্রবন্ধ

১. **যুগবাণী।** প্রথম প্রকাশ—১৯২২। ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।

সূচী :—নবযুগ, গেছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ; ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ; ধর্মঘট; লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য; মুহাজেরিন হত্যার জন্য দায়ী কে; বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান; ছুঁৎমার্গ; উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন; মুখবন্ধ; রোজ কেয়ামত বা প্রলয় দিন; বাঙালীর ব্যবসাদারী; আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন; কালা আদমীকে গুলি মারা; শ্যাম রাখি না কুল রাখি; লাটপ্রেমিক আলি ইমাম; ভাব ও কাজ; সত্যশিক্ষা; জাতীয় শিক্ষা; জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়; জাগরণী॥

২. **রাজবন্দীর জবানবন্দী** (১৯২৩)।

৩. **রুদ্রমঙ্গল।** সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।

সূচী :—রুদ্রমঙ্গল; আমার পথ; মোহর্‌রম বিষ-বাণী; ক্ষুদিরামের মা; ধূমকেতুর পথ; মন্দির ও মসজিদ॥

৪. **দুর্দিনের যাত্রী।** (১৩৩৩)।

সূচী :—আমরা; লক্ষ্মীছাড়ার দল; তূবড়ী বাঁশীর ডাক; মোরা সবাই স্বাধীন সবাই রাজা; স্বাগত; ম্যয় ভুখা হুঁ; পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ; আমি সৈনিক॥

৫. **ধূমকেতু।** প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ ১৩৬৭।

সূচী :—ধূমকেতুর আদি উদয়-স্মৃতি; ধূমকেতুর পথ; আমার ধর্ম; মোহর্‌রম; মুশকিল; লাঞ্ছিত, বিষবাণী; নিশান-বরদার; তোমার পণ কি; ভিক্ষা দাও; আমি সৈনিক; বর্তমান বিশ্বসাহিত্য; ম্যায় ভুখা হুঁ; কামাল; ব্যর্থতার ব্যথা; আমার সুন্দর; ভাববার কথা; আজ চাই কি; নজরুল ইসলামের পত্র; একখানি চিঠির উত্তরে॥

সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্রিকা

১. **দৈনিক নবযুগ** (১৯২০ ও ১৯৩৫)

২. **ধূমকেতু** (১৯২২, ১১ই আগষ্ট—সাপ্তাহিক—অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক—পাক্ষিক)

৩. **লাঙল** (সাপ্তাহিক ১৯২৫, ১৬ই ডিসেম্বর : ১৩৩২, ১লা পৌষ)

৪. **নওরোজ** (মাসিক ১৩৩৪, আষাঢ়)

নজরুল কাব্যের অনুবাদ

১. **পায়ামে শরাব** (উর্দু)

২. **জহরিলা আঁসু** („)

৩. **সঞ্চয়ন** (উড়িয়া)

উর্দু, উড়িয়া ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে কবির কবিতা ইংরেজী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ভারতের বাইরে রুশ ভাষায় তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতা সমষ্টি, তুর্কী ভাষায় 'কামাল পাশা', আরবীতে 'চিরঞ্জীব জগলুল' এবং অন্যান্য ভাষায় আরও অনেক কবিতা অনূদিত হয়েছে।

নজরুল-লিখিত ভূমিকা

গুণগ্রাহী নজরুল কিছু গুণের পরিচয় পেলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই গুণের উৎসাহ দিতেন। পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি অনেক গ্রন্থকারকে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর লিখিত ভূমিকা-সহ যে কয়খানি গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছিল তার মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমার চোখে পড়েছিল, তবে অনুমান করি তাঁর লিখিত অপরের বইয়ের ভূমিকা আরও কিছু রয়েছে যেগুলি সংগ্রহের অপেক্ষা রাখে।—

১. **স্মৃতিলেখা** (কাব্য)—খগেন ঘোষ।

২. **আয়না** (ব্যঙ্গাত্মক গল্প)—আবুল মনসুর আহমদ।

নজরুলের অনেক গান, কবিতা, প্রবন্ধ, রেকর্ডনাট্য নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে—এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। গ্রামোফোন ও বেতারের ফাইল ঘাঁটলে তার বহু গান পাওয়া যাবে। সেগুলি

লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে উদ্ধার করে সাধারণের অধিগম্য হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি॥

নজরুল ও বাংলা সাহিত্য

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম বাঙলা প্রতিভার এক অপূর্ব অবদান। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিক থেকে (১৯১৭ খ্রীঃ) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিক পর্যন্ত (১৯৪২ খৃঃ)—এই কয়টি বছর কাজী নজরুলের সাহিত্যিক জীবন। মাত্র পঁচিশ বছরের স্বল্প-পরিসর কবি-জীবনে তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে রেখে গেছেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মৃত্যুহীন স্বাক্ষর। আমাদের সাহিত্যে সে এক চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর অধ্যায়।

বাংলা-সাহিত্য তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু পাবার আশা করেছিল কিন্তু তাঁর কবি-জীবনের পরিণতি হল বড় করুণ সুরে, দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে আজ তিনি কবলিত। তাই নজরুলের কবি-জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি দেখে মনে হয়, এ যেন তেল ফুরোবার আগেই মহাকালের নির্মম নিঃশ্বাসে তিনি নিবে গেলেন, শুধু পঁচিশ বছরে এক ঝলক জীবনের উল্লাস নিক্ষেপ করে গেলেন বাঙালীর চোখে ও তাঁর সাহিত্যে। আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যকে যাঁরা শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন তাঁদেরকে নিজের গরজেই বই পড়তে হবে। কারণ এসব কাব্যের পাতা খুললে তাঁরা একজনের পরিচয় পাবেন যিনি প্রকৃতই কবি এবং প্রকৃত অর্থে শ্রেষ্ঠ কবি।

ফরাসী চিত্রশিল্পী দমিয়ের ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে কোন এক সমালোচক বলেছিলেন,—

> "He was content to possess the street and to conquer the future."

নজরুল সম্পর্কেও একথা অসঙ্কোচে বলতে পারি। যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা ঐশ্বর্যশালী, যাঁরা আভিজাত্যগর্বী, যাঁরা গজদন্তমিনারে দিন কাটান তাঁদের কবি নজরুল নন। পথের মানুষ যারা, সেই অশিক্ষিত, উপেক্ষিত, দলিত জনসাধারণের কবি হলেন নজরুল। নজরুল নিজের রচনা সম্পর্কে নাকি বলেছিলেন,—

"আমি উঁচু বেদীর উপর সোনার সিংহাসনে বসে কবিতা লিখিনি। যাদের মূক-মনের কথাকে আমি ছন্দ দিতে চেয়েছি, মালকোঁচা মেরে সেই তলার মানুষের কাছে নেমে গেছি। 'দাদারে' বলে দু'বাহু মেলে তারা আমায় আলিঙ্গন দিয়েছে। আমি তাদের পেয়েছি তারা আমায় পেয়েছে।"

তাই তাঁর সাহিত্যে তাঁকে দেখেছি শোষিত সর্বহারাদের প্রতিভূরূপে।

ঃ হীরা মানিক চাস্ নি ক' তুই
চাস্ নি ত' সাত ক্রোর,
একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র
ভরা অভাব তোর।
চাইলি রে ঘুম শ্রান্তিহরা
একটি ছিন্ন মাদুর-ভরা,
একটি প্রদীপ আলো-করা
একটু কুটীর-দোর।
আস্‌ল মৃত্যু আস্‌ল জরা,
আস্‌ল সিঁদেল চোর।

(সর্বহারা : সর্বহারা)

ঃ হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পা-হাত,
পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাত,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ তারাই দেবতা, নাহি তাদের গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!
তুমি শুয়ে রবে তেতলার' পরে, আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে!

(সাম্যবাদী : সর্বহারা)

: জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমি-দার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ
মাটির মালিক তাঁহারাই হন—
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান।

(ফরিয়াদ : সর্বহারা)

: তোর হাঁড়ির ভাতে দিনেরাতে যে দস্যু দেয় হাত,
তোর রক্ত শুষে হ'ল বণিক হ'ল ধনীর জাত—
তাদের হাড়ে ঘুণ ধরাবে তোদেরই এই হাড়
তোর পাঁজরার ঐ হাড় হবে ভাই যুদ্ধের তলোয়ার!
তোরই মাঠে পানি দিতে আল্লাজী দেন মেঘ,
তোরই গাছে ফুল ফোটাতে দেন বাতাসের বেগ,
তোরই ফসল ফলাতে ভাই চন্দ্র সূর্য উঠে
আল্লার সেই দান আজি কি দানব খাবে লুটে?

... ...

হাত তুলে তুই চা দেখি ভাই, অমনি পাবি বল,
তোর ধানে তোর ভরবে খামার নড়বে খোদার কল।

(ওঠ রে চাষী : নতুন চাঁদ)

: এক আল্লার সৃষ্টি সবাই, এক সেই বিচারক,
তাঁর সে লীলার বিচার করিবে কোন্ ধার্মিক বক?
বকিতে দিব না বকাসুরে আর, ঠাসিয়া ধরিব টুঁটি।
এই ভেদ-জ্ঞানে হারায়েছি মোরা ক্ষুধার অন্ন-রুটি।
মোরা শুধু জানি, যার ঘরে ধন রত্ন জমানো আছে,
ঈদ আসিয়াছে, জাকাত আদায় করিব তাদের কাছে।
এসেছি ডাকাত জাকাত লইতে পেয়েছি তাঁর হুকুম,
কেন মোরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিব, সহিব এই জুলুম?

(ঈদের চাঁদ : নতুন চাঁদ)

এসব পড়ে বুঝতে পারি উপেক্ষিত অনাদৃত মহামানবকে কতখানি ভালবাসতেন তিনি। ভীষ্মের মত তিনি বলেছিলেন, ন হি মনুষ্যাৎ পরতরং কিঞ্চিৎ', —'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান।'

বুর্জোয়া সমাজ মানুষের জীবন নিয়ে যেখানে জুয়োখেলা খেলে সেখানে মানুষকে সত্যি সত্যি ভালবাসতে গেলে বিদ্রোহী না হয়ে উপায় নেই। নজরুলের কাব্যে এজন্যে বিদ্রোহের প্রচণ্ড সুর অনুভব করি। তাঁর রচনার মধ্যে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেরই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাদের অন্তরের কথাই তাঁর কাব্যে রূপ পেয়েছে। (বিদেশী শাসন হতে মুক্তি-প্রচেষ্টার বিদ্রোহী এবং সংগ্রামী ভাবটাই তাঁর রচনার একটি বিশিষ্ট দিক।) আত্মবিস্মৃত মানুষের আত্মচেতনা ও আত্মোপলব্ধি জাগানো তাঁর কাব্যের অন্যতম লক্ষ্য। মানুষের দুঃখকে সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছেন আর এই জগদ্ব্যাপী দুঃখের মূলে দেখেছেন মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়। রাষ্ট্র ও সমাজের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের অবিচল ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী অক্লান্তভাবে অগ্নি উদ্গারণ করে বিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের মত। কেননা—

ঃ সত্য সেবিয়া দেখিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি।

প্রায়ই একটা অনুযোগ শোনা যায় যে, নজরুল-কাব্যে স্নিগ্ধ প্রেমের বা প্রকৃতির কবিতা নেই। এ অপবাদ যে কতটা মিথ্যা তা 'ছায়ানট', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক' কাব্যগুলির পাতা খুললে কান ও চোখ এদুটি ইন্দ্রিয়ই তৃপ্তি পায় প্রচুর।

নজরুলের সর্বাধিক কৃতিত্ব কবিতার চেয়ে গান রচনায়। এখানে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। তাই আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস নজরুল অজরামর হয়ে রইবেন তাঁর গানের জন্যে। কতিপয় জননেতার নেতৃত্বে বাঙলাদেশে যখন অসহযোগ আন্দোলনের বৃহত্তর বিপ্লব আরম্ভ হলো তখন প্রয়োজন হল দেশবাসীর জড়ত্ব ভাঙবার জন্যে তাদের কথা নিয়ে গান রচনা করার। সেদিনকার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের গান থাকলেও নজরুল তাঁর ঝাঁকালো সুর নিয়ে যেই দেখা দিলেন সেই মুহূর্তেই অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। কারণ হোল তাঁর স্বদেশী গানে মূক জনসাধারণ নিজেদের অব্যক্ত মনের ব্যক্ত পরিচয় খুঁজে পেল। গজল গান, হাসির গান, শ্যামাসঙ্গীত,

বৈষ্ণব সঙ্গীত, ইসলামী সঙ্গীত ইত্যাদি রচনা করে ইতিমধ্যেই বাংলা গীতিকাব্যে নজরুলের যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

কবিতা গান ছাড়া গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক ইত্যাদি লিখেছেন। তবে এগুলির ওপর তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত নয়। 'সালেক', 'অগ্নিগিরি', 'হেনা', 'পদ্ম-গোখরো' গল্পগুলি গল্পপিপাসু বাঙালীকে একদিন তৃপ্ত করেছিল একথা বিস্মৃত হলে গল্প-লেখক নজরুলের প্রতি সত্যিই অবিচার করা হবে। 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতী' যে কয়টি কথা বলেছিলেন সে কথাগুলি নজরুলের সমস্ত গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে বলা চলে :

> "গল্পগুলিতে বৈচিত্র্য আছে, সবগুলিই রোমান্স; তাহাতে ব্যথার সুরই আগাগোড়া বাজিয়াছে। কাবুল, বেলুচিস্তান, সাহারার ক্যাম্প, এমনি নানা বিচিত্র জায়গার বিচিত্র দৃশ্য-মাধুরীতে ও সেখানকার আবহাওয়ায় গল্পগুলি ভারী মিঠা মসগুল হইয়া উঠিয়াছে। তবে গল্পগুলি কবিত্বের অত্যুগ্র উচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে এমনি ফ্যানাইয়া উঠিয়াছে যে তাহা একঘেয়ে হইয়া রসভঙ্গ করিয়াছে। ভাষায় মুদ্রাদোষও মাঝে মাঝে আছে। নহিলে গল্পগুলি মন্দ নয়।" (শ্রাবণ, ১৩২৯)

তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 'আলেয়া' উপন্যাসের মধ্যে 'মৃত্যু-ক্ষুধা' সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলা গদ্য কতটা কাব্য-গুণান্বিত হতে পারে, 'প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী' কি করে 'বিনিষ্ক্রান্তাসিকারিণী' সংহারকর্ত্রী মহাকালী হতে পারে তার প্রমাণ নজরুলের প্রবন্ধ-পুস্তকগুলি।

নজরুল-সাহিত্য যে একেবারে হীরের টুকরো তা নয়; ত্রুটিবিচ্যুতি অনেক আছে; অবশ্য সম্পূর্ণ ত্রুটিশূন্য প্রতিভা সাহিত্য-সংসারে দুর্লভ। এ ত্রুটি কম বেশী পরিমাণে রবীন্দ্র-সাহিত্যে আছে, কালিদাস-কাব্যে আছে, জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে আছে। নজরুলের এমন কতকগুলি রচনা আছে যাতে শুধু হৈ চৈ আছে কবিত্ব নেই; এমন অনেক আছে যে প্রথমটা বেশ আরম্ভ হয়েছে কিন্তু শেষের দিকটা শব্দযোজনার দোষে মাটি হয়ে গেছে। তাঁর সুবিপুল প্রাণশক্তি সর্বগ্রাসী অনুভূতি এমন অনেক স্তবক ও পংক্তির সৃষ্টি করেছে যাতে শিল্প-রসিকরা মুগ্ধ হবেন অথচ কবি এধারে একেবারে উদাসীন। মিল, শব্দযোজনা, ব্যাকরণসঙ্গত অলঙ্কারাদির দিকে সাধকের মত দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি, যা মনে এসেছে তাই লিখে গেছেন। গ্যেটে

বায়রণ সম্পর্কে বলেছিলেন, "The moment he reflects, he is a child." এদিক দিয়ে বায়রণের সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য ধরা পড়ে। এসব ত্রুটি নিয়ে বাংলা সাহিত্যের অমরাবতীতে অমরতার আসন তিনি পাবেন কিনা জানি না ; তবে তিনি তাঁর সাহিত্য-সাধনাকে জাতির জীবন-দানেরই সাধনামন্ত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন।✓

নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা

কোন্ কবি কার প্রিয় কিংবা কার কবিতা কাকে ভালো লাগে এসব মতামত বিভিন্ন মানুষের মেজাজের ওপর নির্ভর করে। ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা কাজেই মানুষের একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু যখন কেউ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কবি সম্পর্কে মন্তব্য কিংবা কবিতার একটা মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন তখন সেকথাকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতের পর্যায়ে ফেলা যায় না। সেই ব্যক্তির বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে দু'চার কথা বলতেই হয়। কেউ বলেন নজরুল একজন নিছক পদ্যকার স্বভাবকবি, কেউ আবার বলেন নজরুল রবীন্দ্রযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। এঁদের কথা বোঝা যায়, কথায় আতিশয্য থাকলেও কিন্তু কেউ যদি বলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়ো কবি, একটি বিশেষ জাতির কবি, একটা বিশেষ দেশের কবি তাঁর মস্তিষ্ক সম্পর্কে সন্দিহান হয়েও প্রতিবাদ কিছু করতেই হয়। নজরুল সম্পর্কে একটা মনগড়া ব্যাখ্যা এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে—অবশ্য কবির সুস্থ অবস্থাতেও কিছু কিছু লক্ষ্য করা গিছল। তাঁকে তাঁর স্ব-সমাজ 'কাফের' বলেছেন, জন্মতঃ মুসলমান বলে রক্ষণশীল হিন্দু যা তা মন্তব্য করেছেন—এগুলো তাঁর সাহিত্য-জীবনকে বিশেষ কিছু বিপন্ন করেনি। এমন কি কোন একটি মুসলিম পত্রিকায় তাঁর সাহিত্যের মূল্যবিচার প্রসঙ্গে একটি কার্টুনও বেরিয়েছিল যার বিষয়বস্তু দিয়া নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে নজরুলের দিকটা ভারী দেখানো—সেদিন কবি লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন আর আমরা সেই পত্রিকার অর্বাচীনতা সম্পর্কে প্রাণ খুলে হেসেছিলাম। মানুষের বোঝার ক্ষমতার সীমা আছে কিন্তু না-বোঝার ক্ষমতা যে অসীম একথা সেদিন বিশেষ করে মনে পড়েছিল। আস্তে আস্তে দেশ ও সমাজের অবস্থা পরিবর্তিত হল; আমরা স্বাধীন হলাম—দেশ বিভক্ত হয়ে গেল। স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র গঠিত হল। বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম তাঁদের সেই অর্বাচীনতা ঘুচে গেছে, নজরুল-সাহিত্যের মূলধারা হয়ত তাদের বোধগম্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের ধারণাটাই ভুল হল—সেদিনের সেই অর্বাচীনতা যাকে হেয়জ্ঞান করেছিলাম সেটিই ধীরে ধীরে

বিরাট আকার ধারণ করেছে। অবশ্য একটি প্রভাবশালী মুসলিম দৈনিকের পৃষ্ঠায় আমরা তার নিদর্শন দেখেছি কিন্তু প্রতিবাদ করার প্রয়োজন দেখিনি কারণ ঐ পত্রিকাটি বিশেষ কোন প্রগতিশীল চিন্তাধারার পাশ দিয়ে চলে বলে আমার জানা নেই। আজ আমার আতঙ্কিত হবার সবচেয়ে বড়ো কারণ যে নজরুলের বন্ধুস্থানীয় মুসলিম অনুরাগী কয়েকজন কবি সম্পর্কে কয়েকটি জীবনী লিখতে গিয়ে কবিকে মুসলিম প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে তাঁর বিবাহাদি, দেশের অন্নপ্রাশন ইত্যাদি হালকা বিষয়গুলিকে যার বিস্তৃত উল্লেখ জীবনীরচনায় অপরিহার্য নয় তাকে অযথা মুসলিম ছাঁচে ঢেলে দেখানো হচ্ছে যে কবি প্রথম থেকে ইসলামের একজন খিদমদগার, দেব-দেবীর যে গুণকীর্তন তা তাঁর সাময়িক চিত্তবিক্ষেপ। হিন্দুমহিলাকে বিয়ে করলেও তাকে ইসলামিক ছাঁচে গড়ে নিয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথের মতন একজন মহান কবি, তাঁর মতন বিরাট জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাকে যা কাব্য আস্বাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নয় সবকিছু জড়িয়ে নিয়ে এক বিরাট পুরুষ হিসেবে খাড়া করার এমন এক বিশ্রী প্রয়াস করছেন যে কবি সুস্থ থাকলে প্রতিবাদ তাঁকেই করতে হত—আজ তিনি অসুস্থ ঐ মন্তব্যের কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত করে না, কবির আত্মীয়স্বজনকে প্রতিবাদ করতে অনুরোধ জানাই। আমি তাঁর জীবনী সম্পর্কে কোন কিছু বলতে পারব না কারণ আমি সে-সময়কার লোক নই কিন্তু তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে যে মন্তব্য একটি দেশে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সে-সম্পর্কে কঠোর প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

এতকাল আমি এ সম্পর্কে নিশ্চুপ ছিলাম কারণ নিজেই ভেবেছি বিরুদ্ধ-পক্ষের অভিমতকে প্রাধান্য দেবার অর্থই হোলো যে অহেতুক তাদের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়া। আজ দেখছি সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। আমার উষ্মার প্রধান কারণ হচ্ছে যে কবির সৃষ্টিকে পর্যন্ত বিকৃত করা হচ্ছে, নিজেদের খেয়াল ও স্বার্থমাফিক কবির রচনার শব্দকে পরিবর্তন করে নিজেদের অভিমতকে দৃঢ় করছেন। যেমন 'চল্ চল্ চল্' গানে আছে—

ঃ নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

চল্ রে নৌ-জোয়ান,
শোন্ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।

এই লাইনগুলি তাঁদের হাতে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে নিম্নরূপ—

ঃ তাজা-ব-তাজার গাহিয়া গান
সজীব করিব গোরস্থান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

চল্ রে নও-জোয়ান্,
শোন্ রে পাতিয়া কান—
নয়া জমানার মিনারে মিম্বারে
জীবনের আহ্বান।

এই জাতীয় পরিবর্তনে সেই দেশের সরকারের সমর্থন রয়েছে এবং উক্ত উদ্ধৃতি সরকারী প্রকাশনা থেকেই তোলা হয়েছে। কবির রচনার যদি এইভাবে বিকৃত করার অবাধ স্বাধীনতা অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে তাহলে আমাদের উত্তরপুরুষ এক মহাসমস্যার মধ্যে পড়বে এবং এখনই তো নজরুলের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের এক সংস্করণের সঙ্গে অন্য সংস্করণের লাইন ও যতিচিহ্নগত অমিল দেখা যাচ্ছে। কবির অনুরাগী এবং যাঁরা তাঁর বই প্রকাশ করেন তাঁরা যেন একটু সতর্ক ও সবিশেষ আলোচনা করে গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নেন। আমিই তো মাঝে মাঝে প্রবল অসুবিধার সম্মুখীন হই।

উষ্মার কারণ বললাম এবার দুঃখের কারণ বলি। আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ হোল, যেসব পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁদের নামের আগে ও পিছনে বহু লেজুড় দেওয়া আছে, যাঁদের পাণ্ডিত্য পর্বতপ্রমাণ, তাঁরা কি করে অজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। এতকাল সফোক্লিসের কথাটাই বিশ্বাস করতাম, "অনেক মূর্খ যদি এক জায়গায় এসে জোটে তবে যে-কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিকে তাঁরা বধ করতে পারে।" আজ দেখছি জ্ঞানী ব্যক্তিকে বধ করার জন্যে মূর্খের দরকার হয় না। এবার কয়েকটি আপত্তিজনক মন্তব্য উল্লেখ করি—

১. নজরুল ইসলাম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যে সাহিত্যিক রূপ দিলেন এবং ইসলাম ধর্মের যে গভীর মর্মবাণী উদ্ঘাটিত করিলেন, তাহাতে বাংলার মুসলমানের চোখ খুলিয়া গেল, হৃদয়ে জাতি হিসাবে বাঁচিবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। দেশের স্বাধীনতায় ইহার ফল যে-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাংলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায়ও তাহা রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই দিক হইতে নজরুল ইসলামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বাধ্য হইয়াই বলিতে হয়, তিনিই বাংলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম স্বাপ্নিক। (মুস্লিম বাংলা সাহিত্য পৃঃ ৩৮ঃ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক এম. এ, পি-এইচ-ডি)

২. দিন যতই বেড়ে চললো, ততই 'রবীন্দ্রযুগের সঙ্কোচ ও 'নজরুল যুগে'র সম্প্রসারণ শুরু হল। কার্যতঃ দেখা গেল, রবীন্দ্রাথের মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর যুগের প্রভাব বাংলা সাহিত্য থেকে একরূপ বিদায় নিয়েছে; আর তার সাথে বেড়ে চলেছে কবি নজরুলের প্রভাব। (৮।৫।৫৭ তারিখে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে ডঃ এনামূল হক কর্তৃক কথিত।)

৩. নজরুলই সম্ভবতঃ একমাত্র কবি, যিনি এদেশের হিন্দুমুসলমান দুই বৃহৎ জাতিকে বলিষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন।...তাই তিনি সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পেরেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বোধ হয় একক। বংকিম, শরৎচন্দ্র এমন-কি রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যক্ষেত্রে সবসময় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। (যুগস্রষ্টা নজরুল ঃ খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন)

৪. পাকিস্তানের সংগ্রাম ও সাধনায় কবি নজরুল ইসলামের দান ও খেদমতের আলোচনা আপাতঃদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক এবং অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়া বিচিত্র নয়। আমার মতে বিষয়টি মোটেই অস্বাভাবিক বা অহেতুকী নয়। (পাকিস্তানের পটভূমিকায় কাজী নজরুল ইসলাম ঃ মীজানুর রহমান এম. এ.)

ওপরের মন্তব্যাদি থেকে দুটি কথা পারষ্কার আহরণ করা যায় যে নজরুল রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়ো কবি আর একটি যে তিনি পাকিস্তানের স্রষ্টা। মোটামুটি এই দুটো কথাই কখনও স্পষ্টভাবে কখনও আভাষে ইঙ্গিতে প্রচার করা হচ্ছে।

পাকিস্তানের কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় আমি কয়েকবছর যাবৎ লক্ষ্য করে আসছি যে তাঁরা যেন হিন্দুদের দিকে তাকিয়ে বলতে চান তোমাদের যেমন

রবীন্দ্রনাথ আছেন তেমনি আমাদের নজরুল—যেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল দুটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কবি। তোমাদের রবীন্দ্রনাথের চেয়েও নজরুল বড়ো কবি। আকাশস্পর্শী ধৃষ্টতা একেই বলে! রবীন্দ্রনাথ ধর্মগত সমাজগত সমস্ত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং তাঁর সংকীর্ণতামুক্ত জীবনবোধ বাঙালী বুদ্ধিজীবিকে আজও প্রভাবিত করছে। একটা সর্বমানবিক উদার মতাদর্শই যাঁর কবিকৃতির মূল প্রেরণা ছিল তাঁকেই কিনা 'হিন্দু কবি' বলা হচ্ছে—তিনি নাকি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি! আশ্চর্য মনোবৃত্তি!!

নজরুল যখন বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেন তখন রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশয় প্রভাব সমস্ত সাহিত্যিক চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। যুদ্ধ ফেরৎ নজরুল নিয়ে এলেন সৈনিকজীবনের অভিজ্ঞতা; জীবনানুভূতি স্বতন্ত্র হওয়ায় তাঁর প্রকাশরীতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াবার জন্যে তাঁকে বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের কবিদের মত সজ্ঞানকৃত চেষ্টা করতে হয়নি কারণ যাঁরা সেদিন সজ্ঞানকৃত চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল কম, বেশী ছিল পড়াশুনাজনিত বিদ্যাবত্তা। অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে ঐসব বাংলা কবিতা ইংরেজী সাহিত্যের ধার করা পোষাক। কিন্তু নজরুল জীবনকে দেখেছেন, মানুষকে দেখেছেন, আঘাত খেয়েছেন, আঘাত দিয়েছেন, তাদের সমতলে নেমে ক্ষুধার তাড়না অনুভব করেছেন, কাজেই অভিজ্ঞতার জোরে অনায়াস-স্বাচ্ছন্দ্যে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত হয়েছেন—সেটা জীবনের উন্মাদনার দিকটা যে উন্মাদনা যৌবনের অঙ্গ তাকেই রূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছু দূরত্বের সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু প্রেম-প্রকৃতি বর্ণনায় তাঁর স্বকীয়তা বিদ্রোহীরূপের মত প্রখর নয়। যৌবনের উন্মাদনা সৃষ্টির প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি অসামান্য হতে পারেন, সেটা তাঁর কৃতিত্ব হতে পারে, কিন্তু এটির জোরেই তাঁকে রবীন্দ্রনাথ বানানো যায় না। বুদ্ধদেব বসুর কথায় রবীন্দ্রনাথ 'প্রতিযোগিতার পরপারে বিশ্রামে. শুভ্রতাময়'। একটি অখণ্ড ধারণার ভিত্তির ওপর রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত বলেই আমাদের বিচিত্র অনুভূতির লব্ধ অভিজ্ঞতা, জীবনাতীত লোকের ধ্যান-ধারণা, জীবনময় রূপের প্রতিটি ছন্দের সম্পূর্ণ চিত্রটি তাঁর সাহিত্যে প্রতিভাসিত। কোনদিন তিনি তাৎক্ষণিকের নেশায় মাতেন নি অথচ কালের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ এমন এক সখ্যতা স্থাপন করেছিলেন,

মনীষার উদার ক্যানভাসে ভাবনাকে সংযম ও সুষমাভূষিত করেছেন যা বিরাটের ব্যাপ্তি পেয়েছে। কাজেই তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে সমগ্র বিংশ শতাব্দী সমগ্র বিশ্বের মর্মকথাটি উদ্ঘাটিত। তিনি জীবনবেদের ঋষি, সাহিত্যকলায় তিনি বিশ্বকর্মা। কিন্তু নজরুল ঐ বিরাট যুগের একটি ছোট্ট সময়ের কবি—যে সময়ের শুরু হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে আর শেষ হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এসে। এই অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে নজরুল অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, মানুষের উত্তপ্ত হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। সময়ের প্রয়োজনকে তিনি কাব্যে লাগাতে পেরেছিলেন বলেই সে যুগপরিবেশে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল যেমন ছিলেন সত্যেন দত্ত। ভারতবর্ষে একটা অস্থির চাঞ্চল্য যুদ্ধাবসানের ক্লান্ত পরিবেশকে আলোড়িত করে তুলেছে—একটা বিশ্বজোড়া ভাঙনের অরাজক সমাধানে তুষ্ট হতে প্রত্যেকেই ব্যগ্র কারণ একদিকে অর্থনৈতিক সংকট, বেকার বিভ্রাট, প্রাণধারণের উপযোগী দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি, মান্ধাতা আমলের ধ্যানধারণার মূল্য পরিবর্তন, অপরদিকে রাশিয়ার জার-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থান ও নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠা, মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম রাজ্যের জাগরণ ইত্যাদি একের পর এক ঘটে যাওয়ার ফলে এদেশের বুদ্ধিজীবি মানুষ বিস্ময়বিমূঢ় আর নেতৃবৃন্দ সমঁযের চাঞ্চল্যে দ্বিধাজড়িত। এজন্যে দেখি একদিকে অসহযোগ আন্দোলনের জনপ্রিয়তা অপরদিকে সন্ত্রাস আন্দোলনের অপ্রতিহত যাত্রা। সেই ভাঙনের যুগে—সেই চঞ্চলতার যুগে নজরুল "অগ্নিবীণা", "বিষের বাঁশী", "প্রলয়-শিখা" হাতে নিয়ে বিপ্লব ও সংগ্রামকে কামনা করলেন—তার মধ্যে যুক্তি আছে কি নেই এটুকু ভেবে দেখার মত শক্তি তখন আমরা হারিয়ে ফেলেছি, যাহোক একটা কিছু পেলেই বেচে যাই এরকম মনোভাবই সেদিন আমাদের ছিল। নজরুল সেই বেঁচে যাবার মন্ত্রই উচ্চারণ করলেন—সর্বপ্রকার অসদাচরণ ও অকল্যাণ, অনুদার ও অশুভ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে জাতি ও দেশকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সংগ্রামকে অবলম্বন করা আর এই সংগ্রাম শুধু বুদ্ধিজীবি মহলে আবদ্ধ না রেখে জনতার দুঃখ-ব্যথা-বেদনার মধ্যে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন বলেই সেদিন অবাক-বিস্ময়ে তাঁর কথা শুধু শুনিনি তাঁর মতাদর্শে চলার প্রেরণা নিয়েছি। কিন্তু তাঁর সময় যখন ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে লাগল তখন তিনিও ক্রমশঃ স্তিমিত হতে লাগলেন। প্রথম জীবনের প্রভঞ্জন শেষের দিকে শ্যামাসঙ্গীত ও

ইসলামী তৌহিদবাণীর মধ্যে রূপ নিতে শুরু করে, যেমন তখনকার বহু বিপ্লবী কর্মীকে আজকের দিনে সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে দেখেছি। সময়ের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার ফলে সময়ের পরিবর্তনে তিনি নিজেকে অসহায় ভেবেছেন—এটি কোন মহাকবির লক্ষণ হতে পারে না। তাই তাঁর অনেক কবিতাই আজ নিষ্ফল হয়ে গেছে, যুক্তি-বিন্যস্ত সমাজ রূপান্তরের কার্যক্রম অনুসৃত করার ধাত তাঁর ছিল না। ফলে তিনি যে-সময়ে নিজেকে বিকশিত করলেন পরবর্তীকালের কবিরা সে-পরিবেশ থেকে রসগ্রহণ করে অন্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন—উচ্ছ্বাস তাঁদের স্পর্শ করেনি, জীবনের নবীনতর প্রত্যয়ে তাঁরা আরও গভীর এবং আরও সার্থক। কাজেই কি করে বলা যায় যে 'রবীন্দ্র-যুগ' শেষ হয়ে যাচ্ছে 'নজরুল-যুগ'এর প্রসার হচ্ছে? নজরুল আবার যুগের সৃষ্টি করলেন কোথায়—চেতনার মধ্যে মত্ত হওয়ার সুর ফোটালেই কি যুগ সৃষ্টি করা যায়? প্রশস্তির নামে এই ব্যভিচার আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।

যে কবি মানুষে মানুষে সকল কৃত্রিম বিভেদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেলেন, স্বার্থপুষ্ট সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে শাশ্বত ভ্রাতৃত্বের পরিচয় যাঁর কাব্যে স্বতঃ উৎসারিত, শোষক ও উৎপীড়কের বিরুদ্ধে যিনি খড়্গহস্ত, সেই মানুষটিকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কে নামিয়ে পাকিস্তানের কবিরূপে প্রচার শুরু হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে যাক, তাঁদের আলাদা বাসভূমি হোক—একথা কোন মুহূর্তের জন্যেও তিনি মনে আনেন নি বরং "কুহেলিকা" উপন্যাসের নায়ক প্রমথর মুখ দিয়ে তিনি তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষের কথা বলে গেছেন—"আমার ভারত ও মানচিত্রের ভারতবর্ষ এক নয় রে অনিম! আমার ভারতবর্ষ, ভারতের এই মূক দরিদ্র নিরন্ন পর-পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন-তীর্থ; ওরে এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমান মসজিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের—মহামানুষের মহাভারত।" খুবই দুঃখের বিষয় তাঁর সাধনার গভীরে প্রবেশ না করে শুধু নাম ও ধর্ম দিয়েই তাঁকে গোষ্ঠীভূত করে নেয়া হচ্ছে। অথচ শোষকের পাশবিক রিরংসার বিরুদ্ধে, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, আমাদের নিরুদ্দীপক চেতনাকে সজাগ করে তুলেছিলেন যে কবি, মানবিকতার গণতান্ত্রিক প্রেরণায় সুস্থ সুন্দর সমাজ-গঠন যাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সেই কবির

অসাম্প্রদায়িক সংগ্রাম-পরায়ণ গভীর সত্যপ্রীতি তাঁরা যেন ইচ্ছে করেই ভুলে গেছেন।

তীব্র লেখনীঘাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ধর্মধ্বজীদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন—হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন কবিকে বিব্রত করে নি, তিনি মানুষের জয়গান গেয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার দিনে তিনি তাদের উদার মানবিকতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, ধর্মের মহান বাণীতে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন, জীবনের উজ্জ্বল আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এবিষয়ে তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সাধনাই সাক্ষ্য দেবে। এই বইয়ের বিভিন্ন স্থানে তাঁর নিদর্শন অনেক রয়েছে। এখানে শুধু তাঁর একটি কবিতা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে প্রতিপক্ষদের স্তব্ধ করে দিতে পারি—

ঃ জাতের চাইতে মানুষ সত্য
অধিক সত্য প্রাণের টান,
প্রাণ ঘরে সব এক সমান।
বিশ্বপিতার সিংহ-আসন
প্রাণ-বেদীতেই অধিষ্ঠান,
আত্মার আসন তাইত প্রাণ

(সত্য-মন্ত্র : বিষের বাঁশী)

এ প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা মনে পড়েছে। গোয়েবলস বলেছিলেন, "অনবরত মিথ্যে কথা বলে যাও, দেখবে ঐ মিথ্যেগুলোই লোকের মনে সত্য হয়ে উঠবে।" আজকালকার প্রচারের যুগে অনেক সত্য মিথ্যে হয়ে যায় অনেক মিথ্যে সত্য হয়ে যায়, সাধারণ মানুষের স্মৃতি বড়ই দুর্বল, তথ্যকে অত বাজিয়ে দেখে না—মহাকবি ইকবালের অদৃষ্টই তার সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ। ইকবালকে পাকিস্তানের স্রষ্টা হিসেবে জাহির করে এদিকের সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা পাকিস্তান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে ইকবাল একটি সম্প্রদায়ের কবি এবং তিনি একান্তভাবে তাঁদেরই কবি। যে কবি গেয়েছিলেন,—

: মযহব নহীঁ সিখাতা আপেস মেঁ বের রখ্না,
হিন্দী হাঁয় হম, ওয়াতন হ্যায় হিন্দুস্তাঁ হমারা।
(ধর্ম কখনও পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা করতে শেখায় না, ভারতীয় আমি, ভারতবর্ষ আমার স্বদেশ।)

ঃ সূনী পড়ী হুই হায় মুদ্দত সে দিলকী বস্তী,
অস এক নয়া শিওয়ালা ইস্ দেস সে মেঁ বসা দেঁ।
দুনয়াকে তীরথোঁ সে উঁচা হো আপনা তীরথ,
দামানে আস্মাঁ সে উস্‌কা কলস মিলা দেঁ।

(অনেকদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে হৃদয়ের দেবালয়, এস এই দেশে এক নতুন শিবালয় বসিয়ে দি। পৃথিবীর তীর্থ থেকে নিজের তীর্থ উঁচু হোক, আকাশের বস্ত্রাঞ্চলের সঙ্গে তার চূড়ায় কলস মিলিয়ে দি।)

ঃ পত্থর কী মুরতোঁ সে সমঝা হায় তু খুদা হায়,
খাক ওঅতন্ কা মুঝ্‌কো হর যর্রা দেওতা হায়।
(তুমি মনে কর পাথরের মূর্তিতে খোদা আছেন, আমার কাছে স্বদেশের প্রতিটি ধূলিকণা দেবতা।)

ঃ উঠো মেরী দুনইয়াকে গরীবোঁকে জগা দো,
কাখে উমরাকে দরো দিওয়ার হিলা দো।
জিস্ খেতসে দহ্‌কান কো ময়সসর ন হো রোখী,
উস্ খেতকে হর খোশাএ গন্দুম কো জ্বলা দো।

(ওঠ, জাগো, দুনিয়ার গরীবদের জাগিয়ে দাও, আমীর ওমরাহদের বালাখানা ভেঙে ফেল। যে ক্ষেত কৃষকদেব খাদ্য জোগায় না, পুড়িয়ে খাক করে দাও তার প্রতিটি শস্যকণা।) ইত্যাদি।

তাঁর এ পরিচয় আজ ক'জন লোক জানে? পশ্চিম বাঙলায় ইকবালের কবিতাপাঠ কিংবা তাঁকে নিয়ে আলোচনা ক'জন করে? অপরের কথা দূরে থাক নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে আমার নিকটতম বন্ধু-বান্ধবীদের একথা কিছুতেই আমি বিশ্বাস করাতে পারি নি যে ইকবাল মানবিকতাবাদী। আজ থেকে দু'দশ বছর পরে নজরুলের ভাগ্যেও হয়ত এরূপ বিধান ঘটে যেতে পারে আমরা যদি এখনও এ বিষয়ে অবহিত না হই। নজরুলকে নিয়ে আলোচনা চলুক, তবে ঐ জাতীয় হীন মনোভঙ্গীতে যেন বিচার করে তাঁকে এবং তাঁর সাহিত্যকে ভক্তির পরাকাষ্ঠায় দুর্বহ করে না তুলি। যা সত্য, তাকে যেমন নজরুল সাহিত্যের আধার করেছেন, তেমনি তাঁকে নিয়েও আলোচনা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হোক।

নজরুল-সাহিত্যের বিচার

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাঙালাদেশের মধ্যবিত্ত জীবন প্রথম বহির্বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার আঘাতে ধাক্কা খেল। সে সময় দেশের চাবিদিকে যে কর্মের ব্যর্থতা, মর্মের বিক্ষিপ্ত, বেকার বিভ্রাট, জাতীয়-জীবনে আত্মোপলব্ধির অভাবগত বেদনা এবং সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন জিজ্ঞাসা ও নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তৎকালিক কবি-কুলের কর্মে ও মর্মে এ সবের উচ্চ-বাচ্য প্রথমে বড একটা দেখা যায়নি। তৎকালীন কবিবা দেশের এই হঠাৎ পরিবর্তনে হকচকিযে গিছলেন, কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আমাদের বিশশতকীয কাব্যের প্রথম দু'দশক বড়ো সংকটের সময গেছে। এই অধ্যায়ের কবিরা, 'ভারতী' গোষ্ঠীর যতীন বাগচী, করুণানিধান, কিরণধন প্রমুখ, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস এবং আরো অনেক যাঁদের কুলপ্রদীপ ছিলেন সত্যেন দত্ত, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের চারপাশে বেডাতে আরম্ভ করে দিলেন। বলা বাহুল্য এর দ্বারা বাংলা কাব্যের প্রত্যক্ষভাবে কোন উপকাব হল না তবে পরোক্ষভাবে আমরা একদিকে উপকৃত হলাম—রবীন্দ্র-সাগবের অতলান্ত গভীরে না গিয়ে ভাসমান ভাব নিযে ঘব তুললে ঘর তো ভাঙবেই এবং তাব তলায় নিজেও চাপা পডব একথা তাদের আত্মাহুতিতে সতর্ক হযে গেলাম। জীবন ও বাস্তব সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা কববার মত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও এঁদের মানস-লোকের জমিনে বাস্তবের নতুন ফুল যখন ফুটল না তখন এঁদের রচনার মধ্যে কবিতে কবিতে ভেদচিহ্ন স্পষ্ট করা গেল না, সবাই একই ঘরের বাসিন্দা হযে গেলেন। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে স্বতঃ উৎসারিত ভাব ও সাবলীল ভাষায় মনে রাখার মতো কযেকটি কবিতা এঁরা প্রত্যেকেই লিখেছেন কিন্তু বাংলা কবিতার আধুনিক বিবর্তনে তাঁদের টেকনিক বড্ড পুরোনো বলে মনে হয। তাই পরে এঁদের রচনা পাঠ করার কোন প্রয়োজনবোধ আজকের পাঠক-সমাজের মধ্যে পাওয়া গেল না। রবীন্দ্রনাথকে যখন এঁরা অনুকরণ করেছেন তখন এঁদের রচনা পাঠ

করে সময় নষ্ট করার চাইতে রবীন্দ্র-রচনার মর্মোদ্ধারে সময় দেওয়া ঢের ভালো বলে বিবেচিত হল, কেননা এঁরা রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক কাব্য-সাধনার অখণ্ড স্রোতটিকে অনুসরণ করেননি, করেছেন 'মানসী', 'সোনার তরী', কিংবা বড় জোর 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য' পর্যন্ত এগিয়েছেন। সেদিন এঁদের মধ্যে যাঁর রচনা পাঠক সাধারণের ভালো লাগত এবং রবীন্দ্রনাথের পাশে রাখলেও সহজেই তাঁর রচনা বলে মনে হত তিনি হলেন সত্যেন দত্ত। রবীন্দ্রনাথ তখন খ্যাতির সুমেরু রেখায় কিন্তু সে-তুলনায় পাঠক তাঁর অল্প ছিল। পাঠক-সমাজের মনের দাঁত তেমন শক্ত হয়নি কাজেই তারা সেদিন রবীন্দ্র-স্বাদ নিয়েছে সত্যেন দত্তে। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটালেও তার জন্যে তাদের কোন আক্ষেপ ছিল না। বুদ্ধদেব বসুর কথায় বলা যেতে পারে, "রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে তিনি ঠিক সেই পরিমাণে ভেজাল করে নিয়েছিলেন যাতে তা সর্বসাধারণের উপভোগী হতে পারে। তখনকার সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রনাথে যা পেয়েছিলো বা রবীন্দ্রনাথকে যেমন করে চেয়েছিলো তারই প্রতিমূর্তি সত্যেন্দ্রনাথ।") ছন্দের ঝঙ্কার বা মিষ্টি কথার অনুপ্রাস ছাড়া বিশেষ করে একটি সহজবোধ্য উদারতা যেখানে মেথরকে বন্ধু, শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে বিশ্বাস, বাঙলাদেশের সাবলীল বর্ণনা, রাবীন্দ্রিক ছাঁদে দেশাত্মবোধের মোলায়েম শ্রুতিমধুর ও পথ চল্‌তে চল্‌তে আনমনে গুন্ গুন্ করবার মতো সুর তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ছিল। তাই যে-কোন তরুণ কবি কাব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেই প্রথমে রবীন্দ্রনাথকে পেতেন না, পেতেন সত্যেন দত্তকে। 'কল্লোলে'র তরুণ কবিরা বাস্তবকে উপলব্ধি করলেন, রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবে কয়েকজন কবির আত্মবিসর্জন দেখে তাঁরা প্রমাদ গণলেন। কাব্যরচনায় বেপরোয়াভাবে বাস্তবকে উপকরণরূপে ব্যবহার করা যায় কি না সে কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পথ খুঁজতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের পরে কবিতা লিখতে হলে এমন বক্তব্য খুঁজে নিতে হবে যা তিনি করেন নি কিংবা একটু ছুঁয়েই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, তা এতটুকু হলেও লোকসান নেই কিন্তু যেটুকু হবে সেটুকু যেন তাঁর কবিতার পাশে রেখে অপরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা বলে চেনা যেতে পারে—এই হোল তাঁদের জিদ। রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে মুক্ত হবার যে আকাঙ্ক্ষা আমাদের 'কল্লোলী'য় তরুণ কবি বন্ধুদের মনে জেগেছিল সত্যেন দত্তের মধ্যে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা কিয়ৎপরিমাণে

মিটেছিল ; তাঁর দ্বারা নিঃসঙ্কোচে প্রভাবিতও হয়েছিলেন, তা না হওয়া ছাড়া উপায়ও তখন ছিল না। তবু তাঁরা জানতেন, সত্যেন দত্তের কবিতায় বক্তব্যের গভীরতার চেয়ে রয়েছে কলা কৌশলের চটকদারী বুনোনী। এঁকে অনুকরণ করতে গেলে বক্তব্য-প্রকাশের নানারকম ছন্দের টেকনিক বিনায়াসে শেখা যাবে, তাতে লাভই হবে আর রবীন্দ্রনাথের ঘূর্ণাবর্তে পড়লে বেরিয়ে আসা কঠিন হবে, যাকে আয়ত্তে এনে নতুন করে পরিবেশন করতে হলে আরেক রবীন্দ্রনাথ হতে হবে। কাজেই সত্যেন দত্তে সে ভয় ছিল না— নিজের প্রতি একটু আত্মবিশ্বাস থাকলে যখন খুশী তাঁর ঘব থেকে বেরিয়ে আসা যাবে। মোহিতলাল, নজরুল, জীবনানন্দ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কিন্তু যে যাঁর নির্দিষ্ট পথ বেছে নিয়ে তাঁর প্রভাবকে ঝেড়ে ফেলেছেন। কিন্তু বিষয়ের দিক থেকে গভীরতার সন্ধান করেছিলেন তরুণ কবিরা, সত্যেন দত্তের কবিতায় তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। এই তাগিদ থেকেই মোহিতলাল দেহাত্মবাদ নিয়ে এলেন, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত সুর তুললেন দুঃখবাদের, আর কয়েকজন সাংসারিক আত্মতৃপ্তির আসরে আনলেন স্বপ্নলুব্ধ বাঙ্ময়তা। বাংলা কবিতায় নতুন সুর এল কিন্তু জনসাধারণ যেন তাতেও তৃপ্তি পাচ্ছে না কারণ সাম্রাজ্যবাদের শাসনযন্ত্র ক্রমবর্ধমান আঘাতে কঠোরতর হচ্ছে, দেশের ওপর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চলেছে, দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে ধ্বংস করছে তখন তারা আশা করেছে সাহিত্যিকদের তাদের দুঃখ-ব্যথার সহবোদ্ধা হতে, আত্মচেতনা ও জাগরণের অমোঘবাণীর সন্ধান জানতে। কিন্তু জাতির সঙ্কটমুহূর্তে তাঁরা তাদের পাশে এসে দাঁড়ান নি। এরই মাঝে নজরুল অন্যায়-জড়ত্ব-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য মন নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়া মাত্রেই একই সঙ্গে জনসাধারণ ও তরুণ কবিদের মনকে চুম্বকের মত টেনে নিলেন। জনসাধারণ যা চাইছিল তা তার কাব্যে পেল এবং যাঁরা সত্যেন দত্তীয় কাব্যভঙ্গীর পথে সার্থকতার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তাঁরা নজরুল ইসলামের পথে এসে দাঁড়ালেন। নজরুল স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে নিছক শব্দঝঙ্কার ও পদলালিত্য জাতিকে সজাগ করতে পারবে না, চাই বক্তব্যে চড়া গলায় কঠিন সুর, যা শোনামাত্রেই 'উৎসাহে বসিবে রোগী শয্যার উপরে।'

॥ ২ ॥

প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাত যখন মধ্যবিত্তের সাবেকী জীবনযাত্রার ওপর এসে লাগল তখন আশাবাদের চিহ্ন একটুও দেখা গেল না। মনের মত জগৎ নয় বলেই যতীন সেনগুপ্তকে দুঃখবাদ পেয়ে বসল, বুদ্ধদেব অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ হামসুন লরেন্সীয় রক্ত-মাংসের প্রেমের মধ্যে আত্মগোপন করলেন, কেউ কেউ আবার বক্তব্যের দুর্বোধ্যতা দিয়ে নিজের চারধারে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুললেন, পশ্চিমী এলিয়টিক ভঙ্গীতে নৈরাশ্যবাদে (nostalogia) মত্ত হয়ে আসন্ন মহা প্রলয়ের মুখোমুখি হয়েও পরিত্রাণ লাভের উপায় না ভেবে মৃত্যুই কামনা করলেন। নজরুল এই নৈরাশ্যের মধ্যে উজ্জ্বল প্রাণের দীপ্ত আশাবাদের নব বন্যা বইয়ে দিলেন। তাঁর আগমনে মোহিতলাল—যে মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের পরে এমন বিরোধ ছিল যে তিনি তাঁর মুখদর্শন করেন নি সেই মোহিতলাল—সেদিন উৎফুল্ল হয়ে 'মোসলেম ভারতে' লিখেছিলেন,—

> "নূতন দিক হইতে হাওয়া বহিতে দেখিয়া গুমটক্লিষ্ট প্রাণে বড়ই আরাম পাইয়াছি।" (ভাদ্র ১৩২৭)

মনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এ সময় বলাকা-পূরবী যুগে বাস করছেন। আশ্চর্যের কথা, রবীন্দ্র-প্রতিভার উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে থেকেও বিদ্রোহ-ভাবের বিপ্লবাত্মক কবিতাগুলো নজরুলের নিজস্ব সৃষ্টি এবং বিশিষ্ট অবদান। রবীন্দ্রকাব্যে যৌবনের অনিয়ন্ত্রিত চাঞ্চল্য বীরত্বপূর্ণ গতিবেগ নেই—এ পথে রবীন্দ্রনাথ নামেননি। আত্মনিমগ্ন কাব্য-সাধনা কবিকে যথোচিত সমাজ-সচেতন হতে দেয় নি। স্বৈরাচারী ধনতান্ত্রিক অত্যাচারে ও পেষণে উৎপীড়িত জনগণের ঝরে-পড়া তাজা-রক্তে তিনি বিচলিত হয়ে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছেন। হিজলী জেলে বন্দীদের ওপর অমানুষিক হত্যাকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, দুর্গত জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে কাব্যসাধনার বিষয় করেছেন কিন্তু তাঁর শিক্ষা-সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা পদ্ধতি, তাঁর পরিবেশ তাঁর স্বভাবে যে অলঙ্ঘ্য নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল তার ফলে তিনি সমগ্র গণচেতনা ও গণজীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকতে পারেন নি—তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,—

"রবীন্দ্রনাথ শিল্পের সাংসারিক প্রয়োজনের দিকটাকে যতটা পারেন অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে স্বীকার করিয়াছেন সেখানেও বড জোর সেই—'গীত রসধারা করি সিঞ্চন সংসার ধূলিজালে'
(রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রতিক শিল্পবোধের দ্বন্দ্ব : শিল্পলিপি)

কবি নজরুল কাব্যের সমাজ-চেতনার ওপর জোর দিলেন বেশী। তিনি জানতেন শান্তি ও স্বস্তির ভিত্তিতে জীবন-যাপনের অধিকার ভিক্ষায় মেলে না, দাবী জানিয়ে নিজস্ব পৌরুষ বলে আদায় করে নিতে হয়। আঁদ্রে জিদ বলেছিলেন,—

"তোমরা যাকে বিশুদ্ধ শিল্প বল তা তো কেবল প্রাচীন রীতি-নীতির অনুবর্তন মাত্র, সেখানে শৃঙ্খলাবোধটাই বড কথা, কিন্তু ভেবে দেখ নিয়মানুবর্তিতা কোন শিল্পীর স্বধর্ম হতে পারে না।"

তাই নজরুলের মধ্যে যে জ্বলন্ত সৃষ্টিপ্রবাহ অনুভব করি তা বিশুদ্ধ শিল্পনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা নয় আর এজন্যেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের কষ্টিপাথরে তাঁর সমস্ত রচনার সম্পূর্ণ মূল্য কষে পাওয়া যায় না। কাব্য-রচনায় বসে তিনি কাব্যালংকারের দিকে তাকান নি, তাকিয়েছেন তাঁর বিরাট দেশের দিকে—দারিদ্র্য-অশিক্ষা-অত্যাচারে নিষ্পেষিত জনতার দিকে, যারা রুটি চায়, কাজ চায়, সৌন্দর্যকে উপভোগ করার মত শান্ত পরিবেশ চায়। তাই তিনি জনগণকে সচেতন করার জন্যে রুদ্রের মত সংহার মূর্তি ধারণ করেছেন, কারণ তিনি জনতার শক্তিতে শ্রদ্ধাশীল বিশ্বাসী কবি বলেই তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, সুন্দর-সুখী সমাজ গড়ে তুলবে এরাই। এই বিশ্বাসের বাণী শুধু তিনি কবি হিসেবে নন, ন্যায় ও সত্যের সৈনিক হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

"জান যায় যাক্ পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়" ✓

—এই বাণীই তাঁর সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো প্রেরণা যা শক্তিহীন পীড়িত মানুষের সর্বাত্মক সংগ্রামের সর্বাঙ্গীণ সঙ্কল্পকে বজ্রকঠোর সুকঠিন ইস্পাতের মত মনোবল যোগাচ্ছে।

নজরুলের কবি-মানস সেদিন দু'জন নেতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে— তাঁরা হলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ। বারীন ঘোষের কাছে তিনি বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নেন আর মুজফ্‌ফর সাহেবের সংস্পর্শে এসে চাষী-মজুরদের অশ্রু-সজল বেদনার সঙ্গে পরিচিত হন। সেদিন এঁরা দু'জনেই তাঁর

চেতনার মধ্যে বাসা বেঁধেছিলেন। এঁদের সান্নিধ্য ও তখনকার পরিস্থিতি এবং প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, মুসলিম সংস্কৃতির দুর্বার সাহসিকতা, হিন্দু ঐতিহ্যের আত্মসমাহিত সাধনা তাঁর অফুরন্ত আশাবাদে, গভীর সত্য নিষ্ঠায় মানবজাতির ভাস্বর ভবিষ্যতের অটুট আস্থায় এমন এক উপকরণ যুগিয়েছে যাতে করে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে রবীন্দ্র প্রবর্তিত ধারার বাইরেও জনমানসসম্মুখ ভাবধারাকে রসোত্তীর্ণ করে কবিতা লেখা যায় এবং লিখলে কবিতার জাত যায় না। এইখানেই তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব।

॥ ৩ ॥

নজরুলের সৃষ্টিশক্তি শেষের দিকে তত্ত্বের ভারে একটু পীড়িত হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর রচনা শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। যে কবি অসাম্য দূর করে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করতে রাজী হন নি, কালব্যাধির আক্রমণে সেই কবিকে ফুলের জলসায় নীরব হয়ে যেতে হল। প্রকৃতপক্ষে মাত্র ২২ বছরই (১৩২৮—১৩৪৯) নজরুলের একটানা বিরামহীন সাহিত্যিক জীবন। এই স্বল্পায়ু জীবনে গল্প উপন্যাস নাটক ও অসংখ্য কবিতা আর গান লিখেছেন। তাঁর দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সমালোচক মহল দ্বিধান্বিত। কবি হিসাবে মর্যাদা দিতেও অনেকেই কুণ্ঠিত।

নজরুল বুদ্ধি নির্ভর কবি নন, তিনি হৃদয় নির্ভর কবি। স্বভাবকবি বলতে যা বোঝায় তিনি তাই। কাব্যের পরিণতির দিকে তাঁর প্রবণতা নেই। তিনি প্রতিভাবান বালকের মত লিখে গেছেন—কুড়িতে যেমন ছিলেন চল্লিশেও তেমনি রয়েছেন। তাঁর আবাল্যের অশিক্ষিত পটুত্বই তাঁর জ্ঞান ও ধীশক্তির অভাবে সার্থক কবিতা লেখার সময়ে পদে পদে বাধা দিয়েছে। শিক্ষা ও সাধনার অভাবে তাঁর গ্রাম্য মন শহরের বুদ্ধি ঔজ্জ্বল্যের সংঘাত সহ্য করতে পারেনি। ভালো কবিতা তাঁর সৃষ্টির তুলনায় অত্যন্ত অল্প। জনগণের হাততালির ওই দোষ—জনতার হাততালিতে বিভোর হয়ে গেলে কবির আভিজাত্য নষ্ট হয়ে যায় কারণ তারা আজ যে খেলনার আদর করে কাল সেটি তারা ভেঙে ফেলে। তাই জীবনানন্দ দাশ বলেছেন,—

"তাঁর প্রতিভা চমৎকার কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়।...পরার্থপরতার চেয়ে স্বার্থসন্ধান ঢের হেয় জিনিষ; স্বার্থসাধন কিছুই নয়, কিন্তু কবি-মানসের আত্মোপকার প্রতিভাই তাকে নির্মাতার ওপরের ভূমিকায় ওঠাতে সাহায্য করে, কবিতাকে তার অন্তিম সঙ্গতির পথে নিয়ে যায়। এরই স্বভাবে সৃষ্ট কবিতা যতদূর ব্যাপ্ত ও গভীর হয়ে উঠতে পারে নজরুল ইসলামের প্রথম ও শেষ কবিতা এরই অভাবে একই সূচনায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ততদূর স্থান হারিয়ে ফেলছে।" (কবিতা: কার্তিক-পৌষ ১৩৫১)

আরেকদল সমালোচক এর পাল্টা জবাবে বলেন যে মহাকাল তাঁকে মনে রাখার কথা নিয়ে কবিতা তিনি লেখেন নি। সাহিত্য জিনিষটাই সমসাময়িক।

"Only those things are recognised as art forms which have a conscious social function...They only become art when they are given music, forms or words, when they clothed in socially recognised symbols."

কাব্য-বিচারের এই মাপকাঠিতে তাঁর 'অশিল্প সুষম' কবিতাই হবে শ্রেষ্ঠ কবিতা, কেননা তিনি বর্তমান যুগের বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার চাপে এক শ্রেণীর অন্তর মথিত অমৃত-গরলের কথাই আমাদের শুনিয়েছেন। তাঁর ভাব ও ভাষার ক্লান্তিকর পুনরুক্তি বহুস্থানে ঘটেছে, শব্দ-বিন্যাসে নৈপুণ্য, সংযম ও সংবৃতির অভাব লক্ষিত হয়েছে, একটি বিপ্লবমূলক আত্মচেতনার নতুন ভাবধারাকে পুষ্ট ও সর্বজনপ্রচারিত করতে গিয়ে তা না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু নতুনকে পেতে হলে প্রথমজনকে তার জন্যে কিছু মূল্য দিতে হয় বৈকি। আমাদের ক্লেদাক্ত বর্তমানের মধ্যে আশ্বাসদীপ্ত ভবিষ্যৎকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে তিনি উৎসর্গ করেছেন। নজরুলের যেরূপ প্রতিভা ছিল তাতে পাণ্ডিত্যের পালিশ লাগলেই বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা ছিল, যেমন হয়েছে শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে। তিনি "শেষ প্রশ্ন" লিখে স্বধর্মচ্যুত হয়েছেন —মোহিতলাল 'সাহিত্য বিতানে'র "শরৎ পরিচয়" প্রবন্ধে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা নজরুল সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য হত। দুদিন পরেই সমাজের পরিবর্তন হবেই তখন তাঁর কবিতার রসাস্বাদনে তেমন কারুর আগ্রহ থাকবে না তবে এলিয়ট বলেছিলেন, 'কাব্য-বিচারে ইতিহাসবোধ আমাদের সহায়'। যদি তাই হয় তাহলে তাঁর কবিতা একটি বিশেষ কালের ও বিশেষ যুগের প্রতিনিধিত্ব

বরাবরই করবে। অতএব মনীষীমহলে তাঁর লেখার আদর নাই-ই হলো জনসাধারণের কাছে হাতে হাতে তো নগদ বিদায় তিনি পেয়েছেন। জনপ্রিয় হওয়া সৌভাগ্যের কথা, অন্ততঃ সমারসেট মম তো তাই বলেন। পষ্টারিটির তথাকথিত মহিমায় আস্থাবান নয় বলেই বিদ্বৎ সমাজের অবহেলায় তিনি বিচলিত হন নি। শিল্পের খাতিরে শিল্পের পরিণতি সম্পর্কে তিনি সচেতন— মরিয়া মানুষকে বিশুদ্ধ রস আজ যে মর্ফিয়া দিতে অক্ষম।

ঃ ঐ শোনো আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার!
তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আটশালা হবে নেড়া!

(সাবধানী ঘণ্টা ঃ ফণি মনসা)

প্রত্যেকটি মতের মধ্যে বিচারের শেষ কথা না থাকলেও প্রত্যেকটি মতের গুণে শাণিত যুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কিছুই বলা যায় কিন্তু সে তর্কারণ্যে প্রবেশ করতে 'মন মোর নহে রাজী।' দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে মানুষের মত গড়ে ওঠে—ভিন্নরুচির্হি লোকঃ—এতে আমার-আপনার কোন হাত নেই। তাঁর কবিতার পাঠক হিসেবে আমার যা মনে হয়েছে তা হল ক্ষমতাশালী কৃতি কবি মাত্র তিনি, কেননা তাঁর দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা রয়েছে কিন্তু জিজ্ঞাসায় গভীরতা নেই। অভিজ্ঞতা মাত্রেই কাব্য হয় না. পরিণতির প্রতীক্ষায় স্থির উপলব্ধিতে প্রশান্ত না হয়ে এলে কাব্যের যোগ্যতা সে অর্জন করতে পারে না। এজন্যে নজরুলের সেদিন দেশের প্রত্যক্ষ অবস্থার ওপর লেখা অনেক কবিতা, প্রবন্ধপুস্তক ইত্যাদি জনপ্রিয়তার হাটে দামে বড্ড চড়া ছিল কিন্তু আজ সেসব বকেয়ার তালিকা বৃদ্ধি করেছে মাত্র। তাছাড়া আজকের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যে বিদ্রোহ আমরা বুঝি সেই বিদ্রোহ-চেতনা তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়নি, বিদ্রোহের নামে ভাব ও ছন্দের আবেগময় উচ্ছ্বাসিত প্রাণবন্যাই পাওয়া গেছল। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে সেদিনকার আবহাওয়ায় তা হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁর কবিতা প্রচলিত রাষ্ট্রীয় শাসন, সমাজব্যবস্থা, সংস্কারাদির মূলে যে কুঠারাঘাত করেছিল, অন্যায়ের প্রতি দৃপ্ত বিরুদ্ধাচরণের জন্যেই তিনি প্রগতির কবি এবং জনপ্রিয় কবি। গল্প-উপন্যাস-নাটকে তিনি ব্যর্থ, কবিতায় তিনি সার্থক, গানে

সার্থকতর—'গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হয়েছেন মত্ত'। কেন না তাঁর কোন কোন কবিতা অনাবশ্যক রকমের দীর্ঘ, অসহ্য পুনরাবৃত্তিতে ভরা। আনন্দের আতিশয্যে নির্বিচার উৎসাহ নিয়ে তিনি বহুতর নতুন আবর্জনাকে কবিতায় স্থান দিয়েছেন কিন্তু বিষয়গুলো সেখানে আনকোরা কাঁচা বিষয় হয়ে রয়েছে, কাব্যের আলোয় তা ভাষায় রূপান্তর লাভ করেনি। Herford যে অর্থে বায়রণকে উঁচুদরের স্রষ্টা বলেন নি নজরুল-সম্পর্কে সে কটি কথা উদ্ধার করে আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে নিতে চাই। তিনি বলেছিলেন,—

"Byron lacks supreme imagination. With boundless resources of invention, rhetoric, passion, wit, fancy, he has not the quality which creates out of sensation, or thought or language, or all together, an action, a vision, an image or a phrase which penetrated with the poet's individuality has the air of a discovery, not an invention, and no sooner exists than it seems to have always existed. A creator in the highest sense Byron is not."

তবে রবীন্দ্র-যুগে 'good-poet' হিসেবে তিনি বৈচিত্র্য এনেছেন তা সানন্দে মেনে নিচ্ছি, কোন কোন কবিতা ও গানে মহৎ-কবিতার স্বাদও পেয়েছি এবং সে-সঙ্গে এ কথাও মানছি যে তাঁর কাব্য সাহিত্য-গুণের চেয়ে সাহিত্য-কর্মে সার্থক। যে দুবার যৌবনের স্বপ্ন নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছিলেন, গান গেয়েছিলেন, বাঙলাদেশে তাব আহ্বান ব্যর্থ হয়নি—উৎপীড়িত মানুষ নিজের দাবী আদায় করার জন্যে দিকে দিকে আজ মাথা তুলেছে, যাদের ব্যথা তাঁকে আহত করেছিল, কবিতা লেখার রসদ যুগিয়েছিল তাঁর সে স্বপ্নসাধ আজ সার্থক হতে চলেছে।

আধুনিক বাংলা কবিতা ও নজরুল

'আধুনিক' কথাটার ব্যাপক ও আপেক্ষিক অর্থ থাকলেও আধুনিক বাংলা কবিতা বলতে সেই কবিতাকেই বোঝায়, যে কবিতার শুরু হয়েছে 'কল্লোলে'র কিছু আগে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই। ইউরোপের মহাসমর থামতে না থামতেই ভারতের বুকে আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে অচলায়তনের ভিত্তি নড়ে উঠেছে। উনিশ শতকী জীবনের মোহ-মদির উপলব্ধি বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে খাপছাড়া বলে মনে হয়েছে। পুরোনো বিধি ব্যবস্থার লোপ, অর্থনৈতিক বৈষম্য অবসানের প্রবণতা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দেশের জনমানসকে চঞ্চল করেছে। প্রচলিত মূল্যবোধগুলির উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে। একদিকে আশা-ভরসা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, অপরদিকে দুঃখ-দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা-অপমানে পর্যুদস্ত হয়েও জীবনের একটি নতুন অর্থ তাদের মনের দিগন্তে উঁকি দিয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ অবসাদ ও নৈরাশ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নতুন করে জীবনকে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। তাদের দেখাদেখি পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন জোরদার হয়েছে; দেশের যুবশক্তিকে সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে স্থবির সমাজের পচা ভিত্তি উৎখাত করার জন্যে জাগরণের মন্ত্র চাই। সে-সময়কার অজস্র প্রশ্ন-সংকুলতার বেড়াজাল মানুষকে ছেঁকে ধরেছে কাজেই সাহিত্যেও সেটির প্রকাশ থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথ সেদিন আমাদের চোখের সামনে ছিলেন; সৌন্দর্যপ্রিয়তার সঙ্গে মানবপ্রীতির অনবদ্য উপস্থিতি থাকলেও সেই পটভূমির সচেতনতা তেজদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়নি কারণ তিনি যে জীবন-ধারার প্রতিভূ ছিলেন—যা বেদ-উপনিষদের প্রাণমন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়েছে—সেই অটল ধ্রুবচেতনা যে তাঁকে ফাঁকি দেবে তা তিনি বিশ্বাস করেন নি। কবিতায় সেদিন আদর্শবাদের প্রথম লক্ষণীয় পরিবর্তন যাঁদের রচনায় প্রথম পেয়েছিলাম তাঁরা হলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজি নজরুল ইসলাম। তাঁদের কবিতা বক্তব্য ও বাচনিকতার অভিনবত্বে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। তাঁদের সমসাময়িক কালে আরো অনেক কবি ছিলেন। কাব্যিক

সৌন্দর্যের বিচারে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর মত কবিতা লিখিতে পারাই তাঁদের আদর্শ ছিল। ভালো নিখুঁত কবিতা তাঁরা লিখেছেনও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন্ বিশেষ গুণে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আশ্চর্যরকমের বিশিষ্ট সেটুকু ধরার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না, কারণ কাব্যকলায় তিনি এমন উঁচুমান স্থাপন করেছিলেন যার নাগাল পাওয়া তাঁর অনুস্তাবকদের অসাধ্য ছিল। সে-সময়কার জীবন ও জগতের ধূসরতা, বিবর্ণতা, কুশ্রীতা,পঙ্কিলতা কিংবা জাগরণের উষালগ্নে মানুষের প্রাণচঞ্চলতা তাঁদের দৃষ্টির মধ্যে পড়েনি—পড়লেও তার উপর নির্ভর করার মত সাহস তাঁদের হয়নি। ফলে তাঁদের সবকিছু প্রয়াস বর্তমান বাংলা কবিতার আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং পদ্যলিখিয়ে হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন দু'জন—গোবিন্দ দাস আর সত্যেন দত্ত। 'স্বভাবকবি' বলে গোবিন্দ দাসকে উপহাস করা হয়েছে, তাঁর পড়াশুনাজনিত বিদগ্ধতা কাব্যের ব্যাকরণসিদ্ধ পণ্ডিতি কবিদের মত ছিল না। কিন্তু তিনি একটি বিশ্বাসকে একটি আদর্শকে জৈবিক বাস্তবতা ও দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিকতাকে সহজ স্বীকৃতির সাথে গ্রহণ করে নিজস্ব ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন, কারুর কাছ থেকে ধার করে গলা সাধেন নি। তাঁর জীবন-সংসক্ত অনুভূতির ছিটেফোঁটা যদি ঐ সব পণ্ডিতমন্য আলঙ্কারিক কবির থাকত তাহলে তাঁরা বর্তে যেতেন। সত্যেন দত্তের নিজস্ব বাণী কিছু ছিল না তবে ছিল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল প্রাণপ্রাচুর্য। বাঙালী সংসারের ও বাঙলা দেশের নানা টুকিটাকি খবর তাঁর কবি-প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে, তাতে বেদনা ছিল, নৈরাশ্য ছিল, প্রত্যাশাও ছিল কোন কোন জায়গায়। তাই তার খ্যাতি সেদিন রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশী ছিল এবং পাঠকেরা তাকেই পছন্দ করেছে বেশ কারণ তাঁর মধ্যে দেশের চলতি ঘটনার প্রতিফলন পেয়ে উল্লসিত হয়েছে। তিনি শ্রমিক কৃষকের জাগরণকে স্বীকৃতি দিয়ে সাম্যবাদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, দেশের রাষ্ট্রীয় সামাজিক আবর্তে কবিতার প্রেরণা পেয়েছেন, কিন্তু সেদিন প্রয়োজন হয়েছিল মিনমিনে ভাষা নয় জোরালো ঝাঁজালো সুরের। সময়ের সূর্যকে কাছে টেনে নিয়েও তাঁর কবিতায় জ্বালা ছিল না, বিপ্লবী ঘোষণা ছিল না। তাঁর ছন্দের স্নিগ্ধ কমনীয়তা ক্ষোভহীন সংযত বেদনাবোধ পাঠককে আপাত চমৎকারিত্ব দিয়েছে কিন্তু পাঠক চেয়েছে তার চেয়েও কিছু বেশী। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধ এবং রবীন্দ্র-প্রভাবিত তৎকালীন কাব্য-সাহিত্যের পাশ কাটিয়ে

সমাজ-বিবর্তনের ঐতিহাসিক বাস্তবমুখীনতার তাগিদে মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুলের উঁচুগলার সংস্কারমুক্ত বক্তব্য প্রকাশ হওয়া মাত্রেই সে-দশকের তরুণ-পাঠক যেমনটি আকাঙ্ক্ষা করেছিল তেমনটি, তিনটি বিভিন্ন সুরের সমবায়ে সমগ্র জীবনের প্রতিভাস পাওয়া গেল। আর তাঁদের কবিতাপাঠেই প্রথম হৃদয়ঙ্গম হলো যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাদীপ্ত মধ্যাহ্নের মধ্যে থেকেও সমকালীন কাব্য চিন্তাপদ্ধতি ও ভাষণ প্রবৃত্তির দিক দিয়ে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে।

সুস্থ ও সবল মানুষের সম্ভোগক্ষমতা কত বিচিত্রধর্মী হতে পারে মোহিতলাল তা দেখালেন—

: সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির মরণ-পিপাসা।—
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ-স্বপন।
যমদ্বারে বৈতরণী, সেথা নাই অমৃতের আশা—
ফিরে ফিরে আসি তাই, ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ।

(পাপ : বিস্মরণী)

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সমকালীন কাব্যে প্রকৃতি-বিলাসকে সরাসরি বর্জন করে গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীরে'র স্থানে মরুভূমির রুক্ষতা নিয়ে এলেন, মুগ্ধ আত্মতৃপ্তির পরিবর্তে মানব সমাজের যারা ভিত্তি গড়ে তুলছে তাদের অশ্রুজ্বালাকে ব্যঙ্গ-শাণিত বচনে রূপ দিলেন—

: দিগন্তপারে তরঙ্গ আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-সুষমায়?
বজ্রে যে জ্বলে মরে,
নবঘনশ্যাম শোভার তারিফ সে-বংশে কে বা করে?
ঝড়ে যার কুঁড়ে উড়ে,—
মলয়ভক্ত হয় যদি, বলো কি বলিব সেই মূঢ়ে।

(দুঃখবাদী : মরুশিখা)

: ক্ষুধার অন্ন, পরনের বাস [illegible]সের গেহ
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের করো গো স্নেহ—
তারা মানুষেরি ছেলে।
... ...

অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ঘুচে নাই,—
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের শ্রদ্ধা করো,
তারা মানুষেরি ভাই।

(মানুষ : মরীচিকা)

আর আবেগ উদ্দামতা ও উত্তেজনার যেটুকু বাকী ছিল সেটুকু পূর্ণ করলেন নজরুল ইসলাম। দুঃখবাদের বেদনা-বিধুর রোমন্থন নয়—'বিদ্রোহী' কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠল বন্ধন মুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, মানবাত্মার লাঞ্ছনা নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বস্তুতঃ তার দৃপ্তময় চেতনাময় ঘোষণার পাশাপাশি সত্যেন দত্ত এমন কি মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বক্তব্যকেও মনে হবে যথেষ্ট মৃদু—

: আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্ত শান্ত উদার
আমি হল বলরাম স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।
… … … …
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।

বিদ্রোহী : অগ্নিবীণা

বাঙলা দেশের আবেশ কাব্য-পাঠকেরা তিনটি বিভিন্ন সুরের প্রত্যয়-বচনের স্পষ্টতা ও ঋজুতায়, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার নতুন অভিব্যক্তিতে সচকিত হয়ে উঠল এবং কবিতার জাতবদল তখন থেকেই সুরু হল।

নজরুল বাংলা কবিতার ভাবালুতা ও মৃদু গুঞ্জনধ্বনিকে স্তব্ধ করে আদিম পৌরুষের বলিষ্ঠতা নিয়ে আহ্বান জানালেন অনমনীয় পৌরুষের, তারুণ্যের বিজয় ঘোষণা ধ্বনিত হল দিকে দিকে। সত্যেন দত্ত যেখানে স্বাভাবিক মানবতার খাতিরে মেথরকে বন্ধু, শূদ্রকে শুদ্ধ-সত্ত্ব পাবকরূপে সম্বোধন করেন—

: ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।
…　　　…　　　…　　　…
এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

(মেথর : কাব্য সঞ্চয়ন)

: শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্,
　　　শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার, ওগো!
　　　শূদ্রে দেখো না বক্র চোখে।

(শূদ্র : কাব্য-সঞ্চয়ন)

সেখানে নজরুল ভিন্ন স্বরে চড়া-গলায় বললেন— "
:　　　　আসিতেছে শুভদিন
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ—
…　　　…　　　…　　　…
সিক্ত যাদের সারা দেহমন মাটির মমতা-রসে
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।

(কুলি-মজুর : সর্বহারা)

সত্যেন দত্ত মনে করতেন কালের বিবর্তনে একদিন সমস্ত অনাচার অবিচার বিলুপ্ত হয়ে যাবে কিন্তু নজরুল মনে করেন বিপ্লবের দ্বারা অনাচার, অত্যাচারের অবসান ত্বরান্বিত হবে। চাষী-মজুরদের মেহনত ও কায়িক ক্লেশের কোন স্বীকৃতি বাংলা সাহিত্যে আবেগ ও দৃঢ়তার দাবী নিয়ে নজরুলের আগে রূপায়িত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ 'দুই বিঘা জমি'তে যে চিত্র এঁকেছেন তা সংগ্রামী মানুষের চিত্র নয়—মহাজনের অত্যাচারকেই শোষন কতকটা যেন মেনে নিয়েছে। তাঁর দেখানো পথে যাঁরা হাটা বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন তাঁদের মধ্যে কবিশেখর কালিদাস রায়ও শোষিত মানুষের দাঢ্য প্রত্যয়ী মনোভাব অঙ্কিত করেন নি ; সেই 'কৃষাণীর ব্যথা'র মধ্যে পাই কপালে হাত চাপড়িয়ে হাহুতাশ করার সুর,

অত্যাচার সহ্য করতে করতে যে কৃষাণ মারা গেছে তাকে অত্যাচারের মাঝেই ফিরিয়ে আনার জন্যে কৃষাণীর ব্যাকুলতা—

: বাকী খাজনার লাগি জমিদার দিয়েছে যাতনা কত,
মহাজন, দেনা সুদের জন্য গঞ্জনা দেছে শত।
চুপ করে সবি সয়েছ, আহা রে! দুটি হাত জোড় করে'
সকলের কাছে সময় নিয়েছ হাতে পায়ে ধ'রে প'ড়ে।
... ...
বাবুদের আর গদাই পালের অত্যাচারের ভয়ে,
চ'লে গেলে কি গো মনের দুঃখে কিছুই না ব'লে ক'য়ে?
তাই যদি হয় ফিরে এস তুমি তোমারে সঙ্গে পেলে,
খোকারে লইয়া পালাই কোথাও ঘর সংসার ফেলে,
ভিক্ষা মাগিব, কাঠ কুড়াইব, ফিরিব না আর বাড়ী,
আঁচলের গিঠে বাঁধিয়া রাখিব তিলেক দিব না ছাড়ি'।

(পর্ণপুট)

অত্যাচারকেই মেনে নেয়া হয়েছে—সংগ্রামী মনোভাব কোথায়? তা পাওয়া গেল জীবন-প্রত্যয়ী কবি নজরুল ইসলামের মধ্যে। মুনাফাখোর বুর্জোয়া শাসকদের ওপর শুধু আঘাত হানা নয়, পঙ্কক্লিন্নরূপ সমূলে উপড়ে ফেলার জন্যে যে রুদ্রহুঙ্কার দিয়েছেন তা বাংলা-সাহিত্যে অশ্রুতপূর্ব ছিল—

: আজ জাগরে কৃষাণ, সব ত গেছে কিসের বা আর ভয়
এই ক্ষুধার জোরে করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়কে করবো নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্য জগৎ চাষার কত বল॥

(কৃষাণের গান : সর্বহারা)

: মোদের যা কিছু ছিল সব দিইছি ফুঁকে
এইবারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে!
আবার নূতন করে মল্লভূমে
গর্জাবে ভাই দল-মাদল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

(শ্রমিকদের গান : সর্বহারা)

: আমরা খেপ্‌লা জাল আর ফেলব না ভাই
একলা নদীর তীরে,
আয় এক সাথে ভাই সাত লাখ জেলে
ধর বেড়াজাল ঘিরে।
ঐ চৌদ্দ লক্ষ দাঁড়-কাঁধে ভাই
মল্লভূমির মল্ল-বীর আয় রে,
ঐ আঁশ-বঁটিতে মাছ কাটি ভাই
কাটব অসুর এলে!
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

(ধীবরের গান: সর্বহারা)

তাঁর এই বক্তব্যে শোষিত মানুষ যাদের এতকাল বুর্জোয়া সমাজ অবহেলা-ভরে একপাশে সরিয়ে রেখেছিল, যারা নিজেদের ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সমাজের অত্যাচার মেনে নিয়েছিল তাদের মধ্যে আলোড়ন এল। বাঁচার মত বাঁচতে হলে আঘাত সহ্য করার মধ্যে বাঁচার মন্ত্র নেই, আঘাতের পরিবর্তে আঘাত দিলেই শোষকশ্রেণীর টনক নড়বে। সেদিনকার বাস্তব পরিস্থিতি এবং এখনকার মেহনতী মানুষের আন্দোলনে তাঁর এই সব উদ্দীপক সুর প্রেরণা জোগায়। সেদিনকার রাজনীতিক কর্মী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তাকে "যাত্রী" বইয়ে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে নজরুলের কবিতার প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন,—

"প্রবল হতে সে (নজরুল) ভয় পেতো না, নিজেকে মিঠে দেখাবার জন্য সে কখনো চেষ্টা করতো না। রবীন্দ্রনাথের পরে এমন শক্তিশালী কবি আর আসেনি বাংলা দেশে। এমন সহজ গতি, আবেগের আগুন-ভরা কবিতা বাংলা-সাহিত্যে বিরল। সত্যেন দত্তের কবিতা এর তুলনায় আড়ষ্ট। একটি কৃত্রিম ছন্দ-সচেতনতা সব সময়েই রসাস্বাদনে বাধা ঘটায় সত্যেন দত্তের কবিতায়। মনে হয় ভাবটিকে সচেতনভাবে ছন্দের সাজ পরানো হয়েছে। নজরুলের কবিতায় কৃত্রিমতার দুর্গন্ধ আদপেই নেই, মনের হিমাদ্রি থেকে ভাবের জমাট বরফ কল্পনার সূর্যালোকে নেমে এসেছে, ছন্দ সৃষ্টি করবার জন্যে তাকে প্রয়াস করতে হয়নি।" (প্রথম খণ্ড)

তাই সমস্যাকীর্ণ প্রতিবাদমুখর বিষয়বস্তুর আবেগময় রূপায়ণের জন্য শুধু নয়, অনুপ্রেরণাকে আন্তরিকতার সঙ্গে রূপায়িত করেছিলেন বলেই তাঁর কবিতা অসাধারণ সমাদর লাভ করেছিল এবং পাঠকের চৈতন্যকে গোড়া ধরে টান দিয়েছিল।

সেদিন মানুষ সাহিত্যে যা আশা করেছিল তার বিশ্বস্ত রূপায়ণ তিনি ছাড়া আর কেউ করেন নি আর সমাজ ও রাজনীতির জগতে এসে তাঁর সাহিত্য মুক্তির আদর্শ খুঁজে পেয়েছিল। মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নিজের কথা নিজের সুরে বলবার সাহস সঞ্চয় করেছিলেন কিন্তু মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তার থেকে তাঁরা দূরে ছিলেন—মনঃপ্রকর্ষের উচ্চমঞ্চে বসেছিলেন। মোহিতলাল মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ সম্বন্ধে নিজের গড়া এমন একটা পরিধি অর্থাৎ ভোগাত্মবাদের দর্শন গড়ে তুলেছিলেন, সেদিন সেটি লোকপ্রিয় হলেও অশিক্ষিত সাধারণ জন প্রবেশের অধিকার পায়নি। 'কালাপাহাড়ে'র মধ্যে মানুষের জয়ধ্বনি আছে কিন্তু মানুষের প্রতি কারা অত্যাচার করছে, তার প্রতিকার কি, এ সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন কারণ তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার মূলে ছিল নিছক আত্মগত সাধনা, রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার স্বরূপকে কাব্যভাত করেন নি, ভোগবাসনার একটা দিক তিনি দেখেছেন, সমাজ সচেতনতা থেকে বেশী ছিল তাঁর আত্ম-সচেতনতা আর ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষা ঐতিহ্য ইত্যাদি তাঁকে এবিষয়ে সহায়তা করেছে। আর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মধ্যে একটা পরিহাসচটুল শ্লেষের সুর ধ্বনিত হয়েছে, আদিরসের জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের অঙ্গনতলে এসে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু সমস্যার অতলে ডুবে থেকে পর্বতপ্রমাণ অনাচারকে দূর করতে গিয়ে ভিতরে ভিতরে উদ্বেল হয়ে উঠলেও বাইরে সেটি নিস্পৃহ নির্লিপ্তের সুরই যেন বেজেছে। নজরুল ইসলামের এই দিক দিয়ে তাঁদের উপর প্রতিপত্তি ছিল যে ভিতরের আগুনকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা, জীবনকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করার ক্ষমতা হয়ত তাঁর ছিল না, জীবনকে মুহূর্তে সচকিত করার আবেগ তাঁর ছিল। জনতার সঙ্গে আশ্চর্য সমধর্মিতা তাঁর সাহিত্যের প্রধান গুণ এবং প্রধান ত্রুটিও কারণ তা করতে গিয়ে ঘটনার সাময়িকতাকে প্রাধান্য দিতে হয়েছে, আবেগের উচ্ছ্বাসে কাব্যধর্মের অনেক রীতি-নীতি লঙ্ঘন করেছেন তিনি। কাজেই তাঁর অনেক কবিতা আজকের

দিনে পুরোণো হয়ে গেছে তবে ঐ সমস্ত কবিতা আপন সাময়িকতা নিয়েই প্রাণবন্ত। যুগাতীত বাণী-বহনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না—যুগের আকাঙ্ক্ষাকে তিনি রূপ দিয়েছেন। কালের দাবি তাঁর প্রাণের জ্বালার সঙ্গে যুক্ত হযে প্রাণশক্তির অদম্য উৎসাহে সেদিন তিনি যে-দীপ প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন সেই আগুন থেকে এখনও অনেক কবি গণ-সংযোগের মশাল ধরিয়ে নিচ্ছেন।

একথা বলা বাহুল্য যে আধুনিক কবিতার বিষয়বস্তুতে নবত্ব এলেও রূপ-নির্মাণে, অলংকরণে, বাক্‌প্রতিমায (image) তখন পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর আসেনি, তা শুরু হোল পরের দশক থেকে অর্থাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায়। কাজেই নজরুলের প্রভাব পরবর্তী বাংলা কবিতায় যেটুকু পড়েছে সেটা রূপকল্পের দিক দিযে নয়, পড়েছে মানুষ সম্পর্কে তিনি সেদিন যে নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন সমাজ ও সংসারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড বইয়েছিলেন তারই পোষাকতায পরবর্তী যাঁরা এগিয়েছেন তাঁরা রচনারীতির দিক দিযে স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্টতম এবং শ্রেষ্ঠতর কিন্তু ভাবনার দিক দিয়ে নজরুলের কাছাকাছি মানুষ। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের শোষণ বিরোধী মনোভাব নিযে স্পর্দ্ধিত ঘোষণা—

: আমি কবি যত কামারেব আর কাঁসারির আব ছুতোরের মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।

আমি কবি ভাই কর্মের আব ঘর্মের ;
বিলাস-বিবশ মর্মের ত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময যে হায় নাই! (কবি : প্রথমা)

বিষ্ণু দে'র জনতার দিকে মুখ ফেরানো অন্তহীন মমতা—

: অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য
ভাঙা ছুরি জানি অকর্মণ্য অসহায় হাতিয়ার,
তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেব, লিখব প্রাণের ভাষ্য॥

(প্রতিবোধ : বাইশে জুন)

বিমলচন্দ্র ঘোষের বিদ্রোহে প্রজ্জ্বলিত বেদনাবোধ—

গরীব বাপের ছেলে হয়ে যারা জন্মেছে এই মাটির বুকে
আমি তাহাদের কবি !
চোখের জলের সাগরে সাঁতার কাটিছে যাহারা অসীম দুখে
আঁকি তাহাদের ছবি।
আমায় তোমরা চেনো বা না-চেনো গ্রাহ্য করি না চেনা ও জানা
স্বার্থের কালো আকাশে ওড়াও হরষে মেলিযা দম্ভ-ডানা
তোমাদের দেওযা কবি যশ নিতে ঘৃণায আত্মা উঠিছে রুখে
ভাগ্যের খেলা সবি !
ক্ষুধার অন্নে বঞ্চিত যারা ধুঁকিযা মরিছে মাটির বুকে
আমি তাহাদের কবি ॥

(আমি তাহাদের কবি : উদ্বাস্তু ভারত)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমাজবোধে উদ্দীপ্ত নকীব—

: শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা ;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু ব'সে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

প্রিয ফুল খেলবার দিন নয অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা
দুর্যোগে পথ হয হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা ॥

(সে দিনের কবিতা : পদাতিক)

দিনেশ দাসের বর্তমান মেকী সভ্যতার অবসানের জযোদ্ধত ঘোষণা—

: এই যে খুনে সভ্যতা
অনেক জনের অন্ন মেরে কযেক জনের ভব্যতা,
এগোয় নাকো পেছোয় নাকো অচল গতি ত্রিশঙ্কুর—
হোটেলখানার পাশেই এরা বানিয়ে চলে আঁস্তাকুড়।

আজ যে পথে আবর্জনার স্বৈরিতা
মহাপ্রভু ! সবই তোমার তৈরী তা।
দেখছি বসে দূরবীনে
তোমায় শেষে আসতে হবে তোমার গড়া ডাস্টবিনে।

(ডাস্টবিন : দিনেশ দাসের কবিতা)

। কান্ত ভট্টাচার্যের শোষকের পাশবিক রিরংসার বিরুদ্ধে দৃঢ় শপথ—

: শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হ'লো কত মৃত মানুষের হাড়
হিসাব কি দিবি তার ?

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘর বাড়ী,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি ?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবোই।

(বোধন : ছাড়পত্র)

গোলাম কুদ্দুসের তীব্র অ[illegible]—

: দিগন্ত থেকে দিগন্তে এত ফসলের জমি আছে,
কৃষকের তবু শূন্য দু'হাত ধুঁকে ধুঁকে মরে বাঁচে।
ভূ-ভারতে এত দাবি সৃজনের, বেকারের তবু ভীড়,
জননীর বুকে এত স্নেহসুধা, ভেঙে যায় তবু নীড়।
মাটির তলায় মণিভরা খনি, আকাশে তারার হাসি
ফুলে ফুলে আছে এত মধু, তবু প[illegible]াপতি উপবাসী !
এদেশ স্বাধীন, তবু পরাধীন, সোনার পাথর বাটি,
গদি পেয়ে ভাবে নিরাপদ, তবু তলে তলে ফাটে মাটি।

(মন্ত্রিদের প্রতি : ইলা মিত্র)

রাম বসুর মধ্যে সংগ্রামী জনতার তীব্র হুঙ্কার—

ঃ এবার আমরা ধান তুলে দিয়ে
মুখ বুঁজে মরব না,
এবার আমরা তুলসী তলায়
মনকে বেঁধে রাখবো না।
বাঁকের মুখে কে যাও, কে ?
লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও
আমাদের হাঁকে রূপনারায়ণের স্রোত ফিরে যাক
আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক
আমাদের হৃৎপিণ্ডের তাল দামামার মত
ঝড়ের চেয়েও তীব্র আমাদের গতি।

(তোমাকে)

জুলফিকারের মধ্যে নতুন পৃথিবী তৈরী করার জন্যে শোষকের প্রতি সাবধান বাণী—

ঃ মানুষের মরা-লাশের উপর নৃত্য থামাও।
তোমরা মরা-লাশের উপর দাঁড়িয়ে
অর্থ বলে ক্ষমতার দাপটে বিলাস ব্যসনে যা' ইচ্ছে তা' করছ।
বারবনিতার জৌলুস-জীবনে আর রঙীন শরাবে নিজেদের
স্বর্গ-সুখ বেশ করে উপভোগ করছ।

(একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা ঃ নতুন দিনের জন্য)

আরো অনেকের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে কিন্তু পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি একটি কথা স্পষ্ট করে বলতে পারলে সন্তুষ্ট যে, বুর্জোয়া সমাজের সর্বগ্রাসী পৈশাচিক লালসার প্রচণ্ডতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী জনতা নজরুল ইসলামের কবিতার মধ্যে প্রথম প্রেরণা পেয়েছিল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এবং সেই সূত্রেই তাঁর কবিতা আধুনিক যুগের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ধারাবাহিকতার মধ্যে সুস্থ-সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাসে আনাগোনা করে। তাই আধুনিক বাংলা কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে বাদ দেয়ার উপায় নেই।

নজরুল-সাহিত্যের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ যে-যুগে তাঁর সর্বগ্রাসী প্রতিভা নিয়ে সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগের চূড়ান্ত উৎকর্ষবিধান করেছিলেন ঠিক সে-সময়েই রবীন্দ্রালোকিত মহাদেশে নজরুলের আকস্মিক অভ্যুদয় এবং বিপুল প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তবে তাঁর জনপ্রিয়তার যথার্থ কারণ বিশ্লেষণ করলেই তাঁর কবি-প্রতিভা ও কবিধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় যখন ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাবে আমাদের দেশের সামন্তশাহী সমাজের ভিত্তি ক্রমশঃ ভাঙতে থাকে সেই আধা সামন্ত-শাহী, আধা-বুর্জোয়া ঐতিহ্য নিয়ে বাঙলায় আরম্ভ হল নবযুগ, বাংলা-সাহিত্যের নবযুগের আরম্ভও তখন থেকে। বাংলা-সংস্কৃতির সেই নবযুগের প্রতীক হিসেবে সেদিন এসেছিলেন মধুসূদন। তাই তাঁর কাব্য সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী সেদিন বলেছিলেন, "বঙ্গ-সাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন।" নজরুল কাব্য সম্বন্ধেও একথা বলতে পারি। কেননা নজরুল যখন বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাঙলা দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে এলেন তখন সমগ্র বাঙলায় তথা ভারতবর্ষে এক বিক্ষোভের দানা বেঁধে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে; বুদ্ধিজীবিদের উপর সাম্রাজ্যবাদের ভ্রূক্ষেপ, জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নরনারীর রক্তে রক্তাক্ত রাজপথ, যুদ্ধের ফলে দুনিয়া-জোড়া অর্থনৈতিক সঙ্কট, বেকার সমস্যা প্রভৃতির চাপে মধ্যবিত্ত সমাজের সাজানো বাগানে তীব্রতর ভাঙন, রুশবিপ্লব এবং তৎকালিক ইউরোপের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক হামসুন, লরেন্স প্রভৃতির প্রভাবে মান্ধাতা-আমলের ধ্যান ধারণার বনিয়াদে অবিশ্বাসের তীব্র আঘাত, 'মৃত্যুদুঃখবেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।' সংকটাপন্ন বুদ্ধিজীবী তখন পথ খুঁজছে নতুন দিকে—নতুন বাস্তব অবস্থাকে আত্মসাৎ করবার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে। বাস্তব-সমুত্থিত এই সব সমস্যার সার্থক কাব্য-রূপায়নের ক্ষমতা সে সময়কার কবি সত্যেন দত্তের তো ছিলই না, বিশ্বের স্বীকৃত কবি রবীন্দ্রনাথেরও না। 'বলাকা-পূরবী' যুগে এসব সমস্যা দেখা দিলেও কবিগুরু সংসার উদাসীন বিবাগী তারুণ্যের জয়গানেই

তখনও মুখরিত। তাঁর উনবিংশের মানবতাবাদ তিরিশের জীবন-সংকটের কঠিন বাস্তবতায় কোন ছায়া ফেলতে পারেনি। কাজেই বাঙালী বুদ্ধিজীবীর দল রবীন্দ্রনাথের আত্মতৃপ্ত প্রশান্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তিক্ত-বিক্ত জীবন-জিজ্ঞাসায় ফুটিয়ে তোলার কাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে আরম্ভ করলেন। যতীন্দ্র সেনগুপ্ত বাস্তব সচেতন হয়ে রবীন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করে লিখলেন—

: তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায়—কী আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ ?
… … … …
অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে ;
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে।
দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল, ভাবি' দেবতার দান ;
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান।
—এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের সুর দিনে দিনে পড়ে চাপা !

(ঘুমের ঘোরে : মরীচিকা)

'বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান ফেনিয়ে ওঠা'র দৃশ্য নজরুলকেও বিচলিত করেছিল। তিনিও লিখলেন—

: রবির কিরণ ছড়িয়ে পড়ে দেশ হতে আজ দেশান্তরে ;
সে কর তবু পশিল না মা বদ্ধ-কারার অন্ধ ঘরে।

প্রকৃত কবি বা শিল্পী হচ্ছেন তিনি যাঁর ছবিতে ধরা পড়ে যুগপ্রতিচ্ছবি ; তাই টি. এস. এলিয়েটের মতে,

'The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality.

এ উক্তিটিই নজরুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা যে যুগে তাঁর আবির্ভাব সে-যুগের মানসরূপ তাঁর কাব্যে তাঁর গানে ধরা পড়েছিল—ধরা পড়েছিল বৈপ্লবিক যুগের ছিন্নমূল দলিত মথিত অনাদৃত নিপীড়িত জনসাধারণের দৃপ্ত জয়যাত্রার উন্মুক্ত প্রতিচ্ছবি। তিনি ছিলেন সে-যুগের প্রধান কবি-কর্মী। তাঁর প্রতিভায় বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথকেও সেদিন বলতে হয়েছে,

"অরুণ্য বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা তার অনবদ্য ভাব-মূর্তি রয়েছে কাজীর কবিতায় ও গানে। কৃত্রিমতার কোন ছোঁয়াচ তাকে কোথাও ম্লান করেনি, জীবন ও যৌবনের সকল ধর্মকে কোথাও তা অস্বীকার করেনি। মানুষের স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতির অকুণ্ঠ প্রকাশের ভিতর নজরুল ইসলামের কবিতা সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে তার আসন গ্রহণ করেছে। তাই আবির্ভাব মাত্রেই অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি।"

ভারতীয় চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে যেটি আমাদের চোখে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় সেটি হল জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে আমরা খুব বেশী সচেতন হইনি। ত্যাগ এবং মোক্ষই আমাদের কাছে চরম এবং পরম আদর্শরূপে ধরা দিয়েছে। এর কারণ, তখনকার সমাজে হয়ত এযুগের মত বড় কোন সমস্যা ছিল না, আজকের মত এত বিপদ মানবতার সম্মুখে আর কোনদিনই আসেনি। বৈষ্ণবরা অবশ্য মোক্ষের আদর্শ ত্যাগ করে প্রেমাস্বাদনের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সে-আস্বাদন আধ্যাত্মিকতার কড়াপাকে ঘুরপাক খেয়েছে। কাজেই প্রকৃত জীবনের মূল্য সেখানে থাকবে কি করে যেখানে বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করে রাগাত্মিক সাধন প্রক্রিয়ার প্রচলন হয়? তবে জীবন সম্পর্কে বৈষ্ণব দৃষ্টিভঙ্গীটি রবীন্দ্রনাথে এসে আরেকরূপ ধারণ করেছে। জীবন-জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধিলাভ করেছেন। আমাদের জানিয়েছেন, জীবনের গতিই সবচেয়ে বড় সত্য—

ঃ শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনে রাতে
এই বাসা ছাড়া পাখী ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।"

(বলাকা ঃ বলাকা)

পথিক হিসাবে তাঁর পথ চলার আনন্দের জন্যে তাঁর কাব্যে জীবন-জিজ্ঞাসা জটিল হয়ে পড়েছে, সৃষ্টি করেছে সৌন্দর্যময়ী কল্পনার স্বাপ্নিক পরিবেশ, দার্শনিক তথ্যপূর্ণ মিষ্টিসিজম্। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"আমি সত্য সত্য বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-পূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না, সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল! আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখে অভিমুখী, আর ভালবাসাটা লৌকিক জাতীয়, সাকারে জড়িত।" (চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড)।

'আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়' যে জীবন তাকে রবীন্দ্রনাথ জানেন। কিন্তু সৌন্দর্যব্যাকুলতা কবির মধ্যে প্রবল হওয়াতে তাঁকে পরিপূর্ণ idealএর দিকে নিয়ে গেছে। মানুষের কবি তিনি হতে চেয়েছেন কিন্তু 'জনহিতৈষণা অপেক্ষা সৌন্দর্য সাধনার, আত্মনিষ্ঠা অথবা আধ্যাত্মিক সত্য-পিপাসার আবেগই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।' মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করেছেন 'মূঢ ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা'। "প্রায়শ্চিত্ত" "রক্তকরবী"তে প্রাণপণ বলে সেই সংসারের প্রান্তে এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন কিন্তু পরমুহূর্তেই সৌন্দর্যের ব্যাকুলতা পুনরায় তাঁকে সঙ্গীতালোকে টেনে নিয়ে গেছে। তিনি ছিলেন সাত্ত্বিক মাধুর্যের কবি, তাঁর কাব্যরথ যুধিষ্ঠিরের রথের মত পার্থিব মাটি স্পর্শ না করে চলাফেরা করেছে। নজরুল জীবন-জিজ্ঞাসার জটিলতাকে ঝেটিয়ে ফেলে দিয়ে জীবনায়নের মূল্য দিলেন আজকের মানসিক অস্থিরতার ওপর নিভর করে। তিনি নিয়ে এলেন বক্তব্যে শাণিত কৃপাণের ধার, নিয়ে এলেন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত সাম্যমূলক সমাজ-জীবনের সন্ধান, সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্য-বাদের নগ্ন নির্লজ্জ শোষণে ও পেষণে নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের বেঁচে থাকার দুরন্ত কামনা, জীবনের দুশমনের সঙ্গে লড়াই করার দুর্জয় সাহস। তাই নজরুলের কবিতা এই জীবনের কবিতা এবং সঙ্গে সঙ্গে এই জীবনকে সংগঠিত করার কবিতা।

রবীন্দ্রযুগের আগে দেশাত্মবোধমূলক কবিতা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ছিল প্রাণহীন। এই জাতীয় প্রাণহীন কাব্যে প্রাণের সঞ্চার করেন রবীন্দ্রনাথ; কিন্তু ভাববাদী কবির কাব্য পড়ে দেশবাসী উপভোগ করছে কিন্তু শৃঙ্খল ভাঙার

উৎসাহ বা উদ্দীপনা পায়নি, রক্তমোক্ষণ ক্লান্ত হৃতমানুষের অশ্রু, রক্ত, স্বেদ সংগ্রাম ব্যক্ত হয়নি আগুনের ভাষায়। যেমন—

: আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদব নয়ন শেষে ॥

কিংবা—

: যেথায় থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে,
প্রাণের বেদন জানে না কে ॥

অথবা—

: ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে।

স্বাস্থ্যহীন, অন্নহীন, দীনদরিদ্র বাঙালীর প্রত্যক্ষ অবস্থা থেকে এরূপ অন্তিম প্রার্থনা উৎসারিত হয় কিনা সন্দেহ! উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, তার চেয়ে কিছু বেশী করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ, আর এই উদ্দীপনার মাত্রা চরমে উঠে আগুন জ্বালিয়েছে—বিদ্রোহী কবি নজরুলের কাব্যে। তাঁর রচনার অমিত তেজ, উদ্দাম স্বতঃস্ফূর্ততা ও সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য পাঠককে অলস আবেশে নিদ্রাভিভূত করেনা; এর ওজস্বিতা তাকে দুর্বার করে তোলে। এইভাবে নিদ্রাবশে আচ্ছন্ন জাতিকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নজরুল জাগ্রত করেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যের মধ্যে আমরা একটা পৌরুষের স্পর্শ পাই—বাংলা সাহিত্যে নজরুল পুরুষ-প্রাণের দৃষ্টান্ত। নজরুলের জনপ্রিয়তার এটিও একটি বড়ো উদাহরণ।

আমাদের দেশে প্রাচীন ঋষি বিশ্বদেবতার কাছে তেজ, বীর্য, বল, ওজই শুধু প্রার্থনা করেন নি, প্রার্থনা করেছেন 'মন্যু' অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতি ক্রোধও। ঋষি বলেছেন, "ওঁ মন্যুর'সি মন্যুর্ময়ি ধেহি"—হে মনুষ্যস্বরূপ অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ আমার ভেতর সঞ্চারিত কর। বাস্তবিক অন্যায়কে অন্যায় না বলে তাকে ক্ষমা করা জড়তার লক্ষণ, উপেক্ষা করা অপৌরুষতার লক্ষণ। এজন্যে জোসেফ ম্যাটসিনি বলেছেন, .

"Whenever you see corruption by your side and do not strive against it, you thereby betary your duty."

নজরুল দেখেছেন মানুষের যুক্তিহীন বিচারমূঢ় ধর্মান্ধতা, দেখেছেন বলদৃপ্তের সীমাহীন স্পর্দ্ধা, জাতিবিশেষের দুর্বার সাম্রাজ্যলিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা, মানবাত্মার অপমান, নারীত্বের অমর্যাদা, সভ্যতার মুখোস পরা ভদ্রবেশী বর্বরতা। তাই মানুষের দ্বারা মানুষের যে স্বেচ্ছাকৃত অপমান, স্বার্থপূর্ণ শোষক-দৃষ্টির সামনে সত্যের সেই বিরাট কপটির যে লাঞ্ছনা এবং সমাজ ও ধর্মের নামে মানুষের যে নির্লজ্জ হঠকারিতা বিশ্বের বুকে প্রতিনিয়ত ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে, সেই ট্র্যাজেডিই নজরুল-কাব্য-চিন্তার প্রধান উপজীব্য। বৈষম্যময় যে মনুষ্যসমাজ এবং ঐ বৈষম্যের নিষ্পেষণে লাখ লাখ মানুষের আর্তনাদ, সেই আর্তনাদ নজরুলের চিত্তে জাগায় প্রেরণা। তাই তিনি প্রচণ্ড আঘাতে হানলেন রক্ষণশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে—সে জাতীয়তাবাদ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। তাঁর কাব্যে বিদ্রোহের মূল সুর হচ্ছে ঘোরতর অসাম্যের বিরুদ্ধে সাম্যের বিদ্রোহ, ধনী-সমাজের বিরুদ্ধে সর্বহারার বিদ্রোহ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের বিদ্রোহ, ছুঁৎমার্গগামী সমাজপতি ও বৈড়ালব্রতী ভণ্ডদলের বিরুদ্ধে মানবতার বিদ্রোহ। তিনি বলেছেন,

"যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই,—শুধু রাজার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারীর তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।" -(রাজবন্দীর জবানবন্দী)

তা' বলে তাঁর সাহিত্য সংগ্রামশীল (তাঁর সংগ্রাম জনসংহতির) হলেও শ্লোগান-সর্বস্ব নয়। তাঁর কবি-কল্পনায় অস্পষ্ট কুহেলিকাচ্ছন্ন কিছু নেই—তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি অনাবৃত, তাঁর কল্প-মানস অতি সচেতন। তাই শুধু ভেঙেচুরে লোপাট করে দেওয়াই তাঁর সাহিত্যের প্রধান কথা নয়—একটি গভীর প্রতীতি আর আদর্শবাদ তাঁর ভাঙার গানের ছত্রে ছত্রে অনুরঞ্জিত। এরই ফলে বাঙলা দেশে তিনি বরেণ্য হয়ে উঠলেন। তিনি যেন "The Grand Nepoleon of the realms of rhyme" —ছন্দরাজ্যে নেপোলিয়নের মতই তিনি একাধিপত্য বিস্তার করলেন।

নজরুলের কাব্য সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা যে তাঁর কাব্য অবজেকৃটিভ ধর্মীর সঙ্গে সাবজেকৃটিভ ধর্মীর সংমিশ্রণে রচিত। নজরুলের সমসাময়িক কবিদের কাব্য অত্যন্ত সাবজেকৃটিভ ধর্মী, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বেশীর ভাগ। যে উচ্চতর ভাবসাধনা ও রসকল্পনার সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ এক অভিনব কাব্যলোক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁরা তাঁকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মত অত্যুচ্চ ভাবকল্পনার অধিকারী তাঁরা ছিলেন না, কাজে কাজেই কৃত্রিম রসাবেশ এবং ভাবালুতাকেই তাঁরা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিয়ে কবিধর্ম ও কবিকর্মকে পরম মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন। সেজন্য তাঁরা না পেরেছিলেন নিজ সৃষ্টির দ্বারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে, না পেরেছিলেন সেযুগের চিত্রকে কাব্যে প্রতিফলিত করে প্রগতিশীল হতে। কাব্যের এই ভাবগত এবং রীতিগত কৃত্রিমতাকে নজরুল নিজের সাধনার মধ্য দিয়ে সুতীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সেদিন আমরা 'বিদ্রোহী' কবিতার মারফৎ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলুম যে রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত সাহিত্যাদর্শই সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ নয়, সাহিত্যের অন্য আদর্শও রয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর কথায় বলা যেতে পারে,

> "...একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি।...সত্যেন্দ্রনাথকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই সংলগ্ন কিংবা অন্তর্গত, আর নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি—ক্ষুদ্রতর নিশ্চয়ই, কিন্তু নতুন।...তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। যে-আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগালেন তার তৃপ্তির জন্য চাঞ্চল্য জেগে উঠলো নানা দিকে; এলেন 'স্বপন-পসারী'র সত্যেন্দ্র দত্তীয় মৌতাত কাটিয়ে পেশীগত শক্তি নিয়ে মোহিতলাল, এলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগভীর কিন্তু তখনকার মত ব্যবহারযোগ্য বিধর্মিতা, আর এই সব পরীক্ষার পরেই দেখা দিলো 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো।" (রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক : সাহিত্য-চর্চা)

তাই তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকগোষ্ঠী হতে তাঁকে একটি পৃথক আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একথা বুঝতে না পারলে নজরুলকে বোঝবার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হবে।

নজরুল আর্টের ব্যাখ্যা করেছেন,—

"আর্টএর অর্থ সত্যের প্রকাশ (Execution of Truth), এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।" (বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান : যুগবাণী)

তাই দেখি সমাজে-রাষ্ট্রে, ধর্মে-কর্মে, আইনে-কানুনে সত্যের অবমাননা যেখানে দেখেছেন, নজরুল রুদ্রের মত সেখানেই সংহার মূর্তি ধারণ করেছেন। গ্যেটে বলতেন, "প্রতিভার কাছে আমাদের প্রথম এবং শেষ দাবী সত্যপ্রীতি।" নজরুল এই দাবী পূরণ করে অগণিত জনতার হৃদয় জয় করেছেন। নজরুল-সাহিত্যে কোন দর্শন নেই বলে অনেকেই অনুযোগ করেন কিন্তু নজরুলের এই সত্যপ্রীতিই হোল তাঁর জীবন-দর্শন। এই সত্য-প্রকাশের ব্যাকুলতা তাঁর সাহিত্যে নানা ভাবে অভিব্যক্ত। কোন বাঁধা-ধরা আদর্শ, বিশেষ ব্যক্তিত্ব বা দলীয় রাজনৈতিক বুলিকে কেন্দ্র করে এই জীবন-দর্শন আবর্তিত হয়নি—পরানুকরণকে তিনি বরং ঘৃণা করেছেন। 'যুগবাণী'তে বলেছেন,

"তোমার কি নিজের ব্যক্তিত্ব নাই যে, কে কি করিল আগে দেখিয়া তবে তুমি তার পিছু পিছু পো ধরিবে? নেতা কে? বিবেকই তো তোমার নেতা, তোমার কর্তব্যজ্ঞানই তো তোমাব নেতা!" ('গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ')

তাই তাঁর জীবন-দর্শন কারুর কাছে আত্মসমর্পণের নয়, আত্মবিশ্বাসই তাঁর দর্শনের মূল কথা। এই দর্শনে নজরুল ইসলাম বিশুদ্ধ বামপন্থী এবং সেক্ষেত্রে তিনি আজও অদ্বিতীয় ও অনন্যপরতন্ত্র বললে ভুল বলা হবে না।

যদি জনপ্রিয়তাই সাহিত্য-বিচারের সবচেয়ে বড়ো মাপকাঠি হয়, তাহলে নজরুলের তুল্য বড় কবি বাঙলা দেশে খুবই কম আছে বলতে হবে। মধুসূদন, একবার কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'তেতলায় পড়ছে, বটতলায়ও পড়ছে।' নজরুল সম্বন্ধেও একথা সত্য। তাঁর কবিতা এত সরল, অনাড়ম্বর ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ যে অর্থ গ্রহণে কোথাও বাধে না। মহা-কবি গ্যেটে বায়রণ সম্পর্কে বলেছিলেন, "A character of such eminence has never existed before and probably will never come

again." নজরুল সম্পর্কেও একথার প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি, সাহিত্য-জগতে এমন কবির আবির্ভাব ইতিপূর্বে কখনও হয়নি, এমনটি কখনও হবে না।

॥ ২ ॥

নজরুলের প্রথম কাব্য "অগ্নি-বীণা" প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সালে। সেকালের চারণ কবির মত কবি "অগ্নি-বীণা" হাতে নিয়ে দেশের মধ্যে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য আনলেন; বাঙলার মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, পল্লীর গহনতম সূচীভেদ্য অন্ধকারেও তাঁর কবিতা লোকে রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলে পড়েছে। 'অগ্নি-বীণা'র মধ্যে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা ১৩২৮ সালের সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে প্রথম প্রকাশিত হয—বের হওযামাত্রই কবিতাখানি বহু পত্রিকায পুনর্মুদ্রিত হয়। এই কবিতা প্রকাশে নজরুল রসিক-সমাজে যেরূপ সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন অপর কারু ভাগ্যে তা ঘটেছে কিনা সন্দেহ। 'Childe Harold's Pilgrimage' প্রকাশিত হবার পর বায়রণ যেমন খ্যাতি পেযেছিলেন এবং নিজের খ্যাতি সম্বন্ধে সেদিন বলেছিলেন, 'I woke up one morning and found myself famous.' নজরুল বাযরণকেও এবিষযে ছাড়িযে গেছলেন। সমগ্র বাংলাদেশ তাঁকে এই কবিতার মধ্য দিয়ে প্রথম চিনেছিল। যৌবনধর্মী কবি-মানসের অস্থির, অধৈর্য ও দিশেহারা মন, ব্যক্তি ও আদর্শবাদ, শাসনের নামে অবাধ কুশাসনের প্রতিবাদ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের বিক্ষুব্ধ ভাষা ও বিদ্রোহের বাণী, অন্যায ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর জবরদস্ত সংহত সংগ্রাম ও সংগঠনের উদাত্ত আহ্বান এ কবিতার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। ক্ষমতার ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে জগৎ জুড়ে যে লড়াইযের হাওয়া উঠছে সেই হাওযা 'বিদ্রোহী' কবিতার মারফৎ বাংলা-সাহিত্যে প্রথম এনেছেন নজরুল। কবিতাটির নামকরণ সঙ্গত হয়েছে। কেননা, কবি হঠাৎ এক উন্মাদনার মধ্যে আত্মসচেতন হয়েছেন। বৈদিক ঋষির কণ্ঠে 'আত্মানাং বিদ্ধি'র সুর একদিন ধ্বনিত হযেছিল, সেই নিজেকে জানার সুর নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় উদ্ভাসিত :

'আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিযা গিয়াছে সব বাঁধ।'

অনেকেই সুইনবার্ণের 'হার্থা' কবিতার সঙ্গে এ কবিতার তুলনা করেন কিন্তু

'হার্থার' চেয়ে এ কবিতা অনেক উচ্চশ্রেণীর, আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। এ প্রসঙ্গে মোহিতলালের "আমি" প্রবন্ধের কথাও মনে আসতে পারে এবং "আমি" দিয়েই মোহিত-নজরুলের বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। "আমি" ও "বিদ্রোহীর" মধ্যে মিল যা কিছু আছে তা হোল উভয়েরই রচনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু মিল থাকলেও অমিলই রয়েছে বেশী। মোহিতলালের "আমি" নিবন্ধে দার্শনিক মনোভাব প্রবল, তার সঙ্গে সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতার খুব বেশী সম্বন্ধ নেই—এইখানেই "বিদ্রোহী" কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব। সেদিন বাঙলার আকাশে-বাতাসে যে বাস্তবসচেতনতার আবহাওয়া সমস্ত জনতাকে উত্তেজিত করেছিল তারই বাঙ্ময় মূর্তি "বিদ্রোহী" কবিতায় বিধৃত। ভাবালুতা ও বক্তব্যের মধ্যে অসংলগ্নতা থাকলেও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত "বিদ্রোহী" কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে তার রাজনৈতিক চেতনা। জগৎ ও জীবনের চারপাশে যে অত্যাচার অবিচার চলেছে তাকে রোধ করার মহান সঙ্কল্পই "বিদ্রোহী" কবিতার মূল সুর।

: যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।

(বিদ্রোহী : অগ্নি বীণা)

সচেতনতার স্বাক্ষর থাকলেও 'বিদ্রোহী' মূলতঃ রোমান্টিক কারণ এর মধ্যে কবি 'গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি'তে মুগ্ধ। বিদ্রোহের পাশাপাশি এই জাতীয় কল্পনায় কবিতার ফলশ্রুতি বিঘ্নিত হয়েছে। এজন্যে অনেকেই বলেন, 'বিদ্রোহী'তে এত লাফালাফির মধ্যে বিদ্রোহের সুস্পষ্ট পথ নজরুল দিতে পারেন নি। ('সাম্যবাদী' কবিতাসমষ্টি সম্পর্কেও একথা অনেকের মুখে বলতে শুনেছি)। অতএব কোথায় তাঁর মহত্ব? নজরুল কোন সমস্যার সমাধানের জন্যে বা বিপ্লবের নির্দিষ্ট পথ বাতলিয়ে না দিয়ে হয়ত মহৎ না হতে পারেন কিন্তু তাঁর মহত্ব তো প্রকাশ পেতে পারে সমস্যাকে চিন্তাক্ষেত্রে পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে। 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে 'কুর্নিশ'—এটি তাঁর খেয়ালি কথা নয়, কবির অন্তরের এটি প্রত্যয়বাণী। কবি, সাহিত্যিক, ভাবুক বা মনীষী আমাদের দেশে আরও অনেকের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন পুরুষোচিত ঐকান্তিক অটল

আত্মমর্যাদাবোধ এবং কবি-ধর্মের এমন অবিচলিত প্রেরণা এ জাতির ইতিহাসে একান্ত দুর্লভ। তাঁর মধ্যে আপন সৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে যে গভীর প্রত্যয় আমরা দেখি, আত্মসত্তায় সেরূপ বিশ্বাস খুব কম কবির মাঝেই দৃষ্ট হয়। এজন্য তাঁর রচিত সাহিত্যে কবিকে সূত্রধাররূপে সর্বদা সম্মুখে উপস্থিত দেখি, একটা পুরুষসত্তা অনুভব করি। যাঁরা নিছক আর্টপন্থী তাঁরা তাঁর সাহিত্য থেকে অনেক দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার করবেন কিন্তু তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে ব্যক্তি-চরিত্র ও কবি-প্রেরণার একটি আশ্চর্য সমন্বয় হয়েছে যার ফলে তাঁর প্রাণ ও মনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে কোন সংশয়ের ব্যবধান নেই—কাব্যসাধনাই যেন তাঁর জীবনসাধনা। কাব্যের মধ্য দিয়ে যা বলেছেন তা রেখে ঢেকে বলেন নি, বলেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে, বৈদিক ঋষির মত উদাত্ত কণ্ঠে। তাই তাঁর সমস্ত দোষ-ত্রুটি ছাপিয়ে স্পষ্ট করে প্রতিভাত হয়েছে তাঁর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। হুইটম্যানের কথা ছিল, "who touches this book touches a man." নজরুলের রচনাবলী সম্পর্কেও একথা সত্য। নজরুল-প্রতিভার পৌরুষের এই অনন্যসাধারণতা যে উপলব্ধি না করেছে, বাংলা-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রসাস্বাদ হতে সে বঞ্চিত হয়ে আছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'আমিত্বে'র অহঙ্কার আছে বলে অনেকের মনে হতে পারে এবং এই অহমিকার প্রাবল্য তাঁর পরবর্তী সাহিত্যে খুব বেশী ভাবেই রয়েছে। হুইট্‌ম্যানের 'আমিত্ব' যেমন গণতন্ত্রী আমেরিকার আত্মঘোষণা, মায়াকভস্কির যেমন সমাজতন্ত্রী সোবিয়েতের আত্মপ্রতিষ্ঠা, তেমনি নজরুলের 'আমি' দুনিয়ার শৃঙ্খলিত মানবসমাজের বিশেষ করে সে-সমাজের সবচেয়ে নির্যাতিত, সবচেয়ে শোষিত অংশ, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি কণ্ঠ। 'ধূমকেতু' কবিতার দৃপ্ত প্রাণময়তা অন্যত্র দুর্লভ। 'বিদ্রোহী'র যা বক্তব্য 'ধূমকেতু'রও তাই। 'ধূমকেতু' নামে মোহিতলালেরও একটি কবিতা রয়েছে; এ কবিতাটি মানসী, ১৩২৭ বৈশাখে প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির প্রথমাংশ হচ্ছে এইরূপ—

ঃ কল্পান্তের সহচর, উপপ্লব হেতু
বিশ্বত্রাস অমঙ্গল, আমি ধূমকেতু।
উড়ায়ে পিঙ্গল-পুচ্ছ নিশীথ আকাশে
অনন্ত-দাহন দেহ সচকিত ভাসে
গ্রহ উপগ্রহ পরে ;

নজরুলের 'ধূমকেতুর' আরম্ভ—

: আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

এখানেও সেই একই কথা যে মোহিতলালের 'ধূমকেতু' ও নজরুলের 'ধূমকেতু'র মধ্যে পার্থক্য রয়েছে উভয় কবির মানসবোধের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে। নজরুলের 'ধূমকেতু'র মধ্যে কবির বিদ্রোহীসত্তার স্বাক্ষর প্রখরভাবে চিহ্নিত। 'ধূমকেতু'র মধ্যে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রয়েছে কিন্তু বুর্জোয়া-শাসকরা যে অত্যাচার-নিপীড়ন মানুষের ওপর করছে সে-চেতনা কবির মনে অঙ্কুররূপে রয়েছে—তার স্পষ্ট চিত্র অর্থাৎ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি পরে যা স্পষ্ট রূপ নিয়েছে "ভাঙার গান", "ফণীমনসা", "সর্বহারা" কাব্যগুচ্ছে।'

'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু'র মধ্যে যে বিদ্রোহ দেখি শেলীর 'Prometheous Unbound' এও সেই একই বিদ্রোহের অর্থাৎ ভগবানের সৃষ্টিলীলার অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখতে পাই।

ভারতীয় রাজনীতিতে যখন খেলাফৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আলি ভ্রাতৃদ্বয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতা আনয়ন করার কাজে ব্যাপৃত, তখন নজরুল এই মিলন প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করে তোলবার জন্যে লিখলেন 'কামাল পাশা' ও 'শাত-ইল-আরব'। এই কবিতা দুটির উদ্দেশ্য ঐশ্লামিক রাষ্ট্র-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা নয়, ঐ কবিতাদ্বয়ের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের সামনে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলিম-তমুদ্দুনের সংমিশ্রণে ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতন রূপ ফুটিয়ে তোলা। তাই নজরুলের কাব্যে ও গানে সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ দেখতে পাই। হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেকের জ্ঞান আছে প্রচুর কিন্তু নজরুলের মত উভয় সংস্কৃতির প্রতি সর্বসংস্কারমুক্ত চিত্ত অপর কারুর মধ্যে তেমন দেখিনি। একদিকে হিন্দুসংস্কৃতির মনীষা, ত্যাগ ও তপস্যা, অপরদিকে মুসলিম সংস্কৃতির দুর্বার তেজ ও দুরন্ত সাহসের অপূর্ব মিশ্রণে যে দিব্য মানবত্বের সৃষ্টি হয় কবি নজরুল-সাহিত্য সেই রসাদর্শের সাহিত্য। এটি তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। 'মোহর্‌রম', 'আনোয়ার', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবাণী', 'রণভেরী' কবিতাগুলির প্রত্যেকটি ছত্রে মুসলিম

সমাজের গতানুগতিক জীবনের প্রতি ধিক্কার ও সেই সঙ্গে জেগে ওঠার জন্যে মৃত্যু-ভয়হীন আহ্বান ধ্বনি ফুটে বেরিয়েছে। একদিকে যেমন মুসলিম্ সমাজকে জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছেন তেমনি অপরদিকে হিন্দু সমাজের জড়ত্ব ঘোচাবার জন্যে 'রক্তাম্বরধারিণী মা' ও 'আগমনী' কবিতা লিখেছেন। 'কামাল পাশা' নিঃসংশয়ে সার্থক সৃষ্টি এবং একাধিক কারণে সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি। কবি-কল্পনার অতুলনীয় ঐশ্বর্যে, হ্রস্ব অথচ অর্থগৌরবপূর্ণ ভাবণে 'কামাল পাশা'র মতন কবিতা বাংলা-সাহিত্যে আর রচিত হয় নি। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা এ কবিতাটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, ।

"গদ্য-পদ্যময় কবিতার সংস্কৃত নাম চম্পূ, সে হিসাবে এ কবিতাটিকে চম্পূ বলিলে ইহার বিশেষত্ব বুঝান যায় না, কারণ ইহাতে যে উদ্দীপনা আছে, প্রাচীন চম্পূতে তাহা পাই না। যুদ্ধের অভিযানে জয়ডঙ্কার তালে তালে যোদ্ধাদের যে জয়োল্লাস এই 'কামাল পাশা' কবিতাটিতে পাই, তাহা এদেশের সাহিত্যে নূতন। কবির ছন্দে ও ভাষায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি ; ইরাণ ও ভারতের এমন অপূর্ব মিলন, মোগল সম্রাটের আমলে নামজাদী হিন্দি-সাহিত্যেও দেখি নাই।" (শ্রাবণ ১৩৩১)

নজরুলের কবি-কল্পনাকে কামাল চরিত্র নানাদিক দিয়ে উদ্দীপ্ত করেছিল এই কারণে যে সেদিন কামাল ছিলেন শুধু তুরস্কের জনজাগরণের প্রতিনিধি নয়—পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিত জনতার প্রতিনিধি। 'কামাল পাশার' কবিতার মধ্যে পরাধীনতার অন্তর্জ্বালা ও স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে। এই কামালকেই তিনি এদেশের আদর্শপুরুষ হিসেবে গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেছেন, "যাক, এতদিনের পর একটা ছেলের মত বেটাছেলে দেখলাম। এমন দেখা দেখে মরতেও আর আপত্তি নাই। এতদিন দুঃখ হত যে, এই হিজড়ে নপুংসকগুলোর মুখ দেখে মরবার পাপে হয়ত আবার শূয়োর হয়ে জন্মাতে হবে, কেননা হিজড়ের মুখ দেখে যাত্রার মত অলুক্ষণে কোন কিছু আছে কিনা জানি না। কিন্তু হঠাৎ একি শুনি?··· বিশ্বে যখন, "যেদিকে ফিরাই আঁখি, কেবল মাদিই দেখি—অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময় মদ্দাপুরুষ কামাল এলো তার বিশ্বত্রাস মহাতরবারী নিয়ে সামাল সামাল করে রোজকীয়া মতের ঝঞ্ঝার মত, রুদ্রের মহারোষের

মত। অত্যাচারীর মুখে গোখুরা সাপের বিষাক্ত চাবুক মেরে মুখ ছিঁড়ে ফেললে ক্ষ্যাপা ছেলে। ঘুসি মেরে তার মুখটা ঘুরিয়ে দিলে, পেঁদিয়ে তিনভুবন দেখিয়ে দিলে। হঁ্যা, ব্যাটাছেলে বটে বাবা, একেই বলে বাপের ছেলে সুপুত্তুর।" (১৩২৯, ৩০শে আশ্বিন। এই প্রবন্ধটি সম্প্রতি প্রকাশিত "ধূমকেতু" প্রবন্ধপুস্তকে পাওয়া যাবে।)

'কামাল পাশা'র মধ্যে যুদ্ধের গৌরবময় রূপের সঙ্গে তার ঘৃণ্য রূপও পাশাপাশি কবি দেখিয়েছেন। দেশবাসীকে স্বাধীনতার সংগ্রামে আত্মদান করতে আহ্বান জানিয়েছেন, ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে ব্যঙ্গ করে বক্তব্যকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলেছেন।

'প্রলয়োল্লাসে' কবি দেশবাসীক বীর্যের ক্ষেত্রে, সত্যের সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্যে ডেকেছেন। পুরোনোকে ভেঙে তার স্থলে নতুনকে দেখতে চান —এটাই কবিতার মর্মকথা, আসলে একথা 'অগ্নি-বীণা'রও মূল কথা। 'ওই নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়' এই-ই হোল তাঁর প্রলযোল্লাস। এই ধ্বংসলীলার পরে—

ঃ আসবে উষা অরুণ হেসে করুণ বেশে।
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভর্‌বে এবার ঘর।

ধ্বংসকে দেখে কবি ভয় করেন না, কারণ তার ভিতর দিয়েই আস্‌ছে ভবিষ্যতের সুমহৎ সম্ভাবনা। বর্তমানের ধ্বংসকামনা ও নতুন সৃষ্টিতে বিশ্বাস তাঁর পরবর্তী কাব্যসমূহে বারবার ধ্বনিত হয়েছে।—

ঃ ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নূতন সৃজন বেদন,
আস্‌ছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে কর্‌তে ছেদন।
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আস্‌ছে হেসে—মধুর হেসে!
ভেঙে আবার গড়্‌তে জানে সে চির-সুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

পারিপার্শ্বিক জীবনে ও সমাজে যা কিছু অনুদার ও অশুভ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ "অগ্নি-বীণা"য় স্পষ্ট পাই। "অগ্নি-বীণা" পড়ে আমার একথাটিই মনে হয় যে, এই কবি এমন একটি সুরের সম্মোহন সৃষ্টি করেছেন যা ভোলা তো যায়ই না, বরং মনের দুয়ারে হানা দেয়। পরিকল্পনার দিক যেমন সুন্দর তেমনি মহত্ত্বব্যঞ্জক, বাংলা-কাব্যের ঐতিহ্যেও সম্পূর্ণ অনাস্বাদিতপূর্ব।

"অগ্নি-বীণা"র পর "দোলন-চাঁপা" হোমযজ্ঞের পূর্ণাহুতি শান্তি ও স্বস্তির মন্ত্র। বিদ্রোহ-বিপ্লব নিয়ে তন্ময় ছিল যে-চিত্ত তা তাঁকে আর তৃপ্তি দিতে পারছিল না, বৃহত্তর সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা মনের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ তুলছিল, তারই প্রাথমিক পরিচয় হিসেবে "দোলন-চাঁপ"র প্রকাশ। এজন্যে সকল ভাব, সকল রূপ, সকল রস দেখছি কবিচিত্তকে আকর্ষণ করেছে। এই যৌবন-স্বপ্নই কবিকে সৌন্দর্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে—সে-সৌন্দর্য নারী-দেহে, সে-সৌন্দর্য প্রকৃতিতে, সে-সৌন্দর্য ভোগে ও মিলনে, প্রেমে ও বিরহে।

এ বইয়ের মধ্যে 'দোদুল দুলে'র ছন্দলীলা বিস্ময়কর—সে যেন নেচে চলেছে ঝর্ণার মতো, কোথাও তার পথে এতটুকু বাধা নেই—

ঃ দোদুল দুল্
দোদুল দুল্
বেণীর বাঁধ,
আলগ্ ছাঁদ,

পড়তে পড়তে কেমন একটা নেশা লাগে। 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে', 'অভিশাপ', 'কবি রাণী, 'বেলা শেষে' কবিতা কয়টি ভাবের গভীরতায়, ভাষার সৌন্দর্যে অতুলনীয়। 'পূজারিণী' কবিতায় তাঁর প্রকাশভাব অনেকটা ভাবালুতা-আবিল। তবে ছন্দ, যতি, শব্দ যেখানে ভাঙা ভাঙা লাগে সেখানে কবির প্রতি বিরক্তির বদলে সহানুভূতি জাগে; যেখানে ভাষার ওপর সম্পূর্ণ অধিকার না থাকায় ভাব আহত হচ্ছে সেখানে নিজের প্রাণের ভাষা নিয়ে পূরণ করে দিতে ইচ্ছা হয়। কবি নবীন একথা যেমন 'দোলন-চাপার' প্রতি ছত্রে মনে পড়ে, তেমনি প্রকৃত কবিত্বশক্তি যে তাঁর মধ্যে সৃষ্টির পূর্ণ সার্থকতা প্রকাশের জন্যে তাগিদ করছে একথাও বেশ উপলব্ধি করা যায়। ভাষায়

যেসব খোঁচ আছে, ছন্দে যেসব হোঁচট খাওয়া আছে সেগুলোই যেন তাঁর আবেগের অধীরতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে, কারণ প্রকাশের যে পীড়া, সেইটে এখানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সে পীড়াকে জয় করে তিনি এখানে artist-এর সংযম আয়ত্ত করতে পারেন নি। কিন্তু এমন সব কল্পনা, রসমাধুরী এবং ভাষা ও সুরের আচম্বিত উল্লাস স্থানে স্থানে আছে যে, কাব্য-সুন্দরীর প্রসন্ন হাসি তাঁকে যে সত্যিই ভুলিয়েছে তা অবিশ্বাস করা যায় না। কাব্যবস্তু যে কি তা তো বাক্যের দ্বারা কিংবা সংজ্ঞার দ্বারা বোঝানো যায় না—'It defies all attempt at analysis'—নইলে হাতে-কলমে প্রমাণ করা যেত, এই বইখানির মধ্যে এমন কতকগুলো স্থানে সত্যিকারের কাব্য-রস আছে—যা ভাষা, ছন্দ, এমন কি বাক্যার্থেরও অতীত। আঙ্গিকের শৈথিল্য সত্ত্বেও 'দোলন-চাঁপা' কাব্যরসিকের পরম সমাদরের যোগ্য।

"ছায়ানট" ভাবমাধুর্য ও কল্পমায়ায়, প্রেমের নতুন আস্বাদনে ও নিসর্গের কান্তমধুর রূপের সুকুমার সম্ভোগে 'দোলন-চাঁপা'র চেয়ে সার্থকতর কাব্য।

"ছায়ানটে"র 'চৈতী হাওয়া'য় স্মরণীয় বিশেষ কিছু হয়তো ছিল না, কিন্তু এখন দেখছি তার কয়টি লাইন আজো ভুলতে পারিনি—

ঃ উদাস দুপুর কখন গেছে এখন বিকাল যায়,
ঘুম জড়ালো ঘুম্‌তী নদীর ঘুমুর পরা পায়!
শঙ্খ বাজে মন্দিরে,
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,
ঝাউএর শাখায় ভেজা আঁধার কে পিঁজেছে হায়!
মাঠের বাঁশী বন-উদাসী ভীম্‌পলাশী গায়!

—অতি পুরোনো কল্পনা এখানে যেন একটি নতুন ও অপূর্ব রূপ পেয়েছে। কয়েকটি লাইনে সম্পূর্ণ একটি ছবি পেলুম। 'বিজয়িনী', 'শায়ক বেঁধা পাখী', 'চির-শিশু', 'বিদায় বেলায়', 'সন্ধ্যাতারা', 'আশা' প্রভৃতি কবিতায় এমন একটা সুর বুকে এসে লাগল যেটি পূর্বে শুনেছি অথচ শুনিনি।

"পূবের হাওয়া" "ছায়ানটের" ক্রমানুবন্ধী কাব্য। "ছায়ানটে"র অধিকাংশ কবিতা "পূবের হাওয়ায়" সংকলিত হয়েছে—সংকলনের সময় কিছু কিছু কবিতার নামও পরিবর্তন হয়েছে। দেহস্পর্শসুখকামী প্রেম "পূবের হাওয়া"য় প্রকীর্ণ।

আনন্দিত বেদনার সঙ্গে অমৃতময় যন্ত্রণার পরিচয় 'মরমী', 'স্মরণে'; 'বেদনা-মানিক', 'নিশীথ-প্রীতম', 'শেষের ডাক' প্রভৃতি কবিতায় পাওয়া যায়।

"ভাঙার গান", "বিষের বাঁশী", "ফণি-মনসা", "সর্বহারা", "প্রলয়-শিখা", "সন্ধ্যা" প্রভৃতি কাব্যে নজরুলের আর এক রূপ পাই। কিন্তু কোথায় গেল "দোলন-চাঁপা", "ছায়ানটে"র সেই রূপ ও রসানুভূতির বাসন্তিক বর্ণবহ্নি, কোথায় গেল সেই নৃত্য-চপল, গীতি-মুখর বাণীবন্যার ফেনিল কলোচ্ছ্বাস? এখানে কাব্যলক্ষ্মী হলেন একেবারে নিরাভরণা। পৃথিবীর সৌন্দর্যকে, জীবনের সৌন্দর্যকে ধনিক শক্তির ব্যভিচারী প্রতাপ বিক্ষত করেছে, পৃথিবীর স্নিগ্ধ সবুজ শ্যামল আস্তরণে আজ নেমে এসেছে কঙ্কাল-পরিকীর্ণ আতঙ্ক-পাণ্ডুর-মরুভূর প্রেতচ্ছায়া। তাই নিরন্ন ও নিগৃহীতের দুঃখ কবিকে কঠোর বাস্তবে নামিয়েছে। জীবনের এক অন্ধকারময় কোণে যারা দাঁড়িয়ে আছে সসঙ্কোচে, যারা উপদ্রুত, যারা অপমানিত, যারা বুভুক্ষু, যারা জীবনমন্ত্র বর্জিত, তারাই এসে ভীড় করে দাঁড়াল কবির কাব্য-প্রাঙ্গণে। এল চাষী, এল কলের মজুর, এল জাল হাতে নিয়ে জেলে, এল সমাজের রূপজীবিনীরা। শক্তি মদমত্ত ধনতান্ত্রিক সভ্যতা যে মানবতাকে প্রতিমুহূর্তে লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত করছে, এসম্বন্ধে চেতনা কবিচিত্তে আগেই জেগেছিল, "অগ্নিবীণা"তেই সে পরিচয় পাওয়া গেছে —এসব কাব্যে এই ঐতিহাসিক সচেতনতা আরও গভীর হয়েছে। এসব কাব্যে সমসাময়িকতা প্রচুর আছে, সে-সবের বাস্তব মূল্য স্বাধীন ভারতে বেশ কিছুটা কমে গেছে কিন্তু সমসাময়িক আবেষ্টনী থেকে রস আহরণ করেও সেই সাম্প্রতিক উপকরণকে চিরন্তন রসে অভিষিক্ত করা যায় এবং সেইভাবেই করতে হয় সাহিত্য। তাই আজও আমরা "ভাঙার গান", "বিষের বাঁশী", "সর্বহারা", "ফণি-মনসা" প্রভৃতি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে পড়ি।

সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর নিষ্ঠুর উন্মত্ততা কবির মনে পীড়া ও উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল; তারই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে "প্রলয়-শিখা", "ভাঙার গান", "বিষের বাঁশী"র কবিতাগুলো বেরোল। "প্রলয়শিখা"র এক একটি কবিতা এক একটি আগুনের ফুল্কি; "ভাঙার গানে"র কবিতাগুলির দৃপ্ত প্রাণময়তায় একেবারে বিমোহিত হতে হয়। "প্রলয়শিখা", "ভাঙার গানে"র যা সুর "বিষের বাঁশী"রও সেই সুর—একই সুরের এপিঠ-ওপিঠ। "বিষের বাঁশী"র বিষ যুগিয়েছেন, 'আমার নিপীড়িতা দেশমাতা আর আমার ওপর বিধাতার

সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।' এ বইয়ের কবিতাগুলি আগুনের শিখার মত প্রোজ্জ্বল উজ্জ্বল লেলিহান। তাই এ তিনখানি বই প্রকাশ হবামাত্রই রাজরোষের অপরাধে বাজেয়াপ্ত হয়।

'ফণি-মনসায়' কবি দেশবাসীকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন,—

ঃ নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী,
জাগো রে জোয়ান! ঘুমায়োনা ভুয়া শান্তির বাণী শুনি।
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই
দানব দৈত্য তবু মরে নাই,
সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, ব'সে ব'সে কাল গুনি!
জাগো রে জোয়ান! বাত ধ'রে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি!

(সব্যসাচী)

সুতো দিয়ে গান্ধীপন্থী তথাকথিত অহিংসাবাদীদের যে স্বাধীনতা ভিক্ষা, তাতে শাসকদের মন গলেনি। তাদের নেতৃত্বে যখন দেশের মুক্তি আন্দোলনকে অন্ধচোরা গলির মধ্যে ঢুকিয়ে দেশপ্রেমের সৌখীন অভিনয় চালিয়েছে তখন কবি বাংলার বিপ্লবী নওজোয়ানদের আহ্বান করেছেন, ভূয়ো শান্তির ঘুমপাড়ানি গান বন্ধ করতে বলেছেন। সমস্ত সংস্কার, সমস্ত আপোস-রফার অলিগলির সঙ্কীর্ণতা বর্জন করে সংশয় দ্বন্দ্ব-দুর্বলতা মন থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিয়ে কবি নজরুল বাঁচার মত বাচতে আহ্বান করেছেন—

ঃ মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি,
টিকি দাড়ি নিয়ে আজও বেঁচে আছি!
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিযাছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার ম'রে বাঁচি।

(সব্যসাচী)

—এই হোল সেদিনকার বিদ্রোহী বাঙলার মনের কথা। এই মনের কথা মনের মত করে বলে চিরতরুণ চিরনবীন বাঙলার অন্তরের মণিকোঠায় বাংলার অনন্যসাধারণ কাব্যপ্রতিভা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে যখন যৌবন এসেছে, যখন 'বলাকা-পুরবী' যুগে গতিশীল জীবনবাদের জোয়ার বইছে, তখনও বাঙলার একান্ত আপনার বিদ্রোহী কবি নজরুলের আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। যুদ্ধান্ত পৃথিবীর অন্যায় অবিচারে সংক্ষুব্ধমনা রবীন্দ্রনাথ সেদিনের

বিক্ষুব্ধ বাস্তবকে তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করে বিদ্রোহানুভূতির সম্পূর্ণতা আনতে পারেননি অথচ নজরুল তার একটি pen portrait রেখে দিয়ে গেলেন তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে।

আজ সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে বিষিয়ে উঠেছে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের উন্মত্ততা আমাদের পঙ্কস্তরে নামিয়েছে। কিন্তু কবি নজরুল এই মত্ততার মধ্যে দেখেছিলেন সুন্দরকে, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আক্রমণ শক্তিকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন—সেদিনই করে রেখেছিলেন আজকের স্বাধীনতার ভবিষ্যদ্বাণী—

ঃ যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া,
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ.
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ—জেগেছে ত তবু—বিজয়-কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণ-লঙ্কা পুড়া'

(হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ)

সমগ্র ভারতের বিপ্লবী চাষী মজদুরের সংগ্রাম "সবহারার" কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই "সর্বহারা"র প্রত্যেকটি ছত্রে চাষী-মজদুর শ্রমিকের জয়গান। শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে তাঁর অন্তরের ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে এই কাব্যে। সত্যেন দত্তের কাব্যে কিষাণ-মজুরের জয়গান এবং সভ্যতারব নিয়াদে তাদের কর্মের গরিমাকে মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। যতীন সেনগুপ্তও দুর্গত নিপীড়িত কৃষক-মজুরদের ব্যথা-বেদনাকে রূপ দিয়েছেন কিন্তু নজরুল সর্বহারা বঞ্চিতের দলকে যে দরদ দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, নিজের জীবনের অসহ্য আঘাত ও অত্যাচারের সঙ্গে পীড়িত মানুষের শোষিত জীবনের যোগাযোগ ঘটিয়েছেন, যে বলিষ্ঠ লেখনীমুখে তাদের বিড়ম্বিত জীবনের বঞ্চনা অস্বীকার করে নির্ভীক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছেন তেমনভাবে আজ পর্যন্ত আমাদের বাঙালা সাহিত্যে আর কোন কবি করতে পারেন নি। বর্তমানে কমিউনিষ্টপন্থী বাংলা-সাহিত্যে চাষী-মজুরদের নিয়ে রচিত কাব্যের বন্যা বইয়ে দেওয়া সত্ত্বেও নজরুলের আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ দীপ্ত কবিতাগুলি এই পর্যায়ে এখনও প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পাবার যোগ্য।

আজকাল যে সাম্যের বাণী লোকের মুখে মুখে বুলিতে পরিণত হয়েছে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলই তার প্রথম উদ্গাতা। 'সাম্যবাদী' কবিতা-সমষ্টিতে সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক চেতনা নেই, সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কবি-মনের বেদনাময় চিত্তের প্রকাশ পাই। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়কে যুক্তির দ্বারা, প্রমাণের সাহায্যে যত না বোঝাতে চেয়েছেন তার চেয়ে বেশী মানুষের সহজ বোধ-শক্তিকে, অনুভূতিকে তাঁর অপূর্ব ভাবের অপরূপ ভাষার সাহায্যে বিষয়কে শ্রোতা ও পাঠকের একেবারে অন্তরের অন্তঃপুরে ঠেলে দিয়েছেন—সমস্ত ব্যাপারটা যেন প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলে মনে হয়। তখন মনে হয় এই তো যুক্তি, এই তো প্রমাণ! সরস ও অনায়াসলব্ধ উদাহরণের সাহায্যে বুদ্ধিকে নিরস্ত্র করার মত এমন ক্ষমতা খুব কম কবিরই থাকে। 'সাম্যবাদ' নিয়ে যদি যুক্তি-তর্কের কচকচানি প্রবন্ধ লেখা হত তাহলে তা সহজে লোকের মন আকৃষ্ট করতে পারত না। তাতে যত বৈজ্ঞানিক চেতনাই থাক আব সুস্পষ্ট পথের ইঙ্গিতই থাক। যুক্তিতর্ককে হৃদয়ের জারক রসে জারিত না করে পরিবেশন করতে গেলে সাধারণ মানুষের কাছে বক্তব্য বিষয়কে পৌছিয়ে দেওয়া যাবে না—একথা নজরুল ভালভাবে জানতেন বলেই সহজ কথায় অল্পের মধ্যে যা লিখেছেন তা বর্তমানে কমিউনিষ্ট পার্টির সাম্যবাদ প্রচারের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী হয়েছে, কেননা তাঁদের প্রচারের মধ্যে অনেকেই বিদেশীয় গন্ধ খুঁজে পান কিন্তু নজরুলের কবিতার মধ্যে তা নেই অথচ বক্তব্য বিষয় কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

'সাম্যবাদী'র প্রধান সুর মানবিকতা; মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিভেদের ঊর্ধ্বে সর্বজনীন সাম্যের বাণী কবি আমাদের শুনিয়েছেন। বারাঙ্গনাকে সতীসাধ্বীর মতোই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তাদেরকে মা বলে সম্বোধন করেছেন যা বাংলা-সাহিত্যে অভিনব, নারীকে প্রাপ্য সম্মান দিয়েছেন। সমাজবাদীদের কাছে এর মূল্য কতটা তা আমার জানা নেই কেননা ও শাস্ত্রটা আমার তেমন আয়ত্তে নেই। তাহলেও সমাজবাদী রাষ্ট্রের ভবিষ্যতকে অভিবাদন জানিয়েছেন তিনি—

ঃ সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে
মোদের মাথায় চন্দ্র সূর্য তারারা পড়ুক ঝ'রে!

সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি'
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শুন এক মিলনের বাঁশী।

...   .

মহা মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।

(কুলিমজুর—সাম্যবাদী : সর্বহারা)

নজরুল হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের সারটুকু গ্রহণ করেছেন—এ যেন নারকোলের অন্তঃসারটিকে নিয়ে ছোবড়াকে ফেলে দেওয়া। তাই নজরুল কোন বিশেষ ধর্মের কবি নন। জাতিভেদ তাঁর কাছে নেই, তিনি হচ্ছেন অখণ্ড মানবজাতির কবি—নির্যাতিত মানবতার মুক্তির সাধক। 'সাম্যবাদী' কবিতার প্রথমেই আছে—

: গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রীশ্চান।

সহজ সাধনের কবি চণ্ডীদাস একদিন যে প্রসঙ্গে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন সেই প্রসঙ্গকে অক্ষুণ্ণ রেখে নজরুলও বলেছেন—

: মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

(মানুষ : সাম্যবাদী)

মানুষ যখনই এই সহজ সত্য বিস্মৃত হয়ে আপন দম্ভে বিভেদের সৃষ্টি ক'রে মানুষের মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে, লাঞ্ছিত করেছে নারীর নারীত্বকে, সেইখানেই বেজে উঠেছে কবির কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর। মানুষ যেখানে মানুষকে অবহেলা ক'রে তার ধর্মকে, তার দেবতাকে বড় ক'রে দেখেছে সেখানেও কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

: তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে' দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।

(সাম্যবাদী)

মসজিদ, মন্দির, গির্জা প্রভৃতি ভজনালয়ে ভগবান নেই—ভগবান আছেন মানুষের হৃদয়ের মধ্যে, কেননা মানুষই নারায়ণ। সত্যদ্রষ্টা নজরুল এই মহাসত্যকে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন—

: এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই। (ঐ)

এইসব কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব আবিষ্কার করা কঠিন নয়। তাঁর "হোমশিখা" কাব্যগুচ্ছের 'সাম্য-সাম' কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে। তবে নজরুলের সাম্যবাদ বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত জীবনের ভিত্তির সঙ্গে জড়িত।

সাম্যবাদই মানবজাতির ধ্রুব লক্ষ্য কিনা এ বিষয়ে অনেকেই তর্ক তুলবেন। সে-তর্ক তোলা এখানে অবান্তর হলেও তাঁদের বলব কাব্যে অবিশ্বাসেব মূল্য নীতিগত নয়, শিল্পগত বিষয় হয়েছে কিনা সেটাই বিচার্য। ঈশ্বর-অবিশ্বাসী পাঠকের পক্ষে যদি রবীন্দ্রনাথের কবিতা উপভোগের কোন বাধা না থাকে তাহলে সাম্যবাদে সন্দিহান পাঠকের পক্ষে 'সাম্যবাদী' কবিতাসমষ্টি উপভোগ্য না হবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

পূর্বেই বলেছি সম্প্রদায়গত কিংবা জাতিভেদমূলক কোনো প্রশ্ন কবিকে সঙ্কীর্ণতার পথে পরিচালিত করেনি। বরং প্রাক-স্বাধীনতা যুগের মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিকদের প্রতি, জনগন-মন-অধিনায়কের প্রতি কবি 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতার মাধ্যমে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন। কবিতাটি কিছুটা রূপকধর্মী। স্বাধীনতাকামী জনগণকে অভিযাত্রীরূপে, জাতীয়-জীবনকে তরণীরূপে, স্বাধীনতার পথের প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তিকে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্ররূপে, পরাধীনতার হতাশার অন্ধকারকে নিশীথের আঁধাররূপে তুলনা করা হয়েছে। অগণিত বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে যিনি স্বাধীনতার কূলে নৌকাকে ভিড়িয়ে দেবেন তিনিই হলেন এই কবিতার কাণ্ডারী। সাম্প্রদায়িকতা নয়, স্বাধীনতাই কাণ্ডারীর জীবন-সাধনার মন্ত্র হবে। এ কবিতায় কল্পনার প্রসার নেই বা কোনো সমুচ্চভাবের রূপায়ণও নেই তবু এতে দেশপ্রেমের গভীরতার যে উত্তাপ রয়েছে, দেশ ও জাতির প্রতি যে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে তার মূল্য বর্তমানে কিছু কমে গেলেও এ কথা বলব যে এর আবেগকম্পিত ভাষার সঙ্গীতময়তার আবেদন সর্বকালীন ও সর্বজনীন।

মানুষে মানুষে যে কলহ, ধনিকের শোষণ, মহাজনের অত্যাচার, কুলি-মজুরের দুঃখ, পরাধীন থাকার দুঃখ এসব ভগবানের কাছে ফরিয়াদ করছেন,

যখন তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না একেবারে উপায়বিহীন বলে; সহ্যেরও একটা সীমা আছে—

: এই ধরণীর ধূলিমাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও আদি পিতা ভগবান!

... ...

শ্বেত, পীত, কালো করিয়া স্থজিলে মানবে, সে তব সাধ।
আমরা যে কালো, তুমি ভাল জান, নহে তাহা অপরাধ।

... ...

সাদা র'বে সবাকার টুঁটি টিপে, এ নহে তব বিধান।
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।

... ...

অন্যায় রণে যারা যত দড় তারা তত বড় জাতি,
সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি।
তোমার চক্র রুধিয়াছে আজ
বেনের রৌপ্য-চাকায়, কি লাজ!
এত অনাচার স'য়ে যাও তুমি, তুমি মহামহীয়ান!
পীড়িত মানব পারে নাকো আর, স'বে না এ অপমান—

... ...

তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথ্বী সকলে করিব ভোগ,
এই পৃথিবীর নাড়ী'র সাথে আছে স্থজন-দিনের যোগ।
তাজা ফুলে ফলে অঞ্জলি পুরে'
বেড়ায় ধরণী প্রতি ঘরে ঘুরে',
কে আছে এমন ডাকু যে হরিবে আমার গোলার ধান?

(ফরিয়াদ)

লোকক্ষয়ী সংগ্রামের বর্বর উপলব্ধিতা কবিকে কাতর করে তুলেছিল। তাঁর কালেই প্রথম মহাযুদ্ধ হয়েছে—সৈনিক হয়ে তিনি বর্বর হত্যাকাণ্ড দেখেছেন। তাই মানবিকতাবাদী নজরুল ব্যাপক নরহত্যাকে নিন্দা না করে পারেন নি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী কবি

শান্তিরও এক উদ্দাম সৈনিক। যুদ্ধবাজদের কারসাজিকে তিনি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেছেন। 'ফরিয়াদ' কবিতার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যেমন—

: নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান বিজ্ঞান।

… … … …

যে-আকাশ হ'তে ঝরে তব দান আলো ও বৃষ্টি-ধারা'
সে-আকাশ হ'তে বেলুন উড়ায়ে গোলাগুলি হানে কা'রা?
উদার আকাশ বাতাস কাহারা
করিয়া তুলিছে ভীতির সাহারা?
তোমার অসীম ঘিরিয়া পাহারা কা'র কামান?
হবে না সত্য দৈত্য-মুক্ত? হবে না প্রতিবিধান?
ভগবান! ভগবান!

এই সময় নজরুলের কাব্য নিয়ে যা-তা সমালোচনা চলে; তাতে কবি 'আমার কৈফিয়ৎ'-এ তার উত্তরদান-প্রসঙ্গে জীবনের অনেকটা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন:

: বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসেনা ক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে।
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!
পরোয়া করিনা, বাঁচি না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রে—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!

—এই কথাগুলিতে আছে তিক্ততা, আছে বিতৃষ্ণা, আছে বিদ্রূপ, আছে বণিক-সভ্যতার চাপে নীরক্ত মানুষের হতাশা আর উন্মত্ততা আর ক্লান্তি। রাজনীতির ফাঁকা আদর্শ নজরুলকে অভিভূত করেনি, 'আমার ক্ষুধার অন্নে পেয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ' তাই—

ঃ ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।
বেলা ব'য়ে যায়, খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুণ
কেন ওঠে না'ক তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?

—এই হোল সুগভীর বেদনার অভিব্যক্তি যা আপামর সাধারণের নিত্যকার অনুভূতি। আজও তো আমরা স্বরাজ পাওয়া সত্ত্বেও পেটভরে খেতে পাইনে, কত কচি ছেলে মায়ের কোলে না খেয়ে মারা যায় তার ইয়ত্তা নেই, তাই আজও এসব কবিতার প্রয়োজন এতটুকুও কমেনি। এইখানেই আমরা কবি নজরুলের শিল্পবোধ ও সমাজবোধের অপূর্ব সংমিশ্রণের প্রকাশ দেখতে পাই যা ঔজ্জ্বল্যে, আন্তরিকতায়, প্রকাশের সাবলীলতায় বাংলা-সাহিত্যে অতুলনীয়।

মানব-জীবনের সকল দিক দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করার যে একটি আকুলতা "দোলন-চাঁপা", "ছায়ানটে' একান্ত করে টানছিল তারই চরম 'সিন্ধু-হিন্দোলে'র মধ্যে মূর্ত হয়েছে। এখানে মন আর শুধু বাইরের কোলাহলে মত্ত নয়, বিচিত্রদৃশ্যের রসলীলার ছবি আঁকার কাজে ব্যস্ত, জীবনের সঙ্গে কবির আরও আত্মস্থ হওয়ার দুরূহ সাধনায় সে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। আত্ম-সমাহিত চিত্ত থেকে এ বইয়ে যে কবিতাগুলি পাতা জুড়ে বসেছে সেগুলির অধিকাংশই এক একটি হীরের টুকরো। যৌবনের বিচিত্র স্বপ্ন, প্রেম, নারীর সৌন্দর্য-রহস্য, জীবনের গভীর তাৎপর্য কিছুই কবিচিত্তের স্পর্শ হতে বাদ পড়েনি। তাই 'সিন্ধু-হিন্দোল" বিস্ময়কর বই, কল্পনার অনায়াস-লীলায়, সুললিত ছন্দের খেলায়, বিচিত্র বর্ণবহুল চিত্রের অজস্রতায় অপরূপ এই কাব্যখানি বাংলা-সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ। আমার মতে "সিন্ধু-হিন্দোল" নজরুল-কাব্য-সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। যাঁরা বলেন, নজরুলের কাব্যধারায় ক্রম-অগ্রসরি গতির আবেগ নেই, সব কাব্য এক টেম্পোতে রচিত ও একই সুর-ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, তাঁদেরকে "সিন্ধু-হিন্দোল" বইখানা পড়তে বলি। এর পাতায় পাতায় পংক্তিতে পংক্তিতে সমুন্নতির (sublimity) সঙ্গে রসতন্ময়তা, ভাবের প্রাচুর্যের সঙ্গে দীপ্ত ঔদ্ধত্যের পরিচয় পেয়ে তাঁদের মন বিস্ময়ে চমকে উঠবে। বইটি খুলেই যখন পড়ি—

: প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,

বহুপাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম—

সে সরাব লোহু।

তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,

ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!

(অ-নামিকা)

তখনই মন বিচিত্র ও নিবিড় উপভোগের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। বইটি এত সুখপাঠ্য যে আরও কয়েকটি উদ্ধৃতি না দিলে মন খুঁতখুঁত করে—

: বল' বন্ধু বল',

ওকি গান? ওকি কাঁদা? ঐ মত্ত জল-ছলছল—

ওকি হুহুঙ্কার?

ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার?

টানিয়া সে মেঘের আড়াল?

সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল?

চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ওকি তব ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ?

দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ওকি রাগ? ওকি অনুরাগ?

(সিন্ধু— প্রথম তরঙ্গ)

: বোঝো নিজভুল

জোয়ারে উচ্ছ্বসি ওঠো, ভেঙে চল কূল

দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়ে বিষাণ,

বল, 'প্রেম করে না দুর্বল ওরে করে মহীয়ান।'

বারুণী-সাকীরে কহ, "আনো সখি সুরার পেয়ালা।"

আনন্দে নাচিয়া ওঠো দুখের নেশায় বীর, ভোল সব জ্বালা!

(সিন্ধু—দ্বিতীয় তরঙ্গ)

: হে বিরাট নাহি তব ক্ষয়

নিত্য সব নব দানে ক্ষয়েরে করেছ তুমি জয়!

(সিন্ধু—তৃতীয় তরঙ্গ)

ঃ হে মহান! হে চির-বিরহী,
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,
সুন্দর আমার!
নমস্কার!
নমস্কার লহ!
তুমি কাঁদ,—আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ।
হে দুস্তর আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার,—নাহি কূল,—শুধু স্বপ্ন, ভুল।
(সিন্ধু—তৃতীয় তরঙ্গ

ঃ চেনার বন্ধু পেলাম নাক জানার অবসর।
গানের পাখী বসেছিলাম দু'দিন শাখার 'পর।
গান ফুরালে যাব যবে
গানের কথাই মনে রবে,
পাখী তখন থাক্‌বে নাক—থাক্‌বে পাখীর স্বর!
উড়্‌ব আমি,—কাঁদবে তুমি ব্যথার বালুচর।
(গোপন-প্রিয়া)

ঃ যা-কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন
যা-কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর—
সে-সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি!—ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা. তিলে তিলে।
তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে!
প্রকাশ গোপন।
(অ-নামিকা)

ঃ কহিবে না কথা তুমি! আজ মনে হয়,
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।
জন্ম যার কামনার বীজে
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে।
(ঐ)

ঃ ফরহাদ শিরী-লায়লি মজনু মগজে করেছে চিড়
মস্তানা শ্যামা দধিয়াল টানে বাবু বেয়ালার মীড় !
আন্‌মনা সাকী ! অম্‌নি আমারো হৃদয়-পেয়ালা কোণে
কলঙ্ক ফুল আন্‌মনে সখি লিখো মুছো খনে খনে !

(চাঁদনী রাতে)

—এগুলি পড়তে পড়তে কত বিচিত্র বর্ণের ও গন্ধের ছবি চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। এখানে যুক্ত হয়েছে কবির নিজস্ব দৃষ্টি ও প্রতিভা—এলিয়ট যাকে Individual talent বলেছেন।

'সিন্ধু' কবিতাসমষ্টি রচনাবৈচিত্র্যে অনিন্দ্য, শব্দের অক্ষর পর্যন্ত বর্ণে ও গন্ধে মুগ্ধ করে। দেহবর্জিত, দেহাতীত প্রেম কবি নজরুলের কাম্য নয়। তাই নারীদেহের সৌন্দর্য কবির কাছে তুচ্ছ তো নয়ই বরং পরম রমণীয়, পরম উপভোগ্য—দেহের মিলন না হলে তো দেহের আকর্ষণ হতে মুক্তি নেই। তাছাড়া যৌবনের প্রথম স্বপ্ন, প্রথম আকাঙ্ক্ষাই তো ভোগের স্বপ্ন, ভোগেব আকাঙ্ক্ষা, জীবন যদি সত্য হয়, যৌবন যদি সত্য হয়, তার ভোগাকাঙ্ক্ষাও সত্য, কামনা-বাসনাও সত্য। 'সিন্ধু', 'অ-নামিকা', 'মাধবী-প্রলাপ', 'গোপন-প্রিয়া' প্রভৃতি কবিতায় এই ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীব্র আস্বাদ মেলে। জীবনকে escape করার কোন অপচেষ্টা তাতে নেই। এসব কবিতা সম্পর্কে নীতি-দুর্নীতি প্রশ্ন নিয়ে নানা আলোচনা এক সময় হয়েছিল, কিন্তু সে আলোচনা সাহিত্য-রসালোচনার বিষয়ীভূত নয়। সাহিত্য রসাভিব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এসব কবিতা যৌবন-প্রেমলীলার রূপ ও রসমাধুর্যে সমৃদ্ধ। তবে তাঁর রসোত্তীর্ণ প্রেমের কবিতা সংখ্যায় খুব বেশী নেই। অন্যান্য কবিতা যদি আরো একটু সংহত, শব্দের ব্যবহার আরো একটু গাঢ় ও ইঙ্গিতময় হতো তাহলে কবিতাগুলো উল্লেখযোগ্য হতে পারতো।

এই বইয়ের 'দারিদ্র্য' এমনি একটি সুন্দর কবিতা যার জুড়ী বাংলা সাহিত্যে খোঁজা মিছে—আপন শাণিত স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। জন্মের প্রথম দিন থেকেই দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে নজরুল জন্মেছেন। জীবনে যাকে প্রচণ্ড সত্যরূপে কবি অহর্নিশ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে সম্মুখে দেখেছেন তারই জ্বালাময়ী মূর্তি এ কবিতায় রূপ পরিগ্রহ লাভ করেছে। দারিদ্র্যের জয়গানে এই কবিতা

আরম্ভ। এই দারিদ্র্য তাঁকে উত্তর-জীবনে করে তুলেছে কবি, তাঁকে দিয়েছে 'অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস', 'উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি'। কবির অম্লান স্বর্গ নীরস হয়ে গেছে, রূপ-রস প্রাণ অকালে শুকিয়ে গেছে। সুন্দরকে তিনি যতবারই গ্রহণ করতে গেছেন ততবারই বুভুক্ষু দারিদ্র্য আগে এসে জুড়ে বসেছে। তাই—

: শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি-বরিষণ।

এই দারুণ বঞ্চনার লাঞ্ছনার পরম দুঃখ-বেদনার ও চরম নৈরাশ্যের কথা এর অধিকাংশ ছত্রে বর্ণিত। Exaltation of poverty কবিতার সুর নয়। 'Sweet are the uses of adversity' বা 'Blessed are the poor' প্রভৃতি স্তোকবাক্যে মানুষের জন্ম থেকেই দারিদ্র্যকে উচ্চে তুলে ধরবার একটা শৌখীনতা চলে আসছে, নজরুলের বিদ্রোহী-আত্মা কখনও এরূপ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা পায় নি। ইংরেজীতে Philosophy of adversity নিয়ে অনেকে অনেক কথা গদ্যে-পদ্যে লিখেছেন। আমাদের বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথও অনেক কবিতা ও প্রবন্ধে দুঃখের মহিমা-কীর্তন করেছেন (যেমন 'দুঃখ', 'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ)। নজরুল এই তত্ত্ব না আওড়িয়ে জীবনকে যে সাদা চোখে দেখেছেন তাকেই ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ করে, শব্দ গ্রহণের অনুপম কৌশলে প্রকাশ করছেন। তাই এ কবিতাটি তাঁর প্রতিভায় শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনী।

"চিত্তনামা" দেশবন্ধু চিত্তর নের জীবন-গাথা। মহাকবি ফেরদৌসীর সু-বিখ্যাত 'শাহনামা' কাব্যের নামের সহিত 'চিত্তনামা'র সাদৃশ্য রয়েছে। নামা' শব্দের অর্থ 'বিবরণ'। "শাহনামা"র অর্থ বাদশাহের জীবনগাথা তেমনি 'চিত্তনামা"র অর্থ চিত্তরঞ্জনের জীবনগাথা। ১৩৩২, ২রা আষাঢ় দেশবন্ধুর দার্জিলিঙে মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে দেশবাসী বিহ্বল হয়ে পড়ে। তখন নজরুল এই 'চিত্তনামা' লেখেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ের করুণ সুরের ঝঙ্কার 'চিত্তনামা"র অনেক স্থলে রয়েছে সত্যি কথা, কিন্তু সব সময়ে তা শোকমূর্ছিত অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেনি। 'সান্ত্বনা' কবিতার মধ্যে কবি শোককাতর বাঙালীকে আশার কথা শুনিয়েছেন—

: কর্মে যদি বিরাম না রয়, শান্তি তবে আস্‌ত না।
ফলবে ফসল—নইলে নিখিল নয়ননীরে ভাস্‌ত না।
নেইক দেহের খোসার মায়া,
বীজ আনে তাই তরুর ছায়া,
আবার যদি না জন্মাত, মৃত্যুতে সে হাস্‌ত না।
আস্‌বে আবার—নৈলে ধরায় এমন ভালো বাস্‌ত না।

শোকসন্তপ্ত হৃদয় মাঝে মাঝে 'সর্বংসহা মৌনা ধরণী মাতা'র কাছে অভিমানের সিন্ধু গর্জন তুলেছে—

: তোর বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত রবে সন্তান ক্ষুধা ?
তোমার মাটির পাত্রে কি গো মা ধরে না অমৃত-সুধা ?
জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃতবারি
অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি।

(ইন্দ্র-পতন)

"চিত্তনামা"র মধ্যে কবির একই কথা বারবার বিবর্তিত হয়েছে কতকটা যেমন paraphrase করার মতো। যেমন—

: হায় চির ভোলা, হিমাচল থেকে অমৃত আনিতে গিয়া
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের মৃত্যু-গরল পিয়া।
কেন অত ভালবেসেছিলে তুমি এই ধরণীর ধূলি ?
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে স্বর্গে লইল তুলি।

এই ক্ষুদ্র কবিতার ভাববস্তুকে কেন্দ্র করেই "ইন্দ্র-পতন" কবিতাটি পরিধি বিস্তার করেছে। তবে 'রাজ-ভিখারী' কবিতাটি "চিত্তনামা"র শ্রেষ্ঠ কবিতা—এর ভাব যেমন ব্যঞ্জনাময়, প্রকাশভঙ্গীও তেমনি নয়নাভিরাম। এর শেষ পংক্তিগুলি কাব্যরসিকদের মনকে বিচলিত করবে—

: 'দেহি ভবতি ভিক্ষাম্' বলি, দাঁড়ালে রাজ-ভিখারী,
খুলিল না দ্বার, পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী !
বলিলে, 'দেবে না ? লহ তবে দান—
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ'—
দিল না ভিক্ষা, নিল নাক দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী !
যে-জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি'।

'ঝিঙে ফুল' শিশুদের জন্যে লেখা, বড়দেরও ভাল লাগার উপাদান এর মধ্যে আছে ; হাল্কা জাতের লেখা হিসেবে অনবদ্য রচনা, দিবা-নিদ্রার পূর্বে পড়বার মতো ঝরঝরে মিষ্টি বই।

কল্পনাশক্তির অজস্রতায়, বর্ণনার তেজস্বিতায়, প্রকাশভঙ্গীর গাঢ়তায় "সিন্ধু-হিন্দোলে" যেমন একটি জমজমাট কবিত্বভাব পাই "জিঞ্জীরে" অতটা নেই। তবে 'অঘ্রাণের সওগাত', 'ঈদ মোবারক', 'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়,' হৃদয়গ্রাহী রচনার আদর্শ হিসেবে আজো সমাদরে গৃহীত হবার যোগ্য। নজরুল ইসলামের ওপর ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যানের প্রভাব সর্বাধিক পড়েছিল। নিপীড়িত জনতার গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্রত যেমন নজরুল গ্রহণ করেছিলেন তেমনি হুইট্ম্যানও। 'অগ্রপথিক' কবিতাটি হুইট্ম্যানের 'Pioneers! O Pioneers!' কবিতার অনুবাদ এবং কবিতাটি যখন প্রথম 'সওগাতে' বেরোয় তখন পাদটীকায় লেখা ছিল "ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যানের 'Pioneers-এর ভাবানুসরণে।" কিন্তু পরবর্তী সংকলনসমূহে এ স্বীকৃতি কেন যে দেখা যায় না আমি জানি না। জীবন যৌবনের আবেগ ও আবেদনে কবিতাটি সার্থক। 'উমর ফারুক', 'খালেদ', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'আমানুল্লাহ' প্রভৃতি কবিতায় নেতৃবর্গের চরিত্র-মাহাত্ম্য বর্ণিত হলেও এগুলি হল ঘুম-ভাঙানো প্রাণ-জাগানোর গান।

সারারাত্রি দুঃস্বপ্নের পর সকালবেলায় বাস্তবের মধ্যে জেগে গাছের পাতায় ভোরের আলো দেখে যেমন স্বস্তি পাওয়া যায় "চক্রবাক' পড়ে সেই রকম একটা খুসি প্রাণের ভেতর জেগে উঠল। যথা: কবিতা পড়ার যে আনন্দ সে-আনন্দের অনুভূতি নাকি দিব্যানুভূতির সগোত্র। এ কাব্যটি হাতে নিয়ে সেই সুদুর্লভ অনুভূতির রোমাঞ্চ পদে পদে অনুভব করলুম। প্রেমের কাব্য হিসেবে এ কাব্য অতুলনীয়—গাঢ়, সংহত ও গভীরতর অনুভূতির কাব্য। যে উচ্ছ্বসিত জীবনানন্দ, যে স্পন্দমান ইন্দ্রিয়চেতনা, "সিন্ধু-হিন্দোলে'র প্রেমের কবিতার বৈশিষ্ট্য "চক্রবাকে" সেই ভোগানন্দ কেমন যেন দৃঢ় ও সংহত হয়ে উঠলেও দুটি কাব্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনস্বীকার্য। এজন্য "চক্রবাক"কে "সিন্ধু-হিন্দোলে"র সহিত একাসনে স্থান দিতে আমার একটুও দ্বিধা নেই।

কাব্য-মহিমার দীপ্তিতে আলোকিত প্রেমের কবিতার দৃষ্টান্ত "চক্রবাকে"

প্রচুর মিলবে যেগুলির স্বাদ-গন্ধ পুরোনো হবার নয়। যেমন, 'তোমারে পড়িছে মনে', 'এ মোর অহঙ্কার', 'গানের আড়ালে', 'চক্রবাক', 'ভীরু', 'নদী-পারের মেয়ে' প্রভৃতি। প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের রূপকথা সৃষ্টি করেছেন, যেমন—'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি,' 'কর্ণফুলী,' 'বর্ষা-বিদায়', 'শীতের সিন্ধু,' 'বাদলরাতের পাখী' কবিতা। রুচি নিখুঁত না থাকায় কাব্যবস্তু কোথাও কোথাও বাক্যবিলাসিতায় (mannerism) অবনত হয়েছে কিন্তু যদি আমরা সত্যি কবিত্বশক্তিকে শ্রদ্ধা করি, যদি কবিতা আমাদের পক্ষে পরিহাসের বিষয় না হয়ে গভীর অনুশীলনের বিষয় হয় তবে একথা আমাদের মানতেই হবে যে এই কাব্যে যেসব ত্রুটি আছে তা গুণের তুলনায় কিছু নয়—অপূর্ব সৃষ্টি চাতুর্য এবং ভাবানুভূতিময় কলা-কৌশল যা ওতে নিহিত আছে তা তুলনারহিত।

"অগ্নি-বীণা", "ভাঙার গান", "বিষের বাঁশী", "ফণি-মনসা", "প্রলয়-শিখা" বইগুলির যা সুর সেই সুর "সন্ধ্যা" ও "চন্দ্রবিন্দু"র মধ্যে আবার নতুন করে ধ্বনিত হল; যাঁর অনুভূতি জীবন-বেদনা থেকে উদ্গত তাঁর পক্ষে তা হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা দেখেছি, "অগ্নি-বীণা" থেকে "চন্দ্রবিন্দু"তে আসতে বেশ কটা বছর কেটে গেছে, তারই মধ্যে "সিন্ধু-হিন্দোল", "চক্রবাক", "বুলবুল", "চোখের চাতক" প্রভৃতির মত প্রেম ও সৌন্দর্য রহস্যময় কাব্য বেরুল অথচ মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ, সর্বহারার আর্তবেদনা তাঁকে এ লোকে বেশীক্ষণ থাকতে দিল না। বিদেশী শাসকের অত্যাচার, ধনীর অমানুষিক শোষণে বিপর্যস্ত মানুষের হাহাকার তাঁকে আবার ক্ষিপ্ত করে তুলল। আবার তিনি সেই অগ্নিজ্বালা লেখনী ধরলেন। ফলে "চন্দ্রবিন্দু" সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হোল। এই যে একাধারে জীবনের চঞ্চলতা, অন্যধারে প্রেমের অধীরতা একদিকে ভোগের সাধনা অপরদিকে জীবনের মহিমা—এসব অসঙ্গতি দেখে-শুনে হয়ত অনেকেই নজরুল-প্রতিভার ত্রুটি বলে ভাববেন কিন্তু বিস্ময়ের কথা এসব অসঙ্গতিই তাঁর কাব্যের প্রাণ। পরস্পরবিরুদ্ধ বৈষম্য থাকলেও তাঁর চিন্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি, কেননা জীবনই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড সত্য এবং সেই সত্যে তাঁর সকল চিন্তা শ্রদ্ধায় অবনমিত।

নিরলঙ্কার বিরল-সৌষ্ঠব কাব্য "সন্ধ্যা"র প্রায় প্রত্যেকটি কবিতা অশান্ত রক্তের উন্মাদ নৃত্য। যৌবনের দুর্দান্ততাকে সজাগ করবার জন্যে যৌবনের মন্ত্রে দেশবাসীকে সঞ্জীবিত করার মন্ত্র "সন্ধ্যা" কাব্যের মূল সুর। এর থেকে

কোন উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। কেননা নজরুলের রুদ্ররূপের বিস্তৃত আলোচনা "অগ্নি-বীণা" প্রভৃতি কাব্যালোচনায় করা হয়েছে।

ইংরেজের সঙ্গে আপোষের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান মিলন অথবা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কোনটাই যে পাওয়া যাবে না এ সম্বন্ধে নজরুলের কবি-মানস ছিল দিবালোকের মত স্পষ্ট। তাই তিনি "চন্দ্রবিন্দু"র কতকগুলি কবিতায় হাসি-ঠাট্টায় ইয়ার্কি বিদ্রূপের সুরে বলেছেন—

: আঁট সাঁট ক'রে গাঁটছড়া বাঁধা হল টিকি আর দাড়িতে,
বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে।
একজন যেতে চাহিবে সুমুখে, অন্যে টানিবে পিছনে,
ফস্‌কা সে গাট হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষণে।
... ...
বদ্‌না গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি রোল উঠিল, 'হা হন্ত'!
উর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গি মাতুল হাসে ছিরকুটি' দন্ত।

(প্যাক্ট)

: সস্তা দরে দস্তা-মোড়া আসচে স্বরাজ বস্তা-পচা,
কেউ বলে না "এই যে লেহি" আসলে "গন্ধ দেহির"র খোঁচা।
গুণীরা খায় বেগুন-পোড়া,
বেগুন চড়ে গাড়ী-ঘোড়া,
ল্যাংড়া হাসে ভেংড়া দেখে ব্যাঙের পিঠে ঠ্যাং থুইযে।

('দে গরুর গা ধুইযে')

: বগল বাজা দুলিয়ে মাজা,
বসে কেন অমনি রে
ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাটি
মা হবেন আজ ডোম্‌নী রে॥
রাজা শুধু রা-ই র'বেন
পগার পারে নির্বাসন,
রাজ্য নেবে দু'ভাই মিলে
দুর্যোধন আর দুঃশাসন!
... ...

বন্দিনী মা ছিলেন আহা,
আজ দিয়েছে মুক্তিরে!
বাজাও ধামা মামার নামে,
রক্ত ঢাল বুক চিরে!
এবার থেকে ধামাধারী
বল-দ দল, ভাব্‌না কি?
দিব্যি খাবে ডুবিয়ে মুলো
পাৎলা নাদায় জাব মাখি॥
হাতীর পিছে নেংচে চলে
ব্যাং-ছা এবং খল্‌সে রে?
দোহাই দাদা চলিস্‌নে আর,
চোখ যে গেল ঝল্‌সে রে!
"মাভৈঃ। এবার স্বাধীন হনু।"
যাই বলেছি, পৃষ্ঠে ঠাস্‌!
পড়ল মনে পীঠস্থান এ
ডোমিনিয়ান্‌ ষ্টেটাস্‌!

(ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস)

"চন্দ্রবিন্দু"র সব কবিতাগুলিই কমিক গান হিসাবে রচিত নয়; বইয়ের প্রথম অংশে কবি-মনের একটি সুন্দর অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এ বইয়ের অনেকগুলি কবিতা সাময়িকতার ওপর ভিত্তি ক'রে রচিত তবু এ বইটি পড়ে আমি বিশেষ খুসি হয়েছি, কেননা ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতে ও ভাষণের মধ্যে মর্মভেদী ও গা-জ্বালানো টিপ্পনী শিল্পিকগুণে আজো উপভোগ্য।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলিকে কিছু চয়ন করে "নতুন চাঁদ" পুস্তকাকারে বেরোয় ১৯৪৫এ, কবি তখন রোগশয্যায়। এই কাব্যে স্বাদের বিচিত্র ভোজের আয়োজন রয়েছে,—সর্বত্র লেগেছে কবির যৌবন-স্বপ্নের স্পর্শ। স্বদেশ ও সাধারণ মানুষের ওপর কবির গভীর অনুরাগ, প্রেম, প্রকৃতি ও শিশুদের সম্বন্ধে হৃদয়বৃত্তির সৌকুমার্য ও কল্পনার অবাধ স্বচ্ছন্দগতি "নতুন চাঁদ"কে এক বিশিষ্ট আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। "ঈদের চাঁদ', 'কৃষকের ঈদ', 'অভয়-সুন্দর',

'দুর্বার যৌবন', 'আজাদ' কবিতায় দেশ ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি কবির যে গভীর দরদ এবং অনন্যসাধারণ ভাবের প্রকাশ পেয়েছে তা বাংলা ভাষায় বিরল। 'নতুন চাঁদে' কবির ভাব ও ভাবনা ব্যক্তিগত আন্তরিকতার স্পর্শে অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করেছে। 'চির-জনমের প্রিয়া', 'নিরুক্ত', 'আর কতদিন' প্রভৃতি কবিতায় প্রিয়াকে না পাওয়ার বিরহের অনন্তবেদনা ধ্বনিত হয়েছে অতি করুণ ও বর্ণাঢ্য ভাষায়। অনেকেই নজরুলের কবিতাকে বলেন নিছক রোমান্টিক। বিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা—এসব জিনিষকে যাঁরা নিছক রোমান্টিক আখ্যায় ভূষিত করেন তাঁদের পক্ষে কোন কবির কাব্য বিচার করা উচিত নয়। আর Romanticism-এর আক্ষরিক ধারণা দিয়ে তাঁরা যদি বিচার করেন তাহলে বলা যেতে পারে নজরুলের Romanticism অতীন্দ্রিয়ের ভাবসাধনা নয়, তাঁর Romanticism ইন্দ্রিয়ের ভোগ সাধনা।

"মরু ভাস্কর" "নতুন চাঁদে"র পর প্রকাশিত হলেও রচনাকালের দিক দিয়ে সেটি বহু আগেকার রচনা। "মরু ভাস্কর" হজরত মোহম্মদের জীবনকাব্য। জীবনী সম্পূর্ণ করার অবসর তিনি পাননি, হজরতের জন্ম, শৈশব লীলা, কৈশোর, বিবাহ পর্যন্ত কাহিনীগুলো কবিতাকারে লেখা হয়েছে। এ বইয়ের মধ্যে প্রশংসা করার মত কোন বস্তু নেই, ছন্দ, বাণী-বিন্যাস ও বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করার মধ্যে শিথিলতা এত রয়েছে যা পড়তে গেলে চোখে ঘুম নামে।

কবির কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে "শেষ-সওগাত" সংকলনটি সম্প্রতি (১৩৬৫) প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনের কবির যা বৈশিষ্ট্য তার সবকটির পরিচয় রয়েছে। ধূলি-ধূসর জীবনের বেদনায় অধীর, কখনো পেশল পৌরুষের হুঙ্কার। কালের প্রতি তার গভীর সত্য প্রীতির উদাহরণ এ কাব্যে প্রচুর মিলবে।

"শেষ সওগাত"-এর পর "ঝড়" নামে এক কাব্যসংকলন বেরিয়েছে (১৩৬৭)। এই কাব্যগুচ্ছের কয়েকটি কবিতা যেমন 'রীফ সর্দার', 'আমানুল্লাহ', 'খালেদ', 'বাংলার আজীজ', 'শরৎচন্দ্র' কবির পূর্ব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। বর্তমান কাব্যগ্রন্থে দুর্মদ যৌবনের জয়গান ঘোষিত হয়েছে। নানা সংস্কারকে পদদলিত করে, অত্যাচার নিপীড়নকে সমূলে ধ্বংস করে নতুন সমাজ গঠনের আহ্বান প্রচারিত হয়েছে।—

এতদিন যে হাজার পাপের বীজ হয়েছে বোনা
আজ তা কাটার এল সময়, এই সে বাণী শোনা।
নতুন যুগের নতুন নকীব, বাজা নতুন বাঁশী,
স্বর্গ-রাণী হবে এবার মাটির মায়ের দাসী।

(জাগরণ)

"রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ", "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" আর 'কাব্যে আমপারা' অনুবাদ গ্রন্থ। এ বইগুলির সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হোল যে এগুলি মূল বইয়ের শুধু হুবহু অনুবাদ নয়, মূল সাহিত্যের রস আত্মস্থ করে কবি সেই রস পুনঃ প্রকাশ করেছেন। অনুবাদ সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা আছে, একটা ভাষা থেকে আরেক ভাষায় ভাষান্তরিত করাই হচ্ছে অনুবাদ। কিন্তু তা নয়। কেন না, সাহিত্য তথ্য-প্রধান নয়, রস-প্রধান। তাই সার্থক অনুবাদ মৌলিক রচনার মতই শ্রদ্ধা পায়। নজরুলের "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ" এমনই একটি সার্থক অনুবাদের বই। পাঠক-সমাজে এ বইটি কেন যে এখনও যথাযোগ্য সমাদর লাভ করেনি জানি না।

"রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ"-এর পরই নজরুল ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ অনুবাদ শুরু করেন। ইতিপূর্বে বাংলাভাষায় ওমর খৈয়ামের রুবাইয়ের অনুবাদগুচ্ছ বেরিয়ে গেছে—কান্তিচন্দ্র ঘোষ, হেমেন্দ্র রায়, নরেন্দ্র দেবের অনুবাদে। কিন্তু এগুলি মূল ফার্সীর মুখ দেখেনি। ইংরেজ কবি ফিটজারাল্ড, হুইনফিল্ড, ট্যালবট, পেইন প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলা করা হয়েছে। অনুবাদগুলি জনপ্রিয় হওয়ায় নজরুল তাঁর অনুবাদ আর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নি। এতদিন পর (১৯৬০) সেটি গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে।

এই অনুবাদটি কবি মূল ফার্সী থেকে করেছিলেন যাতে ইরানের আবহাওয়া যথাযথ রূপ পায়। মূলের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে স্থানে স্থানে অনুবাদের স্বাচ্ছন্দ্যগতি ব্যাহত হয়েছে। অবিকল ভাষান্তর কোন কাব্যেরই করা যায় না, কারণ বিদেশী কাব্যের ছন্দ মিল ইত্যাদি বজায় রাখতে গেলে কাব্যের আসল সৌন্দর্য মাঠে মারা যায়। ফিটজারাল্ড এই অসুবিধে দেখে ভাবানুবাদের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন, এজন্যে তাঁর অনুবাদ নতুন সৃষ্টি হয়েছে। এই ইংরেজী অনুবাদেরই সাবলীল অনুবাদ করেছিলেন কান্তিচন্দ্র ঘোষ যাঁর

অনুবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তর্জমায় তুমি তার লজ্জা ভেঙেচ, তার ঘোমটার ভিতর থেকে হাসি দেখা যাচ্ছে।"

নজরুল ১৯৩টি রুবাই অনুবাদ করেছেন। ফার্সী রুবাইয়ের হুবহু ছন্দ বাংলায় রেখেছেন। ফার্সী রুবাইতে প্রথম দুটি পদের অন্তে মিল থাকে, তৃতীয় পদে গরমিল কিন্তু চতুর্থ পদটি প্রথম ও দ্বিতীয় মিলনান্ত পদেরই অনুবর্তী। যেমন—

ঃ আমার আজের রাতের খোরাক তোর টুক টুক শীরিন ঠোঁট,
গজল শোনাও, শিরাজী দাও, তন্বী সাকী জেগে ওঠ।
লাজ-রাঙা তোর গালের মতো দে গোলাপী রঙ শরাব,
মনে ব্যথার বিনুনী মোর—খোঁপায় যেমন তোর চুনোট।

নজরুলের অনুবাদের মধ্যে মধ্যে সাবলীল গতি ব্যাহত হলেও ফার্সী কবি ওমর খৈয়ামকে চেনা যায়।

এ পর্যন্ত যে ভঙ্গীতে আলোচনা করা হয়েছে তার লক্ষ্য প্রধানতঃ কাব্য-গুচ্ছের ভাববস্তুর মাধ্যমে কবি-মানসের বিচার। এবার কাব্য, ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে গোটাকয়েক কথা বলা যাক। বাংলাভাষা আগে অতি মোলায়েম ছিল, নজরুল তাকে সংগ্রামশীল করে তোলেন। শ্লোগানের ভাষায় যে শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তির উপযুক্ত কথা তিনি বাংলাভাষা থেকেই সৃষ্টি করে জনসাধারণের কণ্ঠে বসিয়েছেন। হয়ত তাতে খাঁটি বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা সর্বদা রক্ষিত হয়নি, কিন্তু তা যে বাংলা কাব্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাব্যসৃষ্টির মধ্যে বহু আরবী, ফারসী শব্দের প্রচলন করে কাব্যলক্ষ্মীকে অপরূপ ঐশ্বর্যসম্ভারে সজ্জিত করেছেন কিন্তু অনেক সময় তাঁর ঐ শব্দগুলোই অনেক কবিতা ও গানের সাবলীল বেগের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করেছে। বহু শব্দ বাঙলার ঐতিহ্যে অপরিচিত থাকায় সেগুলো পড়তে কেমন লেগেছে—পড়ার সময় মনে হয়েছে যেন দাঁতে কাঁকর ঠেকছে। 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম্' (আবির্ভাব) থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করলেই আমার কথা বুঝতে পারা যাবে—

ঃ উব্জ য্যামেন্ নজ্দ হেযাজ্ তাহামা ইরাক্ শাম
মেসের্ ওমান্ তিহারান 'স্মির' কাহার বিরাট নাম
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়্হি সাল্লাম্।"

চলে আঞ্জাম্,
দোলে তাঞ্জাম
খোলে হুর পরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম্।
টলে কাঁখের কলসে কওসর ভর্, হাতে 'আব-জম্-জম-জাম্'
শোন্ দামাম্ কামান্ তামাম্ সামান্
নির্ঘোষি কার নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়্হি সাল্লাম্।"

(বিষের বাঁশী)

উপরের পংক্তির মানে বুঝি না-বুঝি পড়তে গেলেই পড়বার উৎসাহ কেড়ে নেয়। আবার ঐ আরবী ফারসী শব্দের মনোজ্ঞ ও যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগের একাধিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

ঃ আবুবকর উস্মান্ উমর আলী হাযদর
দাঁড়ী যে এই তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী-মুখে সারি গান—লা-শরীক আল্লাহ্!

(খেয়া-পারের তরণী ঃ অগ্নি বীণা)

এ পংক্তির অর্থ যদি কেউ না বুঝেন তাহলেও তিনি এক দমকেই পড়ে যেতে পারবেন। স্থানে স্থানে আরবী-ফারসী শব্দের বহুলতা তাঁর কাব্য-শরীরে সব সময় সুগভীর রস-সঞ্চার করতে পারেনি। তার আসল কারণ হোল যে আরবী-ফারসী ভাষার "প্রাণের" সঙ্গে নজরুলের সত্যিকার চেনা ছিল না—আরবী-ফারসীতে পণ্ডিত হলেই যে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ অন্য ভাষাতেও তিনি করতে পারবেন তা জোর গলায় বলা যায় না। অসামান্য অধ্যবসায়ে তিনি তা আযত্তে এনেছিলেন কিন্তু সবক্ষেত্রে আত্মসাৎ করতে পারেন নি। নজরুলের শব্দ-প্রয়োগ কাব্যধারার গতিতে বাধা-সৃষ্টি মাঝে মাঝে করলেও একদিকে আমরা উপকৃত হয়েছি যে এই আরবী-ফারসী শব্দ মারফৎ মুসলিম ঐতিহ্যের ধারার প্রতি বৃহত্তর দেশের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। মুসলিম ধর্মের অনেক অজানিত ক্রিয়া-কলাপ বাংলা সাহিত্যে রূপায়িত হয়ে সাধারণের গোচরীভূত হয়েছে।

বাংলা-সাহিত্যে নজরুলের ছন্দ সৃষ্টির আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তিনি প্রথমে রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত মুক্ত-স্বরবৃত্ত ছন্দে কবিতা লিখতেন। পরে ঐ ছন্দেই ওজস সৃষ্টি করা চলে তা 'কামাল পাশা' লিখে প্রমাণ করলেন। মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ আবিষ্কার করে 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখলেন। এ ছাড়া প্রাস্বরিক ছন্দে নজরুল আরবীর অনুকরণে কয়েকটি নতুন ধরন ধারণের উদ্ভাবন করেন। যেমন—আরবী 'মোতাকারেব' ছন্দে 'দোদুলদুল' কবিতা রচনা। মিলের ক্ষেত্রেও কবি অনেক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কয়েকটি মিল রীতিমত চমকপ্রদ, যেমন—

ঃ সাবাস ভাই! সাবাস দিই, সাব্বাস তোর সম্‌শেরে!
পাঠিয়ে দিলি দুশ্‌মনে সব যম-ঘর একদম্‌ সেরে।

(কামাল পাশা ঃ অগ্নি-বীণা)

ঃ রুদ্র মাতম্‌ ওঠে দুনিয়া—দামেশকে—
জয়নালে পরালে এ খুনিয়ারা বেশ কে?'

(মোহরম ঃ অগ্নি-বীণা)

ঃ কার বাঁশী বাজিল
নদী-পারে আজি লো?

(দোলন-চাপা)

ঃ ওগো ও চক্রবাকী
তোমারে খুঁজিয়া অন্ধ হ'ল যে চক্রবাকের আঁখি।

(চক্রবাক

ঃ নাই বা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠহার,
তোমায় আমি করব সৃজন এ মোর অহঙ্কার!

(এ মোর অহঙ্কার ঃ চক্রবাক

ঃ নদীর স্রোতে মালার কুসুম ভাসিয়ে দিলাম প্রিয়
আমার তুমি নিলে না মোর ফুলের পূজা নিও।

(বুলবুল ২

: তোমায় আমায় ও প্রেয়সী
মিল খেয়েছে, রাজ-যোটক
আমি যেন খোদা চরণ
তুমি তাহে বিস্ফোটক ॥

(সুর-সাকী)

: স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে, ভাববে কত কি !
মোদের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী !

(গোপন-প্রিয়া : সিন্ধু-হিন্দোল)

নজরুল একাধারে জনপ্রিয় ও প্রতিভাবান কবি। এ ধরণের প্রতিভার যেমন একটা সহজাত সৌভাগ্য আছে তেমনি আছে একটা দুর্ভাগ্যের দিক। প্রচুর হাততালি ও বিপুল জনপ্রিয়তা প্রতিভাবান কবিকে কি ভাবে নষ্ট করে দেয় তার প্রমাণ নজরুল ইসলাম। পটভূমি ও পরিবেশ তাঁকে যেমন বড় করে তুলেছে তেমনি তাঁর দোষ-ত্রুটিকে প্রশ্রয় দিয়ে তাঁর অনেক গুণকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। লর্ড মর্লি বলেছেন,—

"Adjective is the worst enemy of the substantive."

গুণগ্রাহী বন্ধুদের এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তাঁর যুক্তিসহ বিচারবুদ্ধিকে খাটো করে দিয়েছে। চসর, ফাঁসোয়া ভিলঁ কবিদের কবিতার মধ্যে একটা অকুন্ঠিত ঋজুতা পাওয়া যায়, তাঁরা যেমন সর্বদা একটা শ্রোতৃমণ্ডল চোখের সামনে রেখে কবিতা লিখতেন, কবিতাকে বক্তৃতা বা কথকতার কাজে লাগাতে তাঁদের যেমন আনন্দ ছিল তেমনি নজরুলের কবিতার মধ্যে এই বক্তৃতার ঢং ধরা পড়ে। তাই তিনি অবলীলাক্রমে যা লিখেছেন সেটিই যে একেবারে কবিতা হয়ে উঠেছে এমন মনে করা ভুল। রচনাশক্তির প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাতে সে-সুর বাজেনি, যা শিল্পীর আত্মদর্শনের সুর। উৎকৃষ্ট কবিতা হলেই চাই বস্তুজ্ঞান, রূপজ্ঞান, আত্মস্থ হবার সময় ও সাধনা। সাধেই কি বাউল গেয়েছেন, 'ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।' নজরুলের চরিত্রে সবুর বলে জিনিষটা ছিল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আস্ত একটি কবিতা লিখতে পারতেন তিনি ; অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে বসে কোলাহলময় হাটের মাঝখানে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই গান লিখে দিতে পারতেন। এটি তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা সন্দেহ নেই, কিন্তু আবার এরই জন্যে

তাঁর সব কবিতা কৌলিন্যের কোঠায় পৌছায় নি। তিনি যে কবিতা ও গানগুলি বস্তুজ্ঞান, রূপজ্ঞানে, সময় ও সাধনা সহকারে লিখেছেন সেগুলি মহাকালের অনন্ত যাত্রায় উৎরিয়ে যাবার দাবী রাখে।

॥ ৩ ॥

নজরুল জাত গদ্যলেখক ছিলেন না, অধ্যবসায় তাঁকে কিছু গদ্য লিখিয়ে নিয়েছে মাত্র। 'নবযুগ', 'ধূমকেতু' পত্রিকায় যে সব সম্পাদকীয় লিখেছিলেন তারই থেকে কিছু অল্পবিস্তর সংস্কার করে "যুগবাণী", "রুদ্রমঙ্গল", "দুর্দিনের যাত্রী" "ধূমকেতু" গ্রন্থগুলি বেরোয়। ঐ বইগুলিব অগ্নিক্ষরা ভাষা দেশবাসীকে এক উন্মাদনায় মাতিয়ে তুলেছিল। গদ্য রচনায় তাঁর নিজস্ব একটা ষ্টাইল আছে। সেই ষ্টাইলের গতি সচ্ছন্দ ও সাবলীল। কবিতার মত তাঁর গদ্য রচনাতেও কৃত্রিমতার স্থান নেই, আছে একটি স্বচ্ছ প্রবাহ। রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষাকে প্রকাশের সূক্ষ্মতাব দিক দিয়ে, অর্থগৌরবের দিক দিয়ে, ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে, বিন্যাস-মাধুর্যের দিক দিয়ে বাংলা গদ্যে যে যুগান্তর এনেছিলেন তা বাংলা গদ্যের একদিকের বিকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল কিন্তু অপরদিকে ভাষার পৌরুষতার যে দিক রয়েছে তা অবজ্ঞাত রয়ে গেল। সময়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করে নজরুল ভাষার এই পরুষতার ওপর জোর দিলেন বেশী। স্বামী বিবেকানন্দ ভাষার এই বীর্যের দিকটা নি ে নাড়া-চাড়া প্রথম করেছিলেন—তার তেজোদৃপ্ত রচনাভঙ্গীর প্রভাব নজরুলের গদ্যপুস্তকগুলির উপর পড়েছিল একথা অস্বীকার করা চলে না। এ প্রসঙ্গে সখারাম গ শ দেউস্কর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখর রচনাবলীর কথা স্মরণীয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, জ্বলন্ত দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালবাসা থাকার দরুণ তাঁদের রচনার আঙ্গিকগত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও প্রাণস্পর্শী আবেদনে ঐশ্বর্যশালী হয়েছে। নজরুল ছিলেন দেশপ্রেমিক কবি, তাঁর রচনার মধ্যে আঙ্গিক শৈথিল্যের কথা সেদিন বড় হয়ে ওঠেনি। সময়ের প্রয়োজনকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন বলে তাই সেদিন তাঁর গদ্য পুস্তকগুলি অজস্র করতালি লাভ করেছে, আইনের কোপেও পড়েছে। কিন্তু গদ্যে ভাষাটাই সব নয়, বিষয়টার দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন। গদ্য লেখক নজরুলের বিরুদ্ধে আমার সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ যে তিনি প্রবন্ধ লিখতে বসে প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের

দিকেই নজর দিয়েছেন বেশী। তাই সাম্প্রতিক প্রয়োজনের গণ্ডীর বাইরে তাঁর রচনার মূল্য অনেক কমে গেছে সাহিত্য হিসেবে। বস্তুকে অতিক্রম করে যে আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতির স্পর্শে সাহিত্য জন্মায় তা তিনি ধরতে পারেন নি, কেননা উচ্ছ্বাসের আতিশয্য ও ভাষার পরুষতাকেই প্রধানভাবে ধরে 'নবযুগ' 'ধূমকেতু'তে সম্পাদকীয় খাতিরে সাংবাদিকতা করেছেন। কেননা দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দুরবস্থা তাঁর মনকে সকল সময় প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। তাই সাহিত্যের যাঁরা সূক্ষ্ম দিকের রসসন্ধানী পাঠক তাঁদের কাছে এ বইগুলির আবেদন অত্যন্ত কম, পুরোণো খবরের কাগজের মতো বাসি হয়ে গেছে, তবে সমাজতত্ত্ব বা রাজনীতির দিক থেকে তার একটি বিশেষ মূল্য এখনও আছে বলে তাঁর বন্ধুরা দাবী করেন।

অনেকে হয়তো জানেন না যে নজরুল ইসলাম তাঁর লেখক জীবন আরম্ভ করেছিলেন প্রধানতঃ গল্পলেখক হিসেবে। ছোট গল্প ও উপন্যাসে তাঁর হাত খুবই কাঁচা। তাঁর প্রতিভার অভিব্যক্তির উপযুক্ত বাহন কবিতা ও গান— গল্প, উপন্যাস বা নাটক কোনটাই নয়। গল্প-উপন্যাস-নাটকে তাঁর অসংযত মনের পরিচয় দুঃসহভাবে প্রকটিত। বিষয়বস্তুর চেয়ে উচ্ছ্বাসটা বড্ডো বেশী, সময় সময় মনে হয় এগুলি গদ্য ভাষায় কাব্য অথচ ছোট গল্প লিখতে হলে চাই একটি রসঘন নিবিড়তা, অতিমাত্রায় সংযম ও পরিমিতিজ্ঞান, উপন্যাসে চাই বিচিত্র ও জটিল দ্বন্দ্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আর নাটকে চাই একটি সুখদুঃখময় আনন্দ-বেদনায় জীবনের সচল ঘটনাস্রোত। এগুলির মধ্যে কোনটাই সূক্ষ্মভাবে নজরুলের হাত দিয়ে বেরুল না। অতএব নাটক-গল্প-উপন্যাস তাঁর মহৎ প্রতিভার অসাফল্যের স্বীকৃতি, একথা যদি সোজাসুজিভাবে বলি তাহলে নজরুলানুরাগীরা আমার অপরাধ নেবেন না।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ "ব্যথার দান" ও "রিক্তের বেদনে"র অধিকাংশ গল্পগুলি যুদ্ধ-জীবনের পটভূমিতে রচিত। তিনি স্বদেশপ্রেমিক কবি বলে অনিবার্যভাবে এই সব গল্পেও দেশাত্মবোধের স্ফুরণ ঘটেছে। যেমন "ব্যথার দানে"র 'ব্যথার দান', 'রাজবন্দীর চিঠি', "রিক্তের বেদনে"র 'রিক্তের বেদন', 'দুরন্ত পথিক' প্রভৃতি। এগুলি গল্পভঙ্গিহীন বস্তুপুঞ্জ, প্রয়োজনহীন উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত, শিল্প হিসেবে মূল্যহীন। "রিক্তের বেদনের" 'সালেক' গল্পটি আকারের দিক দিয়ে যেমন ছোট, সুর সুষমার দিক দিয়ে তেমনি মধুর। তাঁর

তৃতীয় গল্পগ্রন্থ "শিউলিমালা" উপরি উক্ত বই দুটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি। এখানে তাঁর উচ্ছ্বাসটা কিছু প্রশমিত, আবেগটা একটু সংযত। নিখুঁত গল্পসৃষ্টির সম্ভাব্যতার নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। আজ পরিবর্তিত জীবনে তাঁর গল্পের থিম ও টেকনিক ইতিহাসের সামগ্রী। সাহিত্যের ইতিহাসের শ্রদ্ধাশীল পাঠকের কাছে হয়ত তাঁর গল্পের আদর রয়েছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে আমাদের গল্পচর্চার উদ্‌যাপিত অধ্যায়ের স্মারক হিসেবে সেগুলি পরিগণিত।

নজরুলের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা এক কথায় শেষ করা যেতে পারে। তাঁর উপন্যাসে আবেদনের স্থূলতা—কি চরিত্রসৃষ্টিতে, কি বিন্যাসে আর কি অন্তর রহস্যের উদ্ঘাটনে সর্বত্রই তাঁর হাত খুব মোটা, এগুলি ভাব-সমৃদ্ধিতে দরিদ্র। একমাত্র "মৃত্যুক্ষুধা"তেই বরং কতকটা ভাব-গভীরতার পরিচয় আছে এবং সমস্যাকে বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে বোঝাবার চেষ্টা আছে।

"বাঁধনহারা" পত্রোপন্যাসে মুসলিম সমাজের চিত্র ফুটেছে। উপন্যাসের মধ্যে চরিত্র ও গল্পের মধ্যে কোনটি প্রধান এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সে-প্রশ্ন "বাঁধনহারা" সম্পর্কে না তুলে বলব যে এ উপন্যাসে গল্পাংশও নেই, চরিত্র-চিত্রণেও দৃঢ়তা নেই। শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"র সমসাময়িক উপন্যাস হচ্ছে "কুহেলিকা"। এই উপন্যাসে কবি তথাকথিত হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিকের সহিত মুসলমান যুবকেরও দেশপ্রেমজনিত ত্যাগের মহান আদর্শ উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করেছেন। "মৃত্যুক্ষুধা নজরুলের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি কিছুটা দোষ পরিহার করে এগিয়েছেন; জীবনের ছবি ও চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়েছে। "মৃত্যুক্ষুধা' কৃষ্ণনগরকে পটভূমি করে রচিত। দরিদ্র মুসলিম রাজমিস্ত্রীদের দুঃখের জীবন, খৃষ্টান মিশনারীদের পাল্লায় পড়ে অনেকের ধর্মান্তর গ্রহণ এবং এর ফলে বহু পারিবারিক জীবনে যে-দুঃখ-বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে এই গ্রন্থ সেই করুণ চিত্রের রসঘন রূপায়ণ। গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার কণ্ঠে ভাষা দিতে গিয়ে নজরুল আঞ্চলিকতা বা তৎস্থানিকতা সৃষ্টির প্রয়োজনে গ্রাম্য উপভাষা প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু "মৃত্যুক্ষুধা"য় তাঁর উপভাষা-প্রয়োগ স্বাভাবিক ও স্বত-স্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থে কবির দৃষ্টি অবহেলিত জনসাধারণের জীবনধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সাক্ষাৎ পাই।

নাটক বলতে আমরা সাদাটে কথায় যা বুঝি নজরুলের নাটক ঠিক সে পর্যায়ের নয়। ঘটনা-বিন্যাস বা কার্যকারণসম্ভূত পরিণতির ওপর ভিত্তি করে নাটকের প্রাণ গড়ে ওঠে। সুতরাং পিরাণদোল্লা নাটকের যে-সংজ্ঞা দিয়েছিলেন—'Drama is action. Sir, action, not confounded philosophy.' এ কথার নিরিখে নজরুলের নাটককে নাটকের শ্রেণীতে ফেলতে অনেকেরই আপত্তি হবার কথা। তাঁর সব কয়টি নাটকই রূপক নাটক; তাই দেখি action-এর চেয়ে গীতিধর্মের প্রবলতা বেশী, কাহিনীর চেয়ে মতবাদ বড; একটি তুচ্ছ কাহিনী নিয়ে ঘ্যানর-ঘ্যানর করা, তাকেই ফেনায়িত বাক্যে পল্লবিত করা নজরুল সাহিত্যের প্রধান ত্রুটি।

তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'আলেয়া' নাটকটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের বিষয়বস্তু বা প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে কবি লিখেছেন, "এই ধূলির ধরায় প্রেম ভালোবাসা—আলেয়ার আলো। সিক্ত হৃদয় জলা-ভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হ'তে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিযে পড়ে। তিনটি পুরুষ তিনটি নারী—চিরকালের নব-নারীর প্রতীক—এই আগুনে দগ্ধ হল, তাই নিয়ে এই গীতি-নাট্য।" শিথিল এবং বাকবহুল বর্ণনার আতিশয্য, কাহিনীগত অসংগতি এবং দীর্ঘ অতিশয়োক্তি এই নাটকে থাকায তিনি চরিত্রগুলিকে এমন কি তাঁর নাটকের themeকে পরিষ্কার করে বলতে পারেন নি। "মধুমালা" তিন অঙ্কবিশিষ্ট গীতিনাট্য। সন্দীপের রাজকুমারী মধুমালা ও কাঞ্চননগরের যুবরাজ মদনকুমারের মিলন ও বিরহকে ভিত্তি করে নাটকের পরিধি গড়ে উঠেছে। মধুমালা ও মদনকুমারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ঘুমপরি ও স্বপনপরির সাহায্যেই হয়েছে। কিন্তু এই মিলন-বিরহের মধ্যেই মদনকুমারের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজকুমারী কাঞ্চনমালার বিয়ে হয়ে গেছে। প্রেমের 'Eternal triangle' সূত্রটি প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য অলৌকিক কার্যকলাপের অবতারণা যুক্তিযুক্ত হয়নি। ফলে নাটকের মূলকেন্দ্র বার বার বিচ্যুত হয়েছে, ভাবাবেগের আতিশয্যে ও চরিত্র-চিত্রণের দুর্বলতা নাটককে দৃঢ় করতে পারেনি। 'ঝিলিমিলি' 'সেতুবন্ধ' নাটিকা রবীন্দ্রনাথের যথাক্রমে 'ডাকঘর' ও 'মুক্তধারা' নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয় নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রকৃতির হাতে যন্ত্রশক্তির পরাজয়।

'ভূতের ভয়' নাটিকায় কবি রূপকের সাহায্যে দেশাত্মবোধের কথা প্রচার করে দেশের নির্যাতিত সুপ্ত-শক্তিতে জাগ্রত করেছেন। 'শিল্পী', 'ঝিলিমিলি' নাটিকা ও উপরালোচিত নাটকে নজরুলের জীবনতত্ত্বের প্রকাশের স্বকীয়তা থাকলেও সাহিত্য হিসেবে মূল্য দিতে হৃদয় ময়ূরের মত নেচে ওঠে না। এর কারণ হোল তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতা সত্ত্বেও নজরুল প্রধানতঃ গীতিধর্মী—অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ। তাই নাটক-গল্প-উপন্যাসে তাঁর লেখনী শৈলীর সঙ্গে প্রকাশভঙ্গী অত্যন্ত নীচুশ্রেণীর।

॥ ৪ ॥

বিচিত্র জনকোলাহলের সুর নিয়ে কবিতা লেখার মধ্যেও নিজের অন্তরের আড়ালের মধ্যে ঢুকে পড়ার আশ্চর্য ক্ষমতা নজরুলের ছিল। তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হোল তাঁর গান। যখন তিনি গান রচনায় মনোনিবেশ করেন তখন অনেকেই তাঁর প্রতি বিরূপ হন। কিন্তু কবি-প্রতিভা কোন্ দিক দিয়ে নিজের বিকাশের পথ খুজে পায় তা কে বলতে পারে। তাছাড়া একটি বিশিষ্ট সুরের মধ্যে চিরকাল বিহার করা, কোন নির্দিষ্ট ভাব-উৎস থেকে রস দীর্ঘকাল আহরণ করার মধ্যে সত্যিকারের কবি তৃপ্ত থাকতে পারেন না। তাই কবি-জীবন এক ভাবপর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে, এক অনুভূতির রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়ে বেড়ায়। কবি নজরুলের ভাবজীবন শুধু রণহুঙ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, বাঁশীর সুমোহন সুরও যে তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে। তাঁর কবি-মানস কখনও বিদ্রোহের তূর্যনিনাদের মধ্য দিয়ে, কখনও প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির মধ্য দিয়ে, কখনও বা অধ্যাত্মবোধের অনুপ্রেরণা লাভ করে ভাব হতে ভাবান্তরে, রূপ হতে রূপান্তরে, অবস্থা হতে অবস্থান্তরে নিয়ে চলেছে। এর মধ্যে কোনও একটিকেই কবি কখনও পরম ও চরম অনুভূতি বলে আঁকড়িয়ে থাকেন নি, তাঁর কবি-মানস কোথাও স্থিতিলাভ করেনি, এর প্রত্যেকটি তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশের এক একটি স্তর। এ স্তরগুলির পর্ববিভাগ তৈরী করা মুশকিলের ব্যাপার, কেননা তাঁর মন যখন যা চেয়েছে তিনি তাই লিখেছেন। "অগ্নি-বীণা"র পর "দোলন চাঁপা", "ছায়ানট" তারপরই "ভাঙার গান",

"বিষের-বাঁশী" প্রভৃতি আবার "সিন্ধু-হিন্দোল," "চিত্তনামা"র পরই "সন্ধ্যা", "চন্দ্রবিন্দু"। 'বিদ্রোহী' কবিতায় যা তিনি বলেছিলেন 'আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা' তা তাঁর সাহিত্যিক জীবনেও সত্য হয়েছে। তাঁর সমস্ত স্তরের মধ্যেই যৌবনের উন্মাদনা রয়েছে। তবে তাঁর সাহিত্যের নতুন দিগন্তে আরেক সূর্যোদয়ের লগ্ন যখন প্রত্যাসন্ন হয়েছে তখনি আকস্মিক-ভাবে জীবন-মধ্যাহ্নেই তাঁর প্রতিভাকাশে নেমে এল গাঢ় কৃষ্ণ মেঘের যবনিকা। তাঁর প্রতিভা কোন নির্দিষ্ট স্থানে এসে সমাপ্তি লাভ করত তা অনুমানের উপর নির্ভর করে, কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন না হলেও সবিনয়ে উল্লেখ করতে চাই যে শিল্পীজনোচিত উৎসুক দৃষ্টির ছাপ তাঁর সব রচনায় পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, তাতে আশা করা গেছল ভবিষ্যতে সেই দৃষ্টিতে আনবে একটা পরিণত জীবনের শান্ত গভীর সুষমা।

নজরুলের কবিতা জনপ্রিয়তা আনলেও কবি-প্রতিভার মহত্তম এবং মধুরতম বিকাশ তাঁর গানে। রস ও সুরের যে নানামুখী বৈচিত্র্য দেখা যায়, বাংলা গানের ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। নজরুল নাকি বলতেন, তাঁর কবিতা ও কথা সাহিত্যের কথা লোকে ভুলে যেতে পারে কিন্তু গানে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর কবিতা সাধারণতঃ দীর্ঘ অন্ততঃ তাদের মেজাজ দীর্ঘ হওয়ার দিকে কিন্তু গানে তাঁর প্রতিভা ক্ষুদ্রতর পরিধিতে অত্যন্ত সার্থকভাবেই প্রকাশিত। মহাজীবনকে উপলব্ধি করার যে ব্যাকুলতা তাঁর কাব্যসমূহের মধ্যে দেখেছি তার অনবদ্য প্রকাশ তাঁর "বুলবুল", "পূবের হাওয়া", "চোখের চাতক", "জুলফিকার", "গুলবাগিচা", "সুর-সাকী" প্রভৃতি গানের বইতে। তাঁর গানের একটি অবিসম্বাদিত সম্পদ এই যে, তাঁর রচনায় কাপট্য নেই, ভাববন্ধক দিয়ে হৃদয় বিক্রী করা কিংবা সঙ্গীতের আভিধানিক জ্ঞান এবং ডুরূহগুণখ্যাত তালাভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার চেষ্টা নেই। তাই নিজের প্রাণের গানগুলিতে তিনি প্রাণের সুর বসিয়েছেন। ভারতের সকল সঙ্গীতের ভাবধারা তাঁর সঙ্গীতে স্থান পেয়েছে অথচ সকল প্রভাবকেই কাটিয়ে উঠে নিজের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দরবারী উচ্চ সঙ্গীত, ঠুংরী, ধ্রুপদ, খেয়াল, টৌরি ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে দেশী বাউল, ভাটিয়ালী, সারি, কীর্তন, রামপ্রসাদী সকলরকম সঙ্গীতই তাঁকে প্রেরণা ও উপাদান জুগিয়েছে কিন্তু পুরাতনকে সম্মান দিয়েও পুরাতনের পথচারী তিনি হননি বরং নতুন সৃষ্টির

পথকেই করেছেন প্রসারিত। তাই সমাজের অন্তরে নিবিড়ভাবে আসন পেতে বসেছে তাঁর সঙ্গীত।

গজল গান রচনায় নজরুলের কৃতিত্ব বেশী। কারণ তিনিই বাঙলার মাটিতে গজল গানের সুরকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

প্রেমসঙ্গীত রচনায় কবি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রেমের গানে ওমর খৈয়াম ও হাফেজের প্রভাব দেখি। 'ভালবাসায় বাঁধবো বাসা', দিতে এলে ফুল হে প্রিয়', 'প্রিয়া হবে এসো রাণী', 'শাওন আসিল ফিরে', 'আমায় নহে গো ভালবাস মোর গান', 'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে', 'কুঁচবরণ কন্যা', 'ভুল করে যদি ভালবেসে থাকি', 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে', 'কেন আন ফুলডোর', স্মরণ পারের ওগো' ইত্যাদি গানের রচনা এমন নিখুঁত, ভাষা এত স্নিগ্ধ, ভঙ্গী এত পেলব, বক্তব্য এত গাঢ় এবং ব্যঞ্জনা এত মধুর যে এগুলো বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী হবার সম্পদ।

তাঁর স্বদেশী সঙ্গীতগুলি বাঙালীর অসাড় চিত্তে জাগরণী সঞ্চার করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, সত্যেন দত্তের গান আর কবিতা বাঙালীকে প্রবুদ্ধ করেছিল। কেন জানিনা, পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনে বাঙালী পূর্বের মত ঝাঁপিয়ে পড়েনি, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের রচনাদি জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারল না। প্রয়োজন হল নতুন কবির যিনি নিপীড়িত দেশবাসীর নাড়ীর সঙ্গে যোগস্থাপন করে নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবেন। তখন নজরুলের কবিতা আর গান গেয়েই বাঙালী অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা খাড়া করে প্রতিবাদ জানিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শত অত্যাচার সহ্য করেছে, ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছে। তাই তার তেজোদৃপ্ত স্বদেশ গান আমাদের রাজনৈতিক ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। তাঁর 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'এই শিকল পরা ছল', 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল', 'বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ', 'নাহি ভয় নাহি ভয়', 'চলরে সুমুখে চল্', 'জাগো দুস্তর পথে নবযাত্রী', 'জাতের নামে বজ্জাতি', 'পলাশী হায় পলাশী', 'নমো নমো বাঙলা', 'টলমল টলমল পদভরে বীরদল চলে সমরে', 'চল্‌রে চপল তরুণদল', 'অগ্রপথিক হে সেনাদল', 'আজ ভারতের নবযাত্রী' প্রভৃতি গানে কবির পৌরুষের প্রদীপ্ত হুঙ্কার, প্রশান্তির প্রোজ্জ্বল মহিমা সুস্পষ্ট। তাঁর দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে আমরা দুটি ভাবের

প্রাধান্য দেখি। প্রথমতঃ ভারতের বর্তমান শ্রীহীন দৈন্য তাঁকে পীড়িত করেছে। দ্বিতীয়তঃ বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ইত্যাদি ভেদাভেদ ভুলে ভারতকে স্বাধীন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

রঙ্গ আর ব্যঙ্গের মধ্যে তফাৎ হোল যে রঙ্গ শুধু হাসায় আর ব্যঙ্গ হালকা হাসির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে গভীর কথা। নজরুল একাধারে হাসির নামে শুধু রঙ্গই করেছেন অন্যধারে হাসির আবরণে সমসাময়িককালের ন্যাকামী-গোলামী, গুণ্ডামী-ভণ্ডামী প্রভৃতিকে বিদ্রূপ করেছেন। 'শালানুসন্ধিৎসু', 'তাকিয়া নৃত্য', 'যদি', 'হিতে বিপরীত' প্রভৃতি নিছক হাসির গান আর 'তৌবা', 'প্যাক্ট', 'সদা বিল,' 'লীগ অব-নেশন', 'রাউণ্ড টেবিল-কনফারেন্স,' 'সাইমন কমিশনের রিপোর্ট' প্রভৃতি রঙ্গের মধ্য দিয়ে শাণিত বিদ্রূপ-বাণ বর্ষিত হয়েছে।

ইসলামী সঙ্গীত রচনা করে মুসলমানদের অন্তর জয় করেছেন তিনি। যেমন, 'এলো আবার ঈদ', 'ত্রিভুবনের প্রিয় মহম্মদ', 'মহরমের চাঁদ এল ওই', 'নাম মোহম্মদ বলরে মন', 'চল্ নামাজি চল্', 'মদিনায় ডেকেছে বান', 'বক্ষে আমার কাবার ছবি' প্রভৃতি গান। এই ইসলামী সঙ্গীতের প্রভাব গোলাম মোস্তাফার রচনায় লক্ষ্য করা যায়।

ইসলামী সঙ্গীতের সাথে সাথে তিনি শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করেছেন। কোনো কোনো শ্যামা-সঙ্গীত শব্দ গ্রন্থনের অনুপম কৌশলে উপভোগ্য কবিতা হয়ে উঠেছে। রামপ্রসাদের পরেই শ্যামা-সঙ্গীত রচনায় কবি নজরুলের স্থান। 'ভুল করেছি ওমা শ্যাম', 'দেখে যারে রুদ্রাণী মা', 'শ্যামা নামে তু জপলে', 'শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা', 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়' প্রভৃতি গানের বৈশিষ্ট্য উপেক্ষণীয় নয়।

এই ইসলামী ও শ্যামা-সঙ্গীতের মাঝেই আমরা ভক্ত নজরুলকে সাধক গায়ক কবিকে আবিষ্কার করি। কবির ভক্তি রসাত্মক গানগুলি শুনে মনে হয় তিনি যেন তাঁর অসাধ্য দেবতাকে মূর্ত করে তুলেছেন, তাঁকে সামনে রেখে যেন পরম নির্ভরতার সহিত মনের কথা বলেছেন। অথচ এসব নিছক ব্যক্তিগত কথা নয়—নিখিল ভক্ত হৃদয়ের অভীষ্ট মন্ত্র। নজরুল যাকে বন্দনা করেছেন তিনি শুধু মন্দিরের পাষাণ প্রতিমা কিংবা তথাকথিত নিরাকার খোদাতালা নন, 'অনলে-অনিলে চির নভোনীলে' যেখানে তাঁর দীপ্ত প্রকাশ ব্যক্তি সত্তার বিশ্বমাতার যেখানে মিলন সেই গূঢ় রহস্য তাঁর গানের মধ্যে প্রস্ফুটিত।

শোনা যায়, গান রচনা করেছেন তিনি তিন হাজারেরও অধিক যা একজন কবির পক্ষে এক জীবনে লেখা অসম্ভব। তাঁর এসব গান সম্পূর্ণভাবে এখনো সংগৃহীত হয়নি ; তাঁর সব গান সংগৃহীত করার ভার নজরুলানুরাগীদের নিতে হবে। গানগুলি সংগৃহীত হয়ে যাবার পর আর একটি কাজ করতে হবে। সেটি হচ্ছে নজরুলের কবিতার মতো সব গান সাহিত্য পদবাচ্য নয়, কেননা সচেতন মননশীলতার অভাবের জন্যে কবিতার মতো অনেক গান অনেক স্থলে খোঁড়া হয়ে গেছে, অসংযম ও আতিশয্যের চাপে সূক্ষ্ম পরিমিতবোধের অভাব দেখা গেছে। যে গান ও কবিতাগুলি সুন্দর সেগুলিকে চয়ন করে যদি একখানা বই প্রকাশ করা যায় তাহলে সে-বইয়ের মধ্যে যে-কবিকে আমরা পাব সে-কবির মন হবে সংবেদনশীল রুচি হবে নিখুঁত, সেখানে তিনি নিজ সৃষ্টির আড়ালে প্রাণপুরুষরূপে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন। কালের শাশ্বত মাপকাঠিতে ঐখানেই তাঁর জিত হবে।

শিশু-সাহিত্যে নজরুল

রবীন্দ্র-যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে নজরুল বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী —গানে, গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, এক কথায় সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে তিনি নিজের অলোকসামান্য প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। এখানে শুধু বাংলা শিশু-সাহিত্যে নজরুল-প্রতিভার কি দান, শিশুকে তিনি কিভাবে দেখেছেন এবং তাঁর হৃদয়ের কোন্ স্তরে শিশু স্থান পেয়েছে, শুধু এরই খানিকটা আভাস আমি দিতে চেষ্টা করবো।

শিশু-সাহিত্যে নজরুলের দানের পরিমাণ খুব বেশী না হলেও সাহিত্যের এই বিভাগটিতে তাঁর বৈশিষ্ট্য কম নয়। বইয়ের সংখ্যা গণনায় নজরুলের রচনা একান্তভাবেই নগণ্য, মাত্র তিনখানি আর সাময়িক পত্রিকায় কিছু রচনা ছড়িয়ে আছে, কিছু তাঁর বিভিন্ন কবিতার বই খুঁজলে পাওয়া যাবে। যিনি শিশু-সাহিত্যকে ঐশ্বর্যে ভরে দিতে পারতেন, তাঁর হাত থেকে আমরা পেয়েছি মুষ্টিভিক্ষা। কিন্তু সাহিত্য-কর্মে যে রসের মূল্য সবচেয়ে বেশী তার মাপকাঠিতে তাঁর সে-মুষ্টি স্বর্ণ-মুষ্টি। কারণ, বলতে লজ্জা নেই, ইদানীং যাঁরা শিশু-সাহিত্য সৃষ্টি করছেন, সে-সাহিত্য শিশুদের উপযোগী নয়। চমক-লাগানো প্রচ্ছদপট, উত্তেজনাপূর্ণ অধমজাতের সস্তা ডিটেক্‌টিভ রোমাঞ্চ কাহিনীর বাজে ও সুলভ সংস্করণের প্লাবনে সে-সাহিত্য প্লাবিত; ওতে শিশু-মন সুন্দর ও রুচিপূর্ণভাবে গঠিত হয় না; বরং বলা যায়, নির্মল শিশু-মনগুলোকে নিয়ে তাঁরা ছিনিমিনি খেলছেন। শিশু-সাহিত্যে নজরুলের বৈশিষ্ট্য বোঝবার আগে বাংলা শিশু-সাহিত্যের ইতিহাস একটু জেনে নেওয়া দরকার।

যাদের লক্ষ্য ক'রে দুনিয়া চলবে, তাদের নিয়ে পৃথক্ ক'রে সাহিত্য রচনার প্রয়োজন বাঙালী লেখকরা বিগত শতাব্দীতে অনুভব করেন নি। ছেলেমেয়েদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে সেদিন বুড়োদের সঙ্গে তাদের জুড়ে দেওয়া হয়েছে; গদ্যে-পদ্যে উপদেশপূর্ণ পাঠ্য-পুস্তকে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মনোমোহন বসু, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সেই এক সুর গেয়ে গেছেন।

আনন্দ ও কৌতুকের সাহায্যে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন সেদিন তাঁরা অনুভব করেন নি। কলমের লাঙলে শিশুদের মনের মাটি চষে ভাব ও ভাবনার ফসল উৎপাদন করলেন রবীন্দ্র-যুগের লেখকরা। তাঁরাই উপলব্ধি করলেন, আজকের যারা শিশু, কাল তারাই হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার। তাই স্ফুটোন্মুখ কিশোর, বালক, বালিকা, শিশুদলের জীবনকে গড়ে তোলার জন্য পৃথক সাহিত্যের প্রয়োজন। তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রীতিমত পরিকল্পনা গ্রহণ করে সমাজকে এগোতে হবে, জাতির চলমান ধারাকে সজীব রাখতে হলে এ করা ছাড়া নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এ পথে পূর্ণতর শক্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কবি-গুরুর আগে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুকুমার রায়চৌধুরী এগোলেও তাঁরা অকুলীন বলে ত্যজ্য ছিলেন, কারণ শিশুদের জন্যে তখন যাঁরা লিখতেন তাঁদের প্রতি আমাদের কেমন যেন একটা ঘৃণার ভাব ছিল। যখন রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য কলম ধরলেন তখন আমাদের নাসিকা কুঞ্চনের মনোবৃত্তি কিছুটা হ্রাস পেল। শিশুদের সাহিত্যকে আমরা কৌলিন্যের কোঠায় তুললুম, রবীন্দ্রনাথকে দেখে আমরা শিশু-সাহিত্যিকদের মালা দিয়ে বরণ করে নিলুম। এইভাবে শিশু-হৃদয়ের নিভৃততম কথার অভিব্যক্তি বর্তমান যুগের সাহিত্যের একটা প্রধান লক্ষণ হয়ে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ' প্রভৃতি এই প্রয়াসের নিদর্শন। শিশু চিত্তের নির্লিপ্ততা, অপার রহস্য সঞ্চার, সুদূরের জন্যে তার আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতি এবং রূপকথার সঙ্গে তার সংযোগ রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক মনোবৃত্তিতে স্নেহশীল প্রবীণের চোখ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এই দৃষ্টি থাকার জন্যে আমরা দেখতে পাই যেখানে শিশু সামান্য জিনিষ চাইছে সেখানেও শিশুচিত্ত অসীমের আকাঙ্ক্ষা করেছে। রবীন্দ্রনাথের শিশু-বিষয়ক কবিতাবলী সবগুলি শিশুদের বোধগম্য নয়, যদিও শিশুই সব কবিতার বিষয়—কতকগুলি কবিতা এমন দার্শনিক তত্ত্বে ঠাসা যে, এর অর্থ বুঝতে শিশু কেন, শিশুর ঠাকুরদাকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—

: সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী,

তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দ-স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি'

(জন্মকথা : শিশু

অথবা—

: হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে
যাব মা, তোর বুকে বয়ে,
ধরতে আমায় পারবি নে তো হাতে।
জলের মধ্যে হব মা, ঢেউ
জানতে আমায় পারবে না কেউ,
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে।
...   .
পূজোর কাপড় হাতে করে
মাসি যদি শুধায় তোরে,
"খোকা তোমার কোথায় গেল চলে।
বলিস—খোকা সেকি হারায়,
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।

(বিদায় : শিশু)

কিংবা—

: বৃষ্টি কোথায় লুকিয়ে বেড়ায়
উড়ো মেঘের দল হয়ে,
সেই দেখা দেয় আর-এক ধারায়
শ্রাবণ-ধারার জল হয়ে।
আমি ভাবি চুপটি করে
মোর দশা হয় ঐ যদি
কেই বা জানে আমি-ই আবার
আর-একজনও হই যদি।
...   .

আমার ভিতর লুকিয়ে আছে
দুই রকমের দুই খেলা,
একটা সে ঐ আকাশ-ওড়া,
আরেকটা এই ভুই-খেলা।

(দুই আমি : শিশু-ভোলানাথ)

এ সব কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব, পরিণত মনের চিন্তা উপলব্ধির ছাপ হৃদয়ঙ্গম করা অপরিণত-দৃষ্টি ছেলেমেয়ের নাগালের বাহিরে। যেখানে কবি শিশুদের আনন্দ দেবার জন্যে যেমন 'রবিবার', 'তালগাছ', 'মুর্খু', 'নদী' 'কাগজের নৌকা', 'বীরপুরুষ', 'খোকার বনবাস', "ছড়ার ছবি"র কতকগুলো কবিতা "খাপছাড়া"র অনেক ছড়া, "সে" বইয়ের 'গেছো বাবার কাহিনী', "হাঁচিয়ান্দিনী কুকস্থুনা"র গল্প ইত্যাদি লিখেছেন, সেখানে শিশুরা অপ্রবুদ্ধভাবে কতকটা আনন্দ উপভোগ করে আর যেখানে কবি নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন, যার আবেদন উঁচু গ্রামে বাঁধা, সেখানে শিশুর মন সাড়া দেয় না। তাই রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্যকে ঠিক শিশুদের সাহিত্য বলা চলে না। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ শিশুদের সহজ কথায় ভোলাতে চেয়েছেন, শিশুদের প্রতি তাঁর সত্যিকারের দরদ ছিল, কিন্তু প্রতিভার প্রজ্ঞাশীলতার জন্যে তিনি তা সব সময় পারেননি। তাঁর অজান্তেই তাঁর শিশু-সাহিত্য বড়দের সাহিত্য হয়ে পড়েছে। এতে রবীন্দ্রনাথের দোষ নেই, যদি কেউ ধরেন তাহলে তাঁর প্রতিভার প্রতি তিনি অবিচারই করবেন।

নজরুল রবীন্দ্রনাথের মত তত্ত্বের গহন অরণ্যে প্রবেশ করে শিশুতত্ত্ব আবিষ্কার করেননি। সাদা কথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের শিশু যেমন রবীন্দ্রনাথ নিজেই, তেমনি নজরুলের শিশু নজরুল নিজেই। রবীন্দ্রনাথ যাকে স্নেহশীল প্রবীণের চোখ দিয়ে দেখেছেন, তাকে রূপায়িত করেছেন প্রবীণদের উপভোগ্য করেই। আর নজরুল শিশুর রকমারী কল্পনা, অবুঝ অনুভূতিগুলিকে স্বাভাবিকভাবে পরিবেশন করেছেন, যেগুলি শিশুদের বোধগম্য অথচ বয়স্ক পাঠকরা পড়ে কবির উচ্ছল যৌবন-ধারার পরিচয় পান। নজরুল আগাগোড়া চড়া গলার কবি বলেই শিশুদের কবিতার মধ্যেও তাঁর যৌবনের অস্থির মনোবৃত্তি অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ; তাই তাঁর শিশুবিষয়ক রচনাগুলি বড়দেরও আনন্দ দেয়। তাছাড়া 'সে', 'মুকুট', 'ছড়ার ছবি,' 'খাপছাড়া', 'গল্পসল্প',

'ছেলেবেলা' সবই রবীন্দ্রনাথের পরিণত বার্ধক্যের সময় রচিত। এগুলিতে প্রায় সর্বত্র তরল শব্দের আশ্রয় নিয়েও তিনি পরিণত মনের গভীরতা ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। আর নজরুলের শিশু-সাহিত্য সেই সময়কার রচনা—যে সময় নজরুল-প্রতিভা অন্তর্মুখী হয়নি; তাই সেই সময়কার রচনায় শিশু-মনের চঞ্চলতা, তরুণ মনের উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে—যা শিশুদের মন সহজেই জয় করে নিতে পারে। তিনি রচনার মধ্যে বয়সকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন—এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

শিশুকে কেন্দ্র করে নজরুল যত কবিতা লিখেছেন তাদের উৎস হচ্ছে শিশুর প্রতি তাঁর হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা। শিশু সম্বন্ধে প্রত্যেকটি কথা যেন গভীর অনুরাগে রঞ্জিত, যেন শিশুর প্রাণের সঙ্গে তাঁর আজন্ম নাড়ীর সম্বন্ধ। এর কারণ খুঁজে দেখলে দেখা যাবে যে, তিনি শিশুর মত উলঙ্গ ও মুক্ত প্রাণ নিয়েই শিশুর প্রাণে প্রবেশ করেছেন। প্রাণখোলা আলাপ আলোচনায়, শিশুর সারল্য তিনি ছোট বড় নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিশেছেন, নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখবার চেষ্টা করেননি কখনও, সৃষ্টির আভিজাত্য সম্বন্ধে তিনি মোটেই সচেতন ছিলেন না, কোন কূটবুদ্ধি তাঁকে কখনও আশ্রয় করেনি। তাঁর শিশু-সাহিত্য পড়ে আমার এই কথাই মনে হয় যে তাঁর মানসিক পরিবেশে একটি সরল নিরভিমান সন্তান শিশু ছিল বলেই শিশুর সরল সহজ মনের সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন তিনি। বড়দের জন্যে নজরুল যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাতে যেমন অনেক ছেলেখেলার রূপ আছে, বিদ্রোহী জীবন-দর্শনের পরিচয় আছে, তেমনি শিশুদের রচনার মধ্যেও তাঁর সেই বিভিন্ন রূপের প্রকাশ দেখতে পাই। অথচ আশ্চর্যের কথা, বড় ও ছোটদের মধ্যে কোথাও গোঁজামিলের চেষ্টা করেননি। বড়দের জন্যে তিনি বড়দের উপযোগী করে লিখেছেন, আবার শিশুদের জন্যে শিশুদের উপযোগী করে লিখেছেন, তার সুর যেমন মধুর তেমনি মোলায়েম, কোথাও কোন খোঁচ নেই, শিশুর রসবোধ যাতে ব্যাহত হবে। বাংলা শিশু-সাহিত্যে নজরুলের বৈশিষ্ট্য ওইখানেই।

এইটুকুই তাঁর প্রতিভার সমগ্র পরিচয় নয়, শিশু-সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে দু'টো মত দেখা দিয়েছে। একদল বলছেন, শিশু-মনের কাঁচা মাটি অতি সহজেই রূপ গ্রহণ করে বলে তাদের জন্যে কোন পেটেণ্ট ছাঁচ পরিবেশনের বিপদ অনেক, তাই ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনায় কোন বিশিষ্ট আদর্শের

সন্ধান, কোন বাঁধা ধরা পথ দেখিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এইজন্য শিশু-সাহিত্যে কল্পনাকে মুক্ত পক্ষে আকাশবিহারের সুযোগ দিতে হবে, কারণ কল্পনা-শক্তির বিকাশ মনের বিকাশের সবচেয়ে বেশি সহায়ক। এ মতের বিরোধিতা করে আর একদল বলছেন, আজকের দিনে রূঢ় বাস্তবের আঘাতে জর্জরিত সমাজে আর নিছক কল্পনার মানস-বিলাস সঙ্গতও নয় সম্ভবও নয়, বাস্তব জীবনের কঠিন সংঘাতে নীল পাখীর স্বপ্ন দেখা পরিহাসেরই নামান্তর। কি কারণে সমাজ আজ ভাঙনের মুখে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন পায়ের ওপর পা দিয়ে জীবন কাটাবে আর অধিকাংশ ডাষ্টবিনে ধুকে-ধুকে মরবে, মষ্টিমেযর কপালে সুখ, অধিকাংশের কপালে দুঃখ—ভগবানের রাজ্যে এ বিভেদ কেন, জীবনের দুঃখ, দুঃখের মূল ও দুঃখের প্রতিকার—এই সবই তাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিযে দিতে হবে, সোজাসুজিভাবে চিনিয়ে দিতে হবে প্রকৃত কল্যাণের পথ। ছেলেবেলা থেকে সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে কল্যাণের পথে তারা ছুটবে, মন উদ্‌বুদ্ধ হবে কল্যাণের আদর্শে। নজরুলেব শিশু-বিষয়ক রচনাবলীতে এই দুই মতেরই সামঞ্জস্য দেখতে পাওযা যায়। একদিকে যেমন কল্পনাকে শিশুমনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে মনে করেছেন, আবার অন্যদিকে আনন্দ দেবার নামে অবাস্তর উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় না নিযে সব সময়েই বাস্তবের রকমারি ভালো-মন্দ ফসল কুড়িয়ে ছেলেমেযেদের জীবনকে বৃহত্তর কিছুর দিকে এগিযে দিয়েছেন, তাদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, সত্যকে উপলব্ধি করাব ইঙ্গিত দিয়েছেন, আর উদারতা, সাহস এবং সহজ অথচ বলিষ্ঠ জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করেছেন। বড়দের সাহিত্যের মত শিশু-সাহিত্যেও এই ধরণের ওজোগুণসম্পন্ন কবিতার ভিৎ-পত্তন করেন নজরুল। বাংলা কাহিনী কাব্যেব ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও পথের ইঙ্গিতও রযেছে এ সব কবিতার মধ্যে। বর্তমান বযস্কদের মত শিশু-সাহিত্যের মধ্যে সমাজের ক্লেদ মালিন্য প্রভৃতি চোখে আঙুল দিযে দেখিযে শিশু-মনকে উদ্‌বুদ্ধ করাব যে প্রয়াস চলেছে তাব থেকেই বোঝা যায, নজরুলের লেখার প্রভাব আমাদের শিশু-সাহিত্যের ওপর কতটা পড়েছিল।

ছেলেমেয়েদের অভিনযোপযোগী 'পুতুলের বিযে' নামক নাটিকায় কমলির চীনে-পুতুল ডালিমকুমারের সঙ্গে টলির মেমপুতুল ও বেগমের জাপানী পুতুলের বিবাহ ব্যাপারটিকে নানা ঘটনার সমাবেশে এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেটি শিশুদের কল্পনা শক্তির স্ফূর্তি ও পূর্তি ঘটাবার পক্ষে সহায়ক। যতটা সম্ভব

নিছক কল্পনাকে বাদ দিয়ে বাস্তব ঘটনাকে বজায় রাখা যায় নজরুল সর্বত্র তারই চেষ্টা করেছেন। এই নাটিকায় 'নামতা পাঠ' কবিতাটি ছোটবেলায় ছেলেদের নামতা পাঠে ভুল হলে অভিভাবকরা মার-ধোর করেন। এর থেকে শিশুর মনে জেগেছে—

: আমি যদি বাবা হতাম, বাবা হতো খোকা,
না হ'লে তার নামতা পড়া মারতাম্ মাথায় টোকা।
রোজ যদি হ'ত রবিবার
কি মজাটাই হ'ত না আমার
থাকত না আর নামতা পড়া লেখা আঁকা-জোঁকা
আমি যদি বাবা হতাম, বাবা হ'ত খোকা।

নজরুল শিশু-মনের অন্তরতম অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে তার বিচিত্র প্রবৃত্তিকে বিচিত্র রূপ দিয়েছেন। 'সাত ভাই চম্পা' কবিতাগুচ্ছ এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রথম ভাই মাকে সম্বোধন করে বলছে—

: আমি হব সকাল-বেলার পাখী,
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠব আমি ডাকি'।
সূয্যি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
"হয়নি সকাল, ঘুমো এখন"—মা বলবেন রেগে।
বলব আমি, "আলসে মেয়ে, ঘুমিয়ে তুমি থাকো,
হয়নি সকাল—তাই ব'লে কি সকাল হবে নাকো?
আমরা যদি না জাগি মা, কেম্‌নে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠলে গো মা, রাত পোহাবে তবে।'

...   .

ফুলের বনে ফুল ফোটাব, অন্ধকারে আলো,
সূয্যি মামা বলবে উঠে, "খোকন ছিলে ভালো?"
বলব "মামা, কথা কওয়ার সময় নাইক আর,
তোমার আলোর রথ চালিয়ে ভাঙ ঘুমের দ্বার।"
রবির আগে চলব আমি ঘুম-ভাঙা গান গেয়ে,
জাগ্‌বে সাগর, পাহাড় নদী, ঘুমের ছেলে-মেয়ে।

চতুর্থ ভাইয়ের সঙ্কল্প হচ্ছে—

ঃ আমি সাগর পাড়ি দেব, হব সওদাগর,
সাত সাগরে ভাস্‌বে আমার সপ্ত মধুকর।
চারপাশে মোর গাং-চিলেরা করবে এসে ভিড়
হাতছানিতে ডাক্‌বে আমায় নতুন দেশের তীর

আর একটি ভাই বলছে—

ঃ আমি হব দিনের সহচর—
বল্‌ব, "ওরে, রোদ উঠেছে, লাঙল কাঁধে কর।
খামার ভ'রে রাখব ফসল, গোলায় ভ'রে ধান,
ক্ষুধায় কাতর ভাইগুলিকে আমি দেবো প্রাণ।
এই পুরাতন পৃথিবীকে রাখব চির-তাজা.
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটির রাজা॥

'ঝিঙে ফুলে'র বর্ণনা রসসিঞ্চনে মনোরম—

ঃ গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল—
ঝিঙে ফুল॥

... ...

পউষের বেলা শেষ
পরি জাফ্‌রাণী বেশ
মরা মাচানের দেশ
ক'রে তোল মশ্‌গুল—
ঝিঙে ফুল॥

... ...

তুমি বল—'আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মায়,
চাই না এ অলকায়—
ভাল এই পথ-ভুল।
ঝিঙে ফুল॥

(ঝিঙে ফুল : ঝিঙে ফুল)

সাধ্য কি যে শিশু পাঠক, এর ভাষা ও ছন্দের মোহ থেকে তার মনকে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

'প্রভাতী' কবিতায় প্রভাতের কী সাবলীল শাশ্বত বর্ণনা—যা ছেলেদের মনকে সহজেই স্পর্শ করে—

ঃ রবি মামা দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ
দারোয়ান গান গায়
শোনো ঐ, "রামা হৈ।"
ত্যজি নীড় ক'রে ভীড়
ওড়ে পাখি আকাশে,
এন্তার গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে
চুলবুল বুলবুল
শিস দেয় পুষ্পে,
এইবার এইবার
খুকুমণি উঠবে।

(ঝিঙে ফুল)

এখানে কবির ভাষা যেন ভোরবেলার ফুলের মত সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে। ছোটদের মধ্যে কে আগে উঠেছে এ নিয়ে প্রায়ই নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলে, সে কথাও কবি বিস্মৃত হননি—

ঃ উঠল ছুটল
ঐ খোকাখুকি সব,
"উঠেছে আগে কে"
ঐ শোনো কলরব।

(ঐ)

শিশু হচ্ছে ভগবানের পবিত্রতম সৃষ্টি। মানুষের দৈনন্দিন জীবন ওর আগমনে হয়ে ওঠে মুখরিত, তার প্রাণেও এনে দেয় স্বচ্ছতা অনাবিলতা; তাই সংসারে নতুন শিশুর আবির্ভাব চিরকালই বহন করে আনে নতুনতর

আনন্দ—'শিশু যাদুকর' কবিতায় এই কথাই সুন্দরভাবে ঘোষণা করা হয়েছে—

ঃ কোন্ রূপলোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই।
... ...
ছোট তোর মুঠি ভরি আনিলি মণি,
সোনার জিয়ন কাঠি, মায়ার ননী।
তোর সাথে ঘর ভরে এল ফাল্গুন,
সব হেসে খুন হোল কি জানিস্ গুণ।

(ঝিঙে ফুল)

'মা', 'লিচু চোর', 'খুকী ও কাঠবেড়ালী' প্রভৃতি সুন্দর কবিতা কে না পড়েছে, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদেরই হয়ত্ মুখস্থ আছে। শিশুদের নিয়ে কবিতার মধ্যে তিনি খেলিয়েছেন, হাসিয়েছেন। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে তারই পরিচয় পাওয়া যাবে—

ঃ অ-মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা—নাক ডেঙাডেং ড্যাং।
... ...
দাদু বুঝি চীনাম্যান মা, নাম বুঝি চাংচু?
তাই বুঝি ওঁর মুখটা অমন চ্যাপ্টা সুধাংশু।
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন।
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং।

(খাঁদু দাদু ঃ ঝিঙে ফুল)

ঃ সাত লাঠিতে ফড়িং মারেন এমনি পালোয়ান;
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লে সেদিন মস্ত আলোয়ান!

(খোকার বুদ্ধি)

একদিন রাজা—
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড় ভাজা।

রাণী গেলেন তুল্‌তে কল্‌মী শাক্
বাজিয়ে বগল টাকডুমাডুম টাক্
রাজা মশাই ফিরে এলেন ঘুরে
হাতীর মতন একটা বেড়াল বাচ্চা শিকার ক'রে।

(খোকার গল্প বলা : সঞ্চয়ন)

: দিইনি চিঠি আগে
তাইতে কি বোন্ রাগে ?
হচ্ছে যে তোর কষ্ট
বুঝ্‌তেছি খুব পষ্ট।
তাই তো সত্ত সত্ত
লিখতেছি এই পত্ত।
পেয়েছি তোমার পত্র,
যদিও তিন ছত্র,
যদিও তার অক্ষর
হাত পা যেন যক্ষর
পেট্‌টা কারুর চিপসে
পিঠটা কারুর ঢিপসে
এক একটা যা বানান
হাঁ করে কি জানান।

... ...

মা মাসীমায় পেন্নাম
এখান হতেই করলাম।
স্নেহাশিস এক বস্তা,
পাঠাই, তোরা লস তা
সাঙ্গ পত্ত সবিটা
ইতি। তোদের কবি-দা।

(চিঠি : ঝড়)

ঃ ঘুম পাড়ানী মাসী পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভ'রে পান দেবো গাল ভ'রে খেয়ো
ঘুম আয়রে, ঘুম আয় ঘুম।

ঘুম আয়রে, দুষ্টু খোকায় ছুঁয়ে যা
চোখের পাতা লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে যা।
ঘুম আয়রে, ঘুম আয় ঘুম।

(ঘুম পাড়ানি গান ঃ সঞ্চয়ন)

এই গেল তাঁর শিশু-প্রীতির এক রূপ। আর এক রূপ আছে—সাদা চোখ দিয়ে মাটির পৃথিবীকে দেখানোর রূপ। কিশোর মনের মধ্যে থেকে কবি গেয়ে উঠলেন—

ঃ থাক্‌ব না'ক বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে।
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে বীর লাখে লাখে
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।

(দেখব এবার জগৎটাকে)

কিশোরদের মাঝেই শিশু-মন-জয়ী নজরুল দেখতে পেয়েছেন নতুন দিনের সোনালী সূর্য। এরাই সকল অনাচার-অবিচার পদদলিত করে সত্যিকারের আদর্শবাদী কর্মী হয়ে দেশ ও দশের প্রভূত কল্যাণসাধন করবে। আগামীকালের সমাজ ও রাষ্ট্রের রঙ্গমঞ্চে আজকের যুব-সম্প্রদায় ও প্রবীণ দলের ভূমিকা তারাই অভিনয় করবে। এরা নিজেকে যতটা ছোট্ট মনে করে, সত্যি এরা তত ছোট নয ; এদেরই মধ্য থেকে লোকপাবন বুদ্ধ, মানবহিতৈষী অশোক, আকবর, বিপ্লবী লেনিন, কামাল, সুভাষ প্রভৃতি মনীষীরা বেরুতে পাবেন। কবি তাই কিশোরদের প্রথম থেকেই উদ্বুদ্ধ করে তুলছেন এক মহান প্রেরণায়। এরা বয়সে ছোট বলে নিশ্চেষ্টভাবে প্রথম থেকেই যেন বসে না পড়ে, তাদেরকে জীবনে বড় হতে হবে, বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে হবে, মন দৃঢ় রাখতে হবে ; তাই কবির সেই জোরালো ডাক, বিরাটের

জয় হোক, মুছে যাক সকল বিভেদ, নিঃশেষ হয়ে যাক নিজেকে ছোট ভাবার সকল চিন্তা—

: তোমরা ভাবিছ, আমরা বালক অথবা বালিকা কেহ,
আমি বলি—কেহ দেখনি আজিও তোমরা নিজের দেহ।
তোমাদের মন-মায়া-দর্পণে দেখ যদি নিজ কায়া,
দেখিবে তোমারই ঐ দেহে আছে সারা বিশ্বের ছায়া।
তুমি ছোট নহ, ঐ সে ক্ষুদ্র দেহখানি তুমি নও,
নিজেরে দেখিলে—দেখিবে, তুমিই বিপুল বিরাট হও।
... ...
তুমিই সবশক্তি লভিয়া পূর্ণ হইতে পারো,
"আমি ছোট" এই ভাবো নিশিদিন, তাই সব কাজে হারো।
দারোগা কেরাণী হবার ক্ষুদ্র সাধনা তোমার নহে,
তুমি অমৃতের পুত্র অজেয়, নিজে ভগবান্ কহে।
বল ভগবানে, তুমি হতে চাও সর্ব-শক্তিমান্,
তুমি অনন্ত যশঃ খ্যাতি চাহ, চাহ অনন্ত প্রাণ।

(মায়া মুকুর : সঞ্চয়ন

কর্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে সঁপে দেবার জন্যে কবি আজ ব্যাকুল হয়েছেন, জীবন-প্রান্তে শ্রান্ত মন, ক্লান্ত দেহ—

: মোরা ফোটা ফুল, তোমরা মুকুল এস গুল্-মজলিসে
ঝরিবার আগে হেসে চ'লে যাব—তোমাদের সাথে মিশে।
মোরা কীটে খাওয়া ফুলদল, তবু সাধ ছিল মনে কত—
সাজাইতে ঐ মাটির দুনিয়া ফিরদৌসীর মত।
আমাদের সেই অপূর্ণ সাধ কিশোর-কিশোরী মিলে
পূর্ণ করিও, বেহেশত্ এনো দুনিয়ার মহ্‌ফিলে (

(মোবারকবাদ : নতুন চাঁদ)

এমনি করেই প্রবীণ নবীনকে জায়গা ছেড়ে দেয়। শক্তির শেষ সীমায় এসে পেছনের লাভ-ক্ষতির হিসেব করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে প্রবীণ—

: ভায়ে ভায়ে হানাহানি করিয়াছি, করিনি কিছুই ত্যাগ,
জীবনে মোদের জাগেনি কখনো বৃহতের অনুরাগ।

শহীদি দর্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি
চেয়েছি গোলামী, জাবর কেটেছি গোলাম-খানায় বসি।

(মোবারকবাদ : নতুন চাঁদ)

তাই এই গোলামীর অভিশাপ নবীনকে যেন অভিশপ্ত করে তুলতে না পারে—

: তোমরা মুকুল, এই প্রার্থনা কর ফুটিবার আগে,
তোমাদের গায়ে যেন গোলামের ছোঁওয়া জীবনে না লাগে।

(ঐ)

গোলামী থেকে মুক্ত হবার জন্যে মুকুলেরা প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত না হয়—

: গোলামীর চেয়ে শহীদি দর্জা অনেক ঊর্ধ্বে, জেনো :
চাপরাশির ঐ তক্‌মার চেয়ে তলোয়ার বড় মেনো।

(ঐ)

যারা গোলামীর কাছে মাথা নত করবে সে-কিশোরদের ওপর কবির আস্থা নেই, তাদের ওপর যদি কাজের ভার দেওয়া হয় তাহলে—

: গোলামের ফুল-দানীতে যদি এ মুকুলের ঠাঁই হয়,
আল্লাব কৃপা বঞ্চিত হব, পাব মোরা পরাজয়।
... ...
শুধু আশের আতর দানীতে যাহাদের হয় ঠাঁই,
তোমাদের মহ্‌ফিলে আমি সেই মুকুলেবে চাই।
সেই মুকুলেরা এস মহ্‌ফিলে, বসাও ফুলের হাট,
এই বা গায় তোমরা আনিও মক্তিব আরফাত।

(ঐ)

বাংলার ভবিষ্যৎ বাংলার এই কিশোরেরা। কবি উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছেন তাদের নব শক্তিকে, তাদের ললাটে গৌরবের জয়টীকা পরিয়ে বলছেন—

: ভাঙো ভাঙো এই ক্ষুদ্র গণ্ডী, এই অজ্ঞান ভোলো'
তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাঁহারে জাগায়ে তোলো।
তুমি নহ শিশু দুর্বল তুমি মহতো মহীয়ান্
জাগো দুর্বার, বিপুল, বিরাট্, অমৃতের সন্তান।

(মায়া-মুকুর : সঞ্চয়ন)

নজরুল-শিশু-সাহিত্যের এই হচ্ছে প্রধান বাণী। এই বাণীর আবর্তনেই তাঁর শিশু-সাহিত্যের কেন্দ্রিত বস্তু আবর্তিত।

নজরুল-সাহিত্যে নারী

যুগের পর যুগ ধরে তথাকথিত ধর্ম ও নীতির আবরণে সমাজের বুকের ওপর দিয়ে যে দুর্নীতির প্লাবন বয়েছে তার হিসেব-নিকেশ করলে দেখা যাবে নারীর উপরই বেশী অবিচার করা হয়েছে। চিরকালই পুরুষ নারীকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। মুখে আমরা অনেক কেতাবের বুলি আওড়িয়েছি কিন্তু কাজে-কর্মে আমরা চিরকাল প্রভুত্বপ্রিয়তাই প্রকাশ করে এসেছি। ভোগের উপাচার হিসেবে দেখে নিজের জীবন চরিতার্থ করেও 'নরকের দ্বার' বলে নির্দেশ করেছি, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই ছিল সামাজিক প্রয়োজনে সাধারণ নারীর একমাত্র কাজ—এই দৃষ্টিতেই তার চলাফেরার স্বাধীনতা, বেঁচে থাকার অধিকার ইত্যাদি মেপে দেয়া হয়েছে। শত-শতাব্দীর অভিশপ্ত সমাজের এই নির্মম অমানুষিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন নরওয়ের ইবসেন, আমাদের দেশে দাঁড়িয়েছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। প্রধানতঃ এঁদেরই চেষ্টায় নারীজাতির সম্বন্ধে পুরুষের মনোভাব পরিবর্তনের লক্ষণও ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে আমরা দেখেছি যেখানে নারীর বাস্তবদিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেখানে নারীকে মানবীরূপে চিত্রিত না করে প্রধানতঃ করা হয়েছে দেবীরূপে, ধর্মের আবরণটি বজায় রাখা হয়েছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে কিংবা রূপকথার কাহিনীতে যে রিয়ালিজম্ রয়েছে তা 'পারভার্টেড রিয়ালিজম্'। পুরুষের মত নারীরও যে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তারও যে স্বাধীনতা অধিকার ইত্যাদি থাকতে পারে এ সবের ধার পাশ দিয়ে প্রাচীন সাহিত্যিকরা যান নি। নারীর লাঞ্ছনা তাঁরা নীরব সাক্ষীরূপে দেখেছেন, তার লাঞ্ছনার কথা কমবেশী পরিমাণে সাহিত্যে ফুটিয়েও তুলেছেন কিন্তু সমস্যার সমাধান অর্থাৎ নারীর স্বাতন্ত্র্য তাঁরা জোরগলায় দাবী জানিয়ে চলতি নির্যাতনের গতানুগতিকতাকে একটুও ধাক্কা দিতে চান নি। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে উনিশ শতকের গোড়ায়—রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ইত্যাদির কার্যকারণ

সংঘাতে সাহিত্যে যে মানবতাবাদ এল তাতে নারী-পুরুষের দুটি স্বতন্ত্র সত্তার কথা স্বীকৃত হল। ফলে নারীর নারীত্ব উপলব্ধি করে মূল্যদানে সাহিত্যিকরা সচেষ্ট হলেন। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, তারক গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্যে নারীর মূল্যায়নের যে প্রাথমিক প্রয়াস দেখা গেছল তার চরম পরিণতি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং তাঁদের পরবর্তী সাহিত্যকারদের মধ্যে। আজকের দিনে নারীকে মধ্যযুগীয় আলোকে দেখা হয় না, সংস্কারের অভ্রভেদী প্রাসাদকে ভেঙে তার মর্যাদা, তার অধিকার, তার দাবী সমস্তই মেনে নেয়া হয়েছে। নজরুল সাহিত্যে নারীও এই অধিকারের দাবীতেই স্বীকৃত।

নজরুল কোন সংস্কারের কাছে দাসখৎ লেখেন নি, জীবন ও সাহিত্যে কোন জীবনবিরোধী সমস্যার অবতারণা করেন নি বলেই পুরুষের সঙ্গে নারীর সম-অধিকার স্বীকার করেছেন, 'স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরী'তে বন্দিনী নারীকে দাসীত্বের চিহ্ন বিসর্জন দিয়ে মুক্তির মন্ত্রে উদ্বোধিত করেছেন। সম্মান দেখাবার ছলে যে সমাজ নারীকে একদিকে আধ্যাত্মিকরাজ্যের দার্শনিকতায় মহিমান্বিত করে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করে আবার অপরদিকে ব্যবহারিক জীবনে দাসীর ন্যায় অবজ্ঞা ও অবহেলা করে—এই দু প্রকার অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

নারীর ওপর স্বেচ্ছাচারী ধর্মান্ধ পুরুষ-সমাজ যেভাবে মাতা, কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীরূপে exploit করছে—তার ফিরিস্তি "নারী", "মিসেস এম, রহমান", "বারাঙ্গনা" কবিতায় পাওয়া যায়। নারী যে শুধু পুরুষের কামনার ইন্ধন, খেলার পুতুল কিংবা প্রজননের অসহায় যন্ত্র নয়, সৃষ্টির ইতিহাসে শিল্প-সংস্কৃতিতে তারও যে মহৎ দান রয়েছে একথাও কবি স্বার্থান্ধ সমাজকে শুনিয়েছেন। ধর্ম ও নীতির দোহাই দিয়ে হারেমের মধ্যে অসহায় পশুর মত তাকে বন্দী করে যে কদর্যতা ও বিভীষিকাময় জীবনযাত্রা তার চলছিল সেখানে কবি উচ্চারণ করলেন মুক্তির বাণী, সাম্যের মন্ত্র ঘোষণা করলেন উদাত্ত কণ্ঠে—

ঃ সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক' নারীরা আছিল দাসী!
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
... ...

যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।

(নারী—সাম্যবাদী : সর্বহারা)

নারী অবলা নয়, তার মধ্যে যে আত্মশক্তির অমিত সম্ভাবনা নিহিত আছে, তার সম্বন্ধে সে অচেতন বলেই নারী অবরুদ্ধ জীবনের অবমাননা মুখ বুঁজে সহ্য করে। তাই কবি জাগরণী মন্ত্রে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন সুপ্ত সিংহীকে—

: চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না ; হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও-শিকল।
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ।
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন যেথা যত আভরণ।
... ...
ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মত আয় মা পাতাল ফুঁড়ি'।
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি।

(ঐ)

এজন্যে নববধূকেও কবি মোহমুক্ত ও আত্মসচেতন করতে চেয়েছেন। স্বামীর চরিত্রহীনতা ও ব্যাভিচারকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে পাপের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে, spirit নেই formএর যূপকাষ্ঠে পুরোহিতদের বাধাবুলিকে বিশ্বাস করার মধ্যে নারীর মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই কঠোর কর্তব্য ও নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে আত্মসম্মান ও দায়িত্ববোধের প্রতি সজাগ হয়ে স্ত্রীরূপে স্বামীর কর্তব্য-বুদ্ধি জাগ্রত করার মধ্যেই নারীত্ব বিকাশ লাভ করে।—

: বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব,
রাঙা মন রাঙা আভরণ,
বল নারী—'এই রক্ত আলোকে
আজ মম নব জাগরণ!"
পাপে নয়, পতি পুণ্যে সুমতি
থাকে যেন, হয়ো পতির সারথি।

পতি যদি অন্ধ হয়, হে সতী
বেঁধোনা নয়নে আবরণ
অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ ॥

(বধূ-বরণ : সিন্ধু-হিন্দোল)

কেবলমাত্র সামাজিক নারীদের জন্য বিদ্রোহী হয়ে কবির মন ক্ষান্ত হয়নি। সমাজে যারা পরিত্যক্তা সেই পতিতাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। নারীদের নারীত্ব সর্বাবস্থাতেই অক্ষুণ্ণ থাকে, পতিতাদের মধ্যেও হৃদয়ের মাধুর্য ও মাহাত্ম্য রয়েছে, সামাজিক বিচারে কলঙ্কিনী নারীও প্রেমের একনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সতীত্বের মর্যাদা পাবার যোগ্য—একথা তাঁর "বারাঙ্গনা" কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়। শোনা যায়, হ্যারিসন রোডের একটি রেস্তোঁরায় প্রায়ই কবি আড্ডা দিতেন বন্ধুদের নিয়ে। সেই রেস্তোঁরার পাশের রাস্তায় অগণিত ভিক্ষুদের ভীড়ে বসে একটি যুবতী নারী কোলে ছেলে নিয়ে ঘোমটা দিয়ে ভিক্ষা করত—মুখে কিছু বলত না, হাত পেতে বসে থাকত। তার আচরণ দেখে ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হত। পথ-চলতি লোকেরা ভিক্ষার বদলে বহু স্থূল রসিকতা তার প্রতি ছুঁড়ে মারত। শালীনতাহীন আচরণ ও অভদ্র উক্তির জন্য নজরুল মনে মনে ব্যথা পেতেন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তিনি নাকি "বারাঙ্গনা" কবিতা লিখেছিলেন বিত্ত-অর্থবান সমাজপতিদের সমাজকে ব্যঙ্গ করে। শরৎচন্দ্র এই শ্রেণীর নারীদের প্রতি পাঠক সমাজের সহানুভূতি ও দরদ প্রথম আকর্ষণ করেন। তবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নজরুলের তফাৎ রয়েছে। যেখানে শরৎচন্দ্র পাঠক-সমাজের করুণা ভিক্ষা করেছেন, সহৃদয়তার সঙ্গে পতিতাদের দুরবস্থা বিবেচনা করতে বলেছেন সেখানে নজরুল পাঠকের দয়া-মায়া চাননি সোজাসুজি যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে দাবী জানিয়ে তাদের অধিকার সাব্যস্ত করেছেন।

নজরুল নারীর রণ-রঙ্গিনী মূর্তিই কামনা করেন নি, তাকে প্রেমময়ী বধূ, স্নেহময়ী জননী ও প্রিয় দয়িতারূপেও চিত্রিত করেছেন। তাঁর অজস্র গান ও কবিতায় তার প্রমাণ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নারী-প্রেমই তাঁকে বিদ্রোহী করেছে—প্রকৃতি-প্রেমই আরেক অর্থে তাঁর নারী-প্রেম। "বিদ্রোহী", "অ-নামিকা", "সিন্ধু", "এ মোর অহঙ্কার", "গোপন প্রিয়া" প্রভৃতি কবিতা ও

গানে নিত্যকালের প্রিয়াকে তিনি আহ্বান করেছেন। "মৃত্যুক্ষুধা" উপন্যাসে মেজবৌ সেবাব্রতা মা, "স্বামী-হারা" গল্পে পতিহীনা রমণীর মর্মবেদনা, "পদ্ম-গোখরো"য় জোহরার স্বামীর জন্যে ভালবাসা, "অগ্নি-গিরি"তে সবুরের জন্যে নূরজাহানের প্রেম ইত্যাদি অঙ্কনের মধ্যে মধ্যে নারীর বিভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ সবের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই—রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রমুখদের রচনায় নারীর এসব দিক অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। নারীর কন্যা-বধূ-জননী রূপাঙ্কনে নজরুলের কৃতিত্ব অধিক নয়, তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে "Time Spirit"কে উপলব্ধি করে বিপ্লবাত্মক মনোভাবকে কেন্দ্র করে শত শত বৎসরের অপমান ও নির্যাতনের পুঞ্জীভূত নিরুদ্ধ বেদনার বিরুদ্ধে নারী সমাজকে যে দৃপ্তকণ্ঠে সচেতন হবার জন্যে ডাক দিয়েছেন তারই মধ্যে।—

ঃ জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা॥
দিকে দিকে ফেলি তব লেলিহান রসনা,
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা,
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী,
বিশ্ব-দাহন তেজে জাগো দাহিকা॥
ধূ ধূ জ্বলে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি!
জাগো মাতা, কন্যা, বধ, জায়া, ভগ্নি!
পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা
জাহ্নবীসম বেগে জাগো পদ-দলিতা,
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা,
চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা॥ (নজরুল-গীতিকা)

গীতিকার নজরুল

কবিতার সঙ্গে গানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আর্য-সভ্যতার আদিযুগে অনুসন্ধান করলে জানা যায় দলবদ্ধ সঙ্গীত থেকেই কবিতার উৎপত্তি। তাই কাব্য ও সঙ্গীতের মূল প্রেরণা এক। কাব্য ও সঙ্গীতের সম্পর্ক নিকটতর হলেও পরস্পর এঁরা দু'জন সতীন। কবিত্বশক্তি থাকলেই যে সঙ্গীতেও তাঁর অধিকার থাকবে এমন কোন কথা নেই, আবার সাঙ্গীতিক হলেই কাব্যের সুষমাধারা একেবারে উছলিয়ে পড়বে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। খুব কম লেখকের ভাগ্যে কবিত্ব-শক্তির সঙ্গে সঙ্গীত-প্রতিভার সার্থক সমন্বয় ঘটে। বাংলা সাহিত্যে এই দুই সতীন মাত্র দু'জনের গলায় হৃষ্টচিত্তে মালা দিয়েছেন—তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। গানের ক্ষেত্রে আমরা নজরুলকে সবচেয়ে বেশী করে পেয়েছি আর নজরুল প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ ঐ গান রচনায়। যে সত্যদৃষ্টির জন্যে মানুষ নানা ভাবে সাধনা করেছে যুগেযুগে, নজরুল সেই সত্যদৃষ্টি লাভ করেছেন গান রচনার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও—'গানের আড়াল দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।' নতুন কিছু করতে হবে বলে কিংবা আত্মপ্রচার বা সম্মানের আকাঙ্খায় তিনি গান লেখন নি; পাখী যেমন ভোরের আলোয় আপনা থেকে ডেকে ওঠে, তেমনি সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও অন্তরের গভীর আনন্দানুভূতির তাগিদ থেকেই গান রচনা করেছেন নজরুল। সমস্ত আঘাত, সমস্ত বেদনাকে তিনি পরম রমণীয় গানে রূপান্তরিত করেছেন—

ঃ কাঁটা নিকুঞ্জে কবি
এঁকে যা সুখের ছবি,
নিজে তুই গোপন রবি
তোরি আঁখির সলিলে॥

(বুলবুল, ১ম খণ্ড)

তাই তাঁর জীবনের বিচিত্র অনুভূতি সরল স্নিগ্ধ সুরের রসে পরিব্যাপ্ত।

রচনার বিচারানুক্রমে ভারতীয় সাধকদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম হলেন, যাঁরা সুরকে প্রাধান্য দিয়েছেন কথার চেয়েও। প্রতীক-ধর্মিতার ওপর এঁদের ঝোঁক এত বেশী যে :কথাটা উপলক্ষ্য মাত্র, সুরটাই আসল। দ্বিতীয় হলেন, যাঁদের কাছে কথাই সব, সুরের তেমন মূল্য নেই। আর তৃতীয় দল হলেন তাঁরা, যাঁরা কথা ও সুর সমানভাবে জড়িয়ে গান রচনার পক্ষপাতী। তৃতীয় দলের প্রাধান্য বাংলাদেশে লক্ষ্য করা যায়। জয়দেব চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই দলের দলী। আমাদের নজরুল এই শ্রেণীর সাধক। নজরুলের পূর্বে রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, সুরেন্দ্রনাথ, দিলীপকুমারের মধ্যে কথা ও সুরের সমন্বয়ে গান রচনার রীতি দেখা গেলেও রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল হলেন এ ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ গীতশিল্পী। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের মধ্যে বাণীর আবেদন যত মনোরম, সুরের আবেদন তত মনোরম নয়; আর সুরেন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও দিলীপকুমারের মন শুধু সুরের আনন্দে ভরপুর, কথা সেখানে দুর্বল। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে সুর ও বাণীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে গান রচনায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মত সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। রবীন্দ্র-নজরুলের গীতিতে কবি রবীন্দ্র-নজরুলের প্রাধান্য বেশী না সুরস্রষ্টা রবীন্দ্র-নজরুলের প্রকাশ বেশী তা বলার উপায় নেই। কেননা তাঁরা গানকে কথার সঙ্গে সমোপযুক্ত সুরের সংযোজনা করে এমন লোকবিমোহন সঙ্গীত রচনা করেছেন যা সঙ্গীত জগতে অতুলনীয়। তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীত বা নজরুল-গীতির বিচার করতে হলে সুরকে খাটো করে বাণীকে কিংবা বাণীকে খাটো করে সুরকে প্রাধান্য দিয়ে বিচার করতে যাওয়া দোষণীয়। ও-দুটির মিলিত অভিন্নরূপের বিচারই তাঁদের গানের আসল বিচার কেননা কথা ও সুরের বেণীবন্ধনেই সঙ্গীতের মূর্তি হয় লীলায়িত।

বাংলা গানে নজরুল যখন প্রবেশ করলেন তখনকার পরিবেশ একটু জানা দরকার। তাঁর মত একটি প্রতিভার জন্যে জনসাধারণ উন্মুখ হয়েছিল। আমাদের দু'জন শ্রেষ্ঠ সুরকার রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ তখন জীবিত। অথচ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসে যে সঙ্গীত রচনা করছিলেন সে-সঙ্গীত তাঁর চেলা-চামুণ্ডাদের উন্নাসিক হাওয়া কাটিয়ে জনসাধারণের নাগালের মধ্যে এসে পৌঁছায়নি। ওদিকে অতুলপ্রসাদ রয়েছেন সুদূর লক্ষ্ণৌ সহরে। বাংলা গানের নাড়ীর সঙ্গে তাঁর পুরোপুরি যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া তাঁর রচনাও সংখ্যার দিক থেকে স্বল্প—গানে বড্ড বেশী হিন্দুস্থানী গন্ধ।

উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে বাংলা গান তখন অনেকটা গতানুগতিক হয়ে পড়েছিল, ফলে অধোগতি হয়েছিল। এমনি সময়ে নজরুল তাঁর বিচিত্র সম্ভার নিয়ে দেখা দিলেন।

গীতিকার নজরুলের জীবন হচ্ছে যেন একটা বহুরাগরাগিণীবিশিষ্ট যন্ত্র বিশেষ। কীর্তন, ভাটিয়ালী, সারি, জারি, মুর্শিদা, বাউল, রামপ্রসাদী, ঠুংরী, গজল, ধ্রুপদ, তোড়ী, জৌনপুরী, ভৈরবী, আশাবরী, পিলু, খাম্বাজ, বেহাগ, ছায়ানট, ভূপালী, ইমন, ধানেশ্রী, সাহানা প্রভৃতি বহু রাগরাগিণীর সংযোগে তিনি গান রচনা করেছেন। আর কালোয়াতি গানের ব্যাকরণবদ্ধ আলঙ্কারিক আতিশয্য ত্যাগ করে বাংলা গানের বাণীরূপের সঙ্গে সর্বভারতীয় সুরের পরিণয় সাধন করেছেন নজরুল। যেমন বনেদীধারায় সুরের সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সতেজ ও প্রাণোচ্ছল সুর নিয়ে গান রচনা করেছেন, তেমনি তাঁর নিজের সমযকার বাংলা গানে যাঁদের প্রভাব ছিল যথা ভগবতী গীতির আন্তরিকতায় রজনীকান্ত, গম্ভীর উদাত্ত সুরের প্রবর্তনে দ্বিজেন্দ্রলাল, উচ্চাঙ্গের সুরের কৌশলে অতুলপ্রসাদ, ধ্রুপদগীতিতে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিদের সুরের প্রভাব স্বীকার করে বাংলা গানে সুষ্ঠু সুরসমন্বয়ের অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য এনেছেন। প্রাচীন ও নবীনের এমন সম্মিলন আমাদের বাংলা গানে আর কখনও দেখা যায় নি। যদি কেউ ভারতীয় সঙ্গীতের নানা শাখা-প্রশাখার পরিচয় জানতে ইচ্ছুক হন তাহলে তাঁকে আমি নজরুলের গানগুলি দেখতে অনুরোধ করব। তাঁর গান যদি কেউ study করেন তাহলে তিনি যেমন ভারতীয় সঙ্গীতের রসমাধুর্যের সন্ধান পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠবেন তেমনি তাঁর গানের সারল্যে ও মাধুর্যে আকৃষ্ট হবেন। গীতিকার অনেকেই থাকেন, গান রচনা করার শক্তিও অনেকের আছে, কিন্তু নজরুলের মত সৃজনীশক্তি অপর কারুর মধ্যে দেখা যায়নি।

ভারতীয় সঙ্গীতেরই শুধু সাধনা করেন নি তিনি: আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সুর তিনি বাংলা গানে আমদানি করেছেন। যেমন—'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্ণি বায়', 'চমকে চমকে ধীর ভীরু পায় পল্লীবালিকা বনপথে যায়' ইত্যাদি। মোট কথা, যখনি তিনি যে সুরে গান শুনেছেন তখনি তিনি সে সুরকে বাংলা গানে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর আগে ইউরোপীয় সঙ্গীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতি সঙ্গীতের ধারা অনুসারে গান রচনা করেছিলেন, সহজ ও নৈপুণ্যের সঙ্গে অনেক

রীতি-নীতি প্রয়োগ করেছেন যার মধ্যে ইউরোপীয় সজীবতা রয়েছে কিন্তু আমাদের দেশের মাটিতে সেদিন সুর নির্বাচনটি লোকের মনের মত হয়নি। দেশ-বিদেশের নানা সুরের সমন্বয়ে গানে নজরুল বৈচিত্র্য এনেছেন, কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় তাঁকে নিতে হয় নি, কারণ দুটি রীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলে তিনি এদের মিলন স্বাভাবিক নিয়মে করতে পেরেছিলেন এবং গানের সুরগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কয়েকটা নিজস্ব সুরও সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁর 'নির্ঝরিণী', 'রেণুকা', 'মীনাক্ষী', 'সন্ধ্যামালতী', 'বনকুন্তলা', 'দোলন-চম্পা' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি। তাই তিনি বাংলা সঙ্গীতের একজন সংগঠকই নন, একজন প্রধান সুরস্রষ্টা।

সঙ্গীতে নজরুলের বহু বিচিত্র রাগরাগিণীর সমাবেশ দেখে বিস্মিত হতে হয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতন নজরুল রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মাননি, জীবনে বড ওস্তাদের কাছে সাক্রেদের মত নিষ্ঠা নিয়ে গান শেখার সুযোগ কোনদিনই হয়নি। দুবেলা দু মুঠো অন্ন যে সংসারে জোটে না সেখানে কবিতা বা গানের চর্চা নিরঙ্কুশভাবে চলবে কী করে! তাঁর সময় যে 'লেটোদল' ছিল তাঁদেরই সাহায্যে তাঁর গানের সাধনা শুরু হয়েছিল—তাঁদের দলে থেকেই গান ও যন্ত্র-সঙ্গীতে দক্ষতা লাভ করেন, গীত-রচনায় হাতে খড়ি হয় তাঁদের দলে ভিড়েই। অথচ কী আশ্চর্যের বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি গীত রচনায় কৃতিত্ব দেখালেন, রবীন্দ্র-প্রভাব কাটিয়ে বাংলা গানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে এলেন, বিভিন্ন রাগরাগিণী সম্পর্কে জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিলেন।

সুরের ক্ষেত্রে নজরুল যে সকল পরীক্ষা করেছেন সে সকলের অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ সুরু করেছিলেন, কিন্তু নজরুল সুর প্রয়োগের প্রতিক্ষেত্রেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পর আমরা গানের ক্ষেত্রে যেটুকু অগ্রসর তা নজরুলের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। একথা আজ আর অস্বীকার করা চলে না। গানের সব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমি প্রাজ্ঞ না হলেও একথাটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারি যে অদ্ভুত সুরবোধ থেকে তিনি বাংলা গানে এনেছেন নবীন জোয়ার, যে জোয়ার বাংলা গানের মরা গাঙে এনেছিল বান, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলনের অনেক আগে। আধুনিক সঙ্গীত নামে যে ধারা বাংলার আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলেছে তার উৎসমূলও নিহিত রয়েছে নজরুল-গীতির অন্তরতলে। কারণ প্রসঙ্গে বলতে পারি যে অপরাপর সুরকারের মতো তিনি অতিমাত্রায়

ব্যক্তিত্ব সচেতন নয়। এর ফলেই তাঁর রচনায় তাঁর নিজস্ব ভঙ্গী বজায় রেখেও গায়ক গানে সুর বিস্তার করতে পারেন। তিনি তাঁর রচনা মেলে ধরেছেন গায়কের সামনে তাঁর নিজের সৃষ্টির মধ্যে গ্রহণ করবার জন্য। কবিগুরু তাঁর গানে অপরের সুর-দানের পক্ষপাতী ছিলেন না, শিল্পীর স্বাধীনতা তাঁর সঙ্গীতে নির্মমভাবে খণ্ডিত; তিনি কারণ দেখিয়ে বলতেন…"এমন অবস্থায় সহজ মীমাংসা এই যে, যে ব্যক্তি গান রচনা করেছেন তাঁর সুরটিকে বহাল রাখা। কবির কাব্য সম্বন্ধেও এই রীতি প্রচলিত; চিত্রকরের চিত্র সম্বন্ধেও। রচনা যে করে রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই, তার সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধনের দায়িত্ব যদি আর কেউ নেয় তাহলে কথা-জগতে অরাজকতা ঘটে। ললিত কলাতেও ধর্মনীতির অনুশাসন এই যে যার যেটি কীর্তি তার সম্পূর্ণ ফলভোগ তার একলারই।' অথচ আমাদের বাঙালী গায়কেরা গানের কাব্য-সৌন্দর্যই শুধু চান না, তাঁরা চান সঙ্গীতে নিজ মনের বিস্তৃতি যাতে তাঁরা যোগ করতে পারেন নিজেদের মনের মত সুর, সুরের আকাশে বাতাসে তাঁদের মন চায় ডানা মেলে যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়াতে। নজরুলই এনে দিলেন এই সুযোগ—গায়ক ইচ্ছে করলে প্রয়োজনবোধে রীতির পরিবর্তন করতে পারেন, এমন কি তাঁর কথায় স্বাধীনভাবে সুরও দিতে পারেন, যা রবীন্দ্র-সঙ্গীতে হবার উপায় নেই। এইভাবে আমাদের গায়কেরা নতুন সৃষ্টির পথ খুঁজে পেলেন—তাঁদের সামনে আধুনিক বাংলা গানের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় সিংহদ্বারের আগল গেল খুলে। সঙ্গীতের এই মুক্তি এনে দেবার ফলে তিনি হারিয়ে যাননি বরং সকলের কাছে আরো নিবিড়ভাবে ধরা দিয়েছেন।

আধুনিক বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য হল, কথার প্রাধান্য, মিশেলী রাগ, সাধারণের উপযোগী সুর ও তালের উপযোগী কথা—নজরুলের হাতেই এগুলি প্রথম সার্থকতা লাভ করে। তিনিই প্রথম নানা রাগরাগিণীর মিশ্রণে যুগের উপযোগী করে নতুন নতুন সুরে গান রচনা করেন। বস্তুতপক্ষে সঙ্গীতের কলাকৌশল নিয়ে যে প্রচুর পরীক্ষা করেছেন সে সমস্ত পরীক্ষাই জনতার রুচির সঙ্গে মিলিয়ে করেছেন। আমাদের বাংলা গানে জনতার আবেদনকে অপর কেউ এতবড় মর্যাদা দেননি—এইখানেই তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব। অনেক সঙ্গীতবিদ্‌দের মতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত একঘেয়ে, গানের সুর বড় বেশী ধরাবাঁধা, বৈচিত্র্যের নিতান্ত অভাব তাতে। কিন্তু নজরুলের গানে সুরে সুরে বৈচিত্র্য

আনয়নই একমাত্র বিশেষত্ব: গীত রচনায় যেখানে নজরুলের কৃতিত্ব সে হচ্ছে রাগমিশ্রণে আর রাগের ভাঙা-গড়ার ব্যাপারে। যেমন, 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' (মালকোষ-ভৈরব-মেঘ-বসন্ত-হিন্দোল শ্রীপঞ্চমী-নটনারায়ণ), 'আজি বাদল ঝরে মোর একলা ঘরে' (ভৈরবী-আশাবরী-আধাকাওয়ালী), 'রং মহলের রংমশাল মোরা, আমরা রূপের দীপালী' (ভৈরবী-আশাবরী-ভূপালী), 'আজি দোল পূর্ণিমাতে দুলবি তোরা আয়' (কালাংড়ি-বসন্ত-হিন্দোল). 'কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায় কারে কহি' (বেহাগ-তিলোক-কাম্বোদ-খাম্বাজ), 'আধো ধরণী আলো আধো আঁধার (তিলক-কামোদ-পিলু) প্রভৃতি। সুরের সঙ্গে সঙ্গে কথায় যে প্রাধান্য আছে তাঁর গানে সেকথা বলাই বাহুল্য। আধুনিক গান শুধু মলয় বাতাস, প্রিয়া আর চাঁদ নিয়ে নয়, আধুনিক গান হল যুবজীবনের গান —যাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে, যাতে সাধারণের কথা থাকবে, যাতে থাকবে না ওস্তাদী গানের মারপ্যাঁচ।

বাংলা দেশে ওস্তাদী গানের প্রচলন ইংরেজ রাজত্বের সময় থেকে; নবগঠিত জমিদারশ্রেণী এই গানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন আভিজাত্য দেখাবার জন্যে। গণজীবনের ধার এ গান ধারত না, সুরের কারসাজিতেই ব্যস্ত থাকত, এ গান চলত কৌলিন্যধারায়, বিশুদ্ধি বজায় রাখতে গিয়ে ওস্তাদরা আঁটসাট বেঁধে রাখতেন যাতে ক'রে কোন রকমে লোকসঙ্গীতের গায়কেরা প্রবেশপথ না পায়। এই বাধানিষেধের বেড়াজালকে দু'পায়ে দলে নজরুলের গান নতুন রীতির প্রবর্তনা ক'রে তাকে দিল চটুল স্বাচ্ছন্দ্য গতি। একটি গানকে একটি রাগে না বেঁধে একটি শুদ্ধরাগের কাঠামোর মধ্যে অন্যরাগের সুরকে স্থান দিয়েছেন তিনি। যেমন, ঠুংরীর মধ্যে খাম্বাজ আর পিলু দিয়ে 'আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী,' ভীমপলাশী দিয়ে 'আমি শ্রান্ত হয়ে আসব যখন পড়ব দোরে টলে', তিলক-কামোদ-দেশ দিয়ে 'একডালি ফুলে ওরে সাজাব কেমন করে,' জয়জয়ন্তী-খাম্বাজ দিয়ে 'ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়,' নটমল্লার-ছায়ানট নিয়ে 'হাজার তারার হার হয়ে গো' ইত্যাদি; ধ্রুপদের মধ্যে মালকোষ রাগে 'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু', টোরীরাগে 'আমি ছন্দভুল চির-সুন্দরের নাটনৃত্যে গো' প্রভৃতি; খেয়ালের মধ্যে দরবারি কানাড়ায় 'আজি ঘুম নহে, নিশি জাগরণ', ধবলশ্রী মধ্যমানে 'নাইয়া কর পার', ইমন-কল্যাণে 'পথের দেখা এ নহে বন্ধু', ইত্যাদি; টপ্পার মধ্যে সিন্ধু-কাফি-খাম্বাজ দিয়ে 'আজি এ কুসুম হার সহি

কেমনে', দেশ-সুরট রাগে 'কোন মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদন হানে' প্রভৃতি। এই রাগরাগিণীর সংমিশ্রণে যে কেবলমাত্র সুরের অপূর্বতা প্রকাশ পেয়েছে বা নজরুল-গীতির প্রাণ-শক্তি উপচিত হয়েছে তা নয়, এর উদ্ভাবনীশক্তি প্রতিপন্ন করেছে নজরুলের অপরিমেয় বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব।

সুরের প্রাণরসকে জনগণের মধ্যে নৈপুণ্যের সঙ্গে সঞ্চারিত করেছেন বলে নজরুলের বিরুদ্ধে শুচিবায়ুগ্রস্ত ওস্তাদ খড়্গহস্ত। বিশুদ্ধি মার্গের উপাসক রক্ষণশীল সনাতনপন্থীদের মধ্যে এতে ত্রাসের ও রোষের সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ ভারতীয় রাগরাগিনীর ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য বা বিশুদ্ধি রক্ষা না করে অবাধ সংমিশ্রণ পদ্ধতিতে বর্ণসাঙ্কর্যের মত সুরসাঙ্কর্যেরই প্রশ্রয় দিয়েছেন। জনগণের সুস্থচেতনার সঙ্গে সম্পর্ক-বিহীন নানারকম উদ্ভট ও অলস সুরের প্যাঁচ সৃষ্টি করা ও রাগরাগিনীকে ধরাবাঁধা ছাঁদে বেঁধে দেওয়া ঐ সব ক্ষয়িষ্ণু ওস্তাদদের রেওয়াজ। সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক দেশে এই ধরণের নপুংসক সুরের ধুয়ো তোলা হচ্ছে। সঙ্গীতের এই দেউলিপনা বর্তমানে ভেঙে পড়া সমাজ-ব্যবস্থার একটা লক্ষণ। অথচ প্রাচীন ভারতের সুরস্রষ্টারা নতুন রাগসৃষ্টির নব নব সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থা স্থবির হয়ে পড়েনি। বর্তমানের এই মুমূর্ষু সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নজরুলের শিল্পী-মনে যে প্রতিবাদের অনুরণন তারই প্রভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন বলিষ্ঠ লোকবিমোহন সঙ্গীত। গানের কথার মধ্যে যে ক্রিয়া নজরুলের সুর সেই ক্রিয়াকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। আজ অনেক গীতিকার জনগণের কুরুচির ওপর গান লিখে অশিক্ষিতদের মন জয় করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। নজরুলের প্রতিভা এতে সায় দেয় নি, সস্তা অনুভূতি ও আবেগ দিয়ে কোনদিন তিনি গান রচনা করেন নি। জনগণের মধ্যে সুরজাল বিস্তৃত করে দিয়েছেন। কিন্তু স্ফূর্তির নামে মলিন আবহাওয়ার মধ্যে সঙ্গীতকে নামান নি—এই হলো তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যিকারের রসিক মনের পরিচয়।

নজরুল-গীতি প্রধানত চারভাগে বিভক্ত—১। গজল বা প্রেমসঙ্গীত, ২। ইসলামী ও শ্যামা-সঙ্গীত, ৩। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, ৪। হাসির গান।

এগুলির মধ্যে নজরুলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি গজল। মোগল-যুগে পারস্য দেশের প্রেমসঙ্গীত গজল ভারতে আসতে আরম্ভ করে। বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে গজল এলেও নতুন সুর, নতুন ঢঙ, নতুন রঙ নজরুলের হাত দিয়েই বেরিয়েছে।

তাঁর আগে অতুলপ্রসাদ গজল গান রচনা করলেও তাতে আছে উর্দুর ঐতিহ্যের উপর অন্ধভাবে দাগা বুলাবার চেষ্টা। যেমন—'কত গান ত হল গাওয়া', 'জল কহে মোর সাথে চল', 'কে গো তুমি বিরহিনী' ইত্যাদি। কিন্তু নজরুল পারসীয় গজলের বিদেশী সুরটিকে বাঙালীয়ানার আবরণে জড়িয়েছেন এবং তিনি বাংলা গজল দাদরায় 'শেয়রের' ভঙ্গীটি প্রথম আনেন। তিনি তাঁর রচনায় দেখিয়েছেন যে হৃদয়ের স্নিগ্ধ মধুর লীলা এবং বৈচিত্র্যও কত নিপুণভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন। যেমন—

ঃ আমায় চোখ ইসারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।
খুলে দাও রংমহলার তিমির দুয়ার ডাকিলে যদি॥

ঃ এত জল ও কাজল চোখে, পাষাণী আন্‌লে বল কে।
টলমল জল মোতির মালা দুলিছে ঝালর পলকে॥

ঃ নিশি ভোর হল, জাগিয়া পরাণ পিয়া।
কাঁদে 'পিউ কাঁহা' পাপিয়া, পরাণ পিয়া॥

ঃ বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে
দিস্‌নে আজি দোল।
আজো তার ফুল-কলিদের ঘুম টুটেনি
তন্দ্রাতে বিলোল॥

ঃ এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল।
এ যে ব্যথা-রাঙা হৃদয় আঁখি-জলে টলমল॥

ঃ করুণ কেন অরুণ-আঁখি
দাও গো সাকী দাও শারাব।
হায় সাকী এ অঙ্গুরী খুন,
নয় ও হিয়ার খুন-খারাব॥

ঃ কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে
কেউ ভুলিতে গায় গীতি॥

: এ আঁখি-জল মোছ পিয়া ভোলো ভোলো আমারে।
মনে কে গো রাখে তারে ঝরে যে ফুল আঁধারে॥ ইত্যাদি

—এই সব গানে তাঁর অত্যন্ত স্নিগ্ধ স্বাভাবিক এবং মর্মস্পর্শী একটা আকুলতা অন্য সকলের সৃষ্টি থেকে তাঁকে পৃথক করে রেখেছে। এই আবেগের বৈশিষ্ট্য শুধু তাঁর প্রেম-সঙ্গীতেই নয়, তাঁর ভক্তিরসাত্মক গানগুলিতেও এই বৈশিষ্ট্য অনন্যসাধারণভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলার মর্মস্থলের বাণী, বাউল, সারি, ভাটিয়ালী ঝুমুর প্রভৃতি গানকে নজরুল নিয়ে এলেন এ্যারিস্টোক্র্যাট সমাজের বৈঠকখানায়। অবশ্য লোক-সঙ্গীতের অভিজাতমহলে ছাড়পত্র লাভের মূলে সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্য স্বীকার করছি। সুর যেমন এসব সঙ্গীত থেকে নিয়েছেন তেমনি কথার সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেছেন। এই লোকসঙ্গীতের ধারায় অজস্র গান রচনা করে বাংলার সেই প্রাচীন সংস্কৃতির নব অভ্যুদয়ের সূচনা করেছেন। বাংলার মুসলমানী তমদ্দুন ও হিন্দু সংস্কৃতির সহযোগে যে বাংলা সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে নজরুল সেই জাতীয় সংস্কৃতির কবি। বাংলার হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা তাঁর কাব্য ও গানের প্রধানতম সুর। বাংলা দেশে মুসলমান কবিরা ইসলামীয় দৃষ্টিতে কাব্য রচনা করেছিলেন। নজরুল-প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে নতুন রঙের পরশ পেলেন এঁরা। তাঁদের ইসলামীয় মার্সিয়া গানের মধ্যে নজরুল নিয়ে এলেন ভারতীয় রাগিনীসম্মত বিশুদ্ধ ইসলামী সঙ্গীত। যেমন —'ও মন, রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ', 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে', 'আল্লা রসুল বল রে মন', 'মদিনায় কে যাবি আয়', ওরে ও নতুন ঈদের চাদ' ইত্যাদি। একদিকে যেমন ইসলামী সঙ্গীত অপরদিকে বাউল, রামপ্রসাদী, কীর্তন প্রভৃতিতে নিয়ে এলেন সুরের নতুন ঠমক ও গমক। 'শ্যামা-সঙ্গীত' রচনায় নজরুলের কবিত্ব শক্তিরই শুধু প্রকাশ হয়নি তাঁর অপূর্ব সুর-সৃষ্টি স্থায়িত্ব লাভ করেছে। শ্যামাসঙ্গীতে রামপ্রসাদের পর যদি কাউকে স্থান দেওয়া যায় তাহলে তিনিই নজরুল

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে প্রয়োজন-উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজজীবনে যে নতুন আবহাওয়া এলো, তার ফলে সাহিত্যেও এলো এক নতুন উদ্দীপনার স্রোত। নাটকে, উপন্যাসে, কাব্যে, গানে, বাংলা সাহিত্যে সেদিন যে নতুন হাওয়াবদলের ঝড় এলো তার অনেকখানিই সাময়িক, সময়াতিক্রমের পর মূল্য হয়ত কমে

গেছে তাহলেও আমাদের দেশাত্মবোধের মধ্যে সেইদিন এসেছিল বাস্তবতার ছোঁয়া। নজরুলের স্বদেশী সঙ্গীতগুলি এই প্রাণস্পন্দনের যুগের গান। তাঁর সঙ্গীতের দৃপ্ত ওজস্বিতা নিদ্রাবশে আচ্ছন্ন বাঙালী জাতিকে উদ্দীপিত করেছে, উদ্বোধিত করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিন দেশের প্রত্যক্ষ অবস্থার দিকে সাদা চোখে তাকান নি। দেশের গরীবদুঃখীদের সঙ্গে তাঁদের কোন প্রত্যক্ষ সংস্রব বা যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু অগ্নিগর্ভ গানের দুর্জয় হাতিয়ার নিয়ে নজরুল এসে দাঁড়িয়েছেন জনগণের পাশে। তাঁর গানে আমরা দেখলাম অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, লাঞ্ছিত মানবতার বিদ্রোহ অভিযান, শাসন ও শোষণের বেড়াজাল কাটিয়ে তারা বেরিয়েছে উদ্দাম বেগে, প্রাচীর-ঘেরা কারাশ্রমের বিরুদ্ধে ছুটেছে বিপ্লবাগ্নি নেত্রে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাতে জাতীয় জাগরণের উদাত্ত আহ্বান আছে কিন্তু এ দেশপ্রেমে রয়েছে প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক চেতনার অভাব, দীনহীন জনসাধারণের সঙ্গে এর নাড়ীর যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ—নজরুল এদিক দিয়ে দেশবাসীর অত্যন্ত আপনজন, দেশের প্রত্যক্ষ অবস্থার ওপর তাঁর ছিল প্রখর দৃষ্টি, বাস্তবের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল দৃঢ় ; তাই দেশের দীনদুঃখীর সঙ্গে এক হয়ে শৃঙ্খল ভাঙার গান গেয়েছেন—

: দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার !

নয়ত—

: এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই তোদের মোরা করব রে বিকল ॥
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আশা মোদের সবার বাঁধন ভয় ॥
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন-ভয়কে করবো মোরা জয়
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল ॥

কিংবা

: কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙে ফেল্ কর্‌রে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ-বেদী।

প্রকৃত দেশাত্মবোধের গান হিসেবে এসব গান চিরকালীন। জাতির মনে যে চঞ্চলতা জেগেছিল এসব গানে তার রেশ এখনও অনুভব করি। বাংলা গানে বলিষ্ঠ পৌরুষ ও মার্চিং সুর তিনিই প্রথম এনেছেন। যেমন, 'টলমল্ টলমল্ পদভরে, বীরদল চলে সমরে', 'চল্—চল্—চল্', 'অগ্রপথিক হে সেনাদল' প্রভৃতি। তাই স্বদেশী গান রচনার ক্ষেত্রে নজরুলের কৃতিত্ব কোন কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথেরও উপরে। দ্বিজেন্দ্রলালের উপরে তো বটেই।

নজরুলের হাসির গানে বিষয় সমাবেশের নতুনত্ব ও প্রকাশভঙ্গীর অনায়াস-স্বচ্ছতা যেমন লক্ষ্যণীয়, তাঁর অন্তর্নিহিত অনাবিল ও আক্রমণাত্মক কৌতুক-প্রবণতাও তেমনি উপভোগ্য। হাসির নামে ভাঁড়ামি না করেও যে হাস্যরস সৃষ্টি করা যায়, 'বাঙালী বাবু', 'শালাগুসন্ধিৎস্থ', 'প্যাক্ট', 'ডোমিনিয়ম ষ্টেটাস্', 'দে গরুর গা ধুইয়ে' প্রভৃতি গানগুলি তার প্রমাণ। টেক্‌নিকের দিক থেকে নতুন; কিন্তু সুরের দিক থেকে পুরোনো হয়েও এসব গানের আসরে সমাদর পাবার যোগ্য। হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলালের পরই নজরুলের নাম করা যেতে পারে।

এসব ছাড়াও প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি অনেক গান লিখেছেন, যা সুর ও বিষয়ের দিক থেকে নতুনত্বের দাবী রাখে। যেমন—'ছন্দের বন্যা হরিণী অরণ্য', 'পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ', 'এস বসন্তের রাজা হে আমার'. 'পিউ বোলে পাপিয়া', 'চাঁদের পিয়ালাতে আজি', 'আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ', 'কুহু কুহু কুহু কুহু বলে কোয়েলিয়া', 'শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এল না' ইত্যাদি।

গানে নজরুল অনেক উর্দু, আরবী, পারসী শব্দ জুড়েছেন; এগুলি গানের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বরং গতিকে সাহায্য করেছে। হিন্দীতেও কতকগুলি গান তিনি লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি বাঙালীয়ানায় ভরপুর।

নজরুল বহু গান লিখেছেন যা অগণনীয়, সংখ্যার দিক দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চেয়ে অনেক বেশী কিন্তু সব গান গান হয়ে ওঠেনি, প্রতিটি সৃষ্টিই অনবদ্য ও রসের স্পর্শে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। একসঙ্গে প্রেমের গান, ইসলামী গান, শ্যামাসঙ্গীত, বৈষ্ণব-সঙ্গীত প্রভৃতি লেখা হয়েছে অকাতরে একই সময়ে, সঙ্গে সঙ্গে সুরও বসিয়ে দিয়েছেন—এ তাঁর প্রতিভার অনন্যসাধারণতার পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু কাব্য-বিচারের দিক দিয়ে খুঁত অনেক রয়ে গেছে। পেটের ধান্দায়

গান লিখতে হয়েছে ; গ্রামোফোন রেকর্ডের উপযোগী করে আড়াই মিনিটের গান লিখে দিতে হয়েছে। তাই সব গান-সৃষ্টির মূলে উন্মাদনাময়ী প্রেরণা তিনি পান নি। তা' বলে তাঁর কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি ; কারণ গানের এমন কোন বিভাগ নেই যেখানে তিনি অবর্তমান। সঙ্গীতের ওপর মানুষের সত্যিকারের দরদী মন যদি থাকে, সে-মন যদি তথাকথিত সমালোচকের মত খুঁত-খুঁতে মন না হয় তাহলে চিরকালের জন্যে নজরুল কতকগুলি গান লিখেছেন যা মানুষের কণ্ঠহার হয়ে থাকবে। কেন না, তাঁর আত্মা পূর্ণতালাভ করেছে তাঁর গানে। এই আত্মার পূর্ণতাকেই আমরা বলি সংস্কৃতি। নজরুল এই সংস্কৃতির পূর্ণমূর্তি।

সৌন্দর্যের কবি নজরুল

তীক্ষ্ণতা যত সহজে লোকের মনে সাড়া জাগাতে পারে স্নিগ্ধতা তেমন পারে না। তার প্রমাণ নজরুল যে রুদ্র হয়েও রসবন্ত এ পরিচয় অনেকের নিকট অবিদিত। তাঁর সাহিত্যের বিপ্লবী ও বিদ্রোহীরূপ যত সহজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল তত সহজে তাঁর কাব্যের মধ্যে প্রকৃতির উপলব্ধি, প্রশান্ত প্রেমের লাবণ্য-মাধুর্য যে রূপ মূর্তি পরিগ্রহ করে অপূর্ব সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছে যার কাব্য-মূল্য কম নয় তা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে নি। তার হয়ত একটা কারণ ছিল। নজরুলের আবির্ভাব যে-সময়, সে-সময় ভারত ছিল পরাধীন। কাজেই পরাধীন জাতি তাঁর কাছ থেকে শৃঙ্খল ভাঙার মন্ত্রেই উদ্বোধিত হয়েছে। প্রেম, প্রকৃতি ইত্যাদির মূল্য তখন তাব কাছে ছিল না। বার্ণার্ড শয়ের কথায় তখন তাদের লক্ষ্য ছিল "It will attend to no business, however vital, except the business of unification and liberation."[১] সমাজের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন সেদিন তিনি মিটিয়েছিলেন, কিন্তু সে-চাহিদার মধ্যে তিনি তাঁর প্রতিভাকে আবদ্ধ করে রাখেন নি—সেদিনকার প্রয়োজনীয় সাহিত্যের এমন একটি সুধাপূর্ণ মাধুর্য ঢেলে দিয়েছেন যা সময়ের নিরূপিত গণ্ডী অতিক্রম করে আজকের পাঠক পযন্ত পৌছয়। সমস্ত ঝড়ের অন্তরালে যেমন একটি গভীর শান্তি, একটি ধ্যানমৌন বিষাদের ভাব নিহিত থাকে, একটি প্রদীপের শিখায় যেমন দাবানল জ্বলে ওঠে আবার সেই প্রদীপের প্রাণের স্নিগ্ধ তৈলে শান্তির মহিমা যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে তেমনি নজরুলের ঔদার্য, তেজ ও মোহের মধ্যে দাহনদীপ্তির অতুলনীয় সৌন্দর্য, রুদ্ররুক্ষতার মধ্যে তাঁর জীবনের স্নেহ-প্রেম-মানবতা লক্ষ্য করা যায়। তাই কবিগুরু গ্যেটে বলেছেন, "সৌন্দয নিসর্গের গূঢ় নিয়মসকলের অভিব্যক্তি, সৌন্দর্যের সান্নিধ্য ছাড়া যারা কখনই প্রকাশ পেত না।" তাই সৌন্দর্য শুধু ফুলের গন্ধে নেই, বজ্রের অগ্নিতেও রয়েছে; বাঁশীতেই শুধু সঙ্গীত বাজে না, কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্যেও তা নিনাদিত হয়। জীবন শুধু সুন্দর নয়,—'মরণ রে তুঁহু মম

শ্যাম-সমান।' বসন্তের উল্লাস শুধু সুন্দর নয়, নটরাজ রুদ্রের প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব নর্তনেও তা বিভাসিত।

নজরুলের ভাণ্ডার গানেও সৌন্দর্য অনুরণিত, কেন না জাহান্নমের আগুনে বসেও তিনি পুষ্পের হাসি হাসতে পারেন। বিদ্রোহ-বিপ্লব তাঁর কাব্যের প্রধানতম সুর হলেও তা তাঁব কাব্যের একমাত্র সুর নয়। প্রথমেই তাঁর প্রসিদ্ধ 'বিদ্রোহী' কবিতার উল্লেখ করতে পারি। এ কবিতার মধ্যে একদিকে বিদ্রোহ বিপ্লবের উদাত্ত আহ্বান, সে বিদ্রোহ হচ্ছে—'কুৎসিত যাহা, অসাম্য যাহা সুন্দর ধরণীতে—হে পরম সুন্দরের পূজারী। হবে তাহা বিনাশিতে।' অপরদিকে বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহের মাঝে গানের ছন্দের মত ললিত মধুরতার বাণী কর্মক্লান্ত দেহে বিরামদাযিনীব মত আশায মনকে উদ্বুদ্ধ করে। কবির 'এক হাতে বাকা বাঁশের বাশরী আর হাতে রণতুর্য।' তাই কবিতাটি উদ্দেশ্যমূলক হযেও কাব্য-সৌন্দর্যে পরিমণ্ডিত। এখানে তাঁর সৌন্দর্যপ্রিযতার অংশগুলি তুলে দিচ্ছি—

ঃ আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।
আমি হাম্বীর, আমি ছাযানটি, আমি হিন্দোল,
আমি চলচঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল'
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।
... ...
আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণা, তন্বী-নযনে বহ্নি,
আমি ষোডশীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম আমি ধন্যি।
... ...
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিযার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর।
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-ক'রে দেখা-অনুখন'
আমি চপল মেয়ের ভালবাসা, তা'র কাঁকন চুড়ির কন্-কন্।
... ...

আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর
কাঁচলি নিচোর।
আমি উত্তর বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস
পূরবী হওয়া'
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াষা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি।—
... ...
আমি অফিয়াসের বাঁশরী,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্‌-ঘুম্‌
ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি,
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।

(অগ্নি বীণা)

—এসব ক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে কবির মধুর ও করুণ রস। বীররস-প্রধান ধাতুর সঙ্গে যে মধুর রসের মিশ্রণ আছে তার আভাষ এইখানে প্রথম পাওয়া যায়, আর পরবর্তী রচনায় প্রচুর মিলবে। যেমন, 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'চক্রবাক', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'বুলবুল', 'চোখের চাতক' প্রভৃতি বইতে। একেবারে শেষে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও যোগীজীবন যখন তাকে আকৃষ্ট করেছে তখন তাঁর বীররস, আদিরস, প্রভৃতি একটা ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে সর্বোত্তম শান্তির মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। শ্যামা মায়ের চরণাশ্রিত জবাকে সম্বোধন করে সাশ্রুনয়নে কবি গেয়েছেন—'জবা তোর সাধনা আমায় শেখা, মোর জীবন হোক সফল।' অথবা ইসলামী গানের মধ্যে গেয়েছেন—

আমার মনের মসজিদে দেয়
আজান হাজার মোয়াজ্জিন্‌,
প্রাণের "লওহে" কোরান লেখা
রুহ্‌ পড়ে তা রাত্রিদিন॥

(জল-ফিকার)

তাই নজরুলের কাব্য realism ও romanticism-এর মিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে,

তাঁর মধ্যে রোমান্টিক কবির ধর্ম সম্পর্কে ভাব-বিলাসিতাও দেখি যা যুগে যুগে মানুষের জীবনে এ ধরণের অনুভূতি আসে। বড় বড় লেখকদের মধ্যে realism এবং romanticism এর সমন্বয় দেখি। যেমন বালজাক realist ছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু তিনিই আবার "La Peau de Chagrin" লিখেছেন। টুর্গেনিভ-গোগল থেকে শেখভ-বুনিন পর্যন্ত বিখ্যাত রুশ লেখকদের লেখায় romanticism-এর প্রভাব রয়েছে। বস্তুতন্ত্রতা (realism), স্বভাবতন্ত্রতা (naturalism), ব্যক্তিতন্ত্রতা (individualism), এবং বিশ্বতন্ত্রতা (humanism)র সমবায়ে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে নজরুল-সাহিত্য সেই সাহিত্যের তালিকাভুক্ত।

"অগ্নিবীণার" মধ্যে চপল, উদ্দাম, উচ্ছ্বাস যে ছিল "দোলন-চাঁপায়" তা শান্ত মধুর সুরে পরিব্যাপ্ত। ভাঙনের রুদ্র সুর এখানে আছে বটে, কিন্তু নির্মাণের বলিষ্ঠ উল্লাসে কবি উল্লসিত হয়েছেন—

ঃ গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিণাক-পাণির শূল আসে।
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উটাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

(আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে : দোলন চাঁপা)

যে আগুন বিদ্রোহীর তূণ ফুঁড়ে ফিনকি দিয়ে সৃষ্টি জ্বালিয়ে দিতে বেরিয়েছিল সে আগুন এখানে সৌন্দর্যের হাট পেতেছে—

ঃ আজ হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন
মদন মারে খুন-মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক্-বাসে
গো দিগ্‌বালিকার পীতবাস;
আজ রঙন এলো রক্তপ্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

(ঐ)

বিদ্রোহী কবি সৌন্দর্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর এ সমর্পণ

অতি সুন্দর মর্মন্তুদ আত্মসমর্পণ—আত্ম প্রাধান্যের উন্নত ধ্বজা মাটিতে লুটিয়ে স্নিগ্ধ-করুণার উৎস সৃষ্টি করেছে।—

ঃ প্রিয়! এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে।
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে॥
তোমার আঁখি কাজল-কালো
অকারণে লাগ্‌ল ভালো
লাগ্‌ল ভালো,
পথিক আমার পথ ভুলালো
সেই নয়নের জলে।
আজ্‌কে বনের পথ হারালেম ঘরের পথের ছলে।
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে॥
... ...
আপন মালা পরাও বালা পরাও আমার গলে।
এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে॥

(সমর্পণ: দোলন-চাঁপা)

চপল-সাথী প্রিয়তমাকে কবি তাই অনুরোধ করেছেন—

ঃ প্রিয়! সাম্‌লে ফেলে চ'লো এবার চপল তোমার চরণ!
তোমার ঐ চলাতে জড়িয়ে গেছে আমার জীবন-মরণ॥

(চপল-সাথী: দোলন-চাঁপা)

কবির সমর্পণের মধ্যে মান-অভিমান অভিশাপ সবই আছে—

ঃ যে দিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছ্‌বে!
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝবে!
... ...
আসবে আবার আশিন-হাওয়া, শিশির-ছেঁচা-রাত্রি,
থাক্‌বে সবাই—থাক্‌বে না এই মরণ-পথের যাত্রী!
আস্‌বে শিশির-রাত্রি!
... ...

ফুটবে আবার দোলান-চাঁপা চৈতী-রাতের চাঁদ্‌নী,
আকাশ-ছাওয়া তারায় তারায় বাজ্‌বে আমার কাঁদ্‌নী
চৈতী-রাতের চাঁদনী।
ঋতুর পরে ফির্‌বে ঋতু,
সেদিন—হে মোর সোহাগ-ভীতু!
চাইবে কেঁদে নীল নভো গা'য়
আমার মতন চোখ ভ'রে চায়
যে তারা, তা'য় খুঁজবে—
বুঝ্‌বে সেদিন বুঝ্‌বে!

(অভিশাপ: দোলন-চাঁপা)

ভাষার ঐশ্বর্যে কবিতাটি অনুপম! অনুভূতির গভীরতা গাম্ভীর্য এনেছে, এনেছে গভীর বিষণ্নতা। অভিশাপের মধ্য দিয়ে যে একটা স্বচ্ছ দৃষ্টি, এর নজীর বাংলা-সাহিত্যে তেমন বেশী নেই। মান-অভিমান ভাঙাভাঙির পর কবি প্রিয়ার কাছে প্রার্থনা করেছেন—

: যেন আর না কাঁদায় দ্বন্দ্ব বিরোধ, হে মোর জীবন-স্বামী!
এবার এক হয়ে যাক প্রেমে তোমার তুমি আমার আমি!
আপন সুখকে বড ক'রে
যে দুখ পেলেম জীবন ভ'রে
এবার তোমার চরণ ধ'রে
নয়ন-জলে ভেসে
যেন পূর্ণ ক'রে তোমায় জিনে সব-হারানোর দেশে,
মোর মরণ-জয়ের বরণ-মালা পরাই তোমার কেশে!
আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ-বিদায়ের শেষে॥

(শেষ প্রার্থনা : দোলন-চাঁপা)

নজরুল যৌবনের কবি। যৌবনের যে দিকটা রুদ্রের মত ধ্বংস মাতাল, সেদিকের পূর্ণ প্রতীক নজরুল (যা 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু', 'ভাঙার গান', 'বিষের বাঁশী', 'প্রলয়-শিখা'য় দেখেছি) আবার যে দিকটা সৃজনের আকাঙ্ক্ষায় প্রেমিক হতে হয় সেদিক দিয়েও তিনি অতুলনীয়। 'ছায়ানটে' তাই দেখছি—

ঃ হে মোর রাণি। তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।
আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হ'য়ে ওঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হার মানা-হার পরাই তোমার কেশে॥
... ...
যত তৃণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে,
আমি বিজয়ী আজ নয়নজলে ভেসে॥

(বিজয়িনী)

'দোলন-চাপা'য় যে প্রেমের মধ্যে ছিল মান-অভিমানের পালা, 'ছায়ানটে' যে-প্রেম দাঁড়িয়েছে মিনতির পসরা নিয়ে, 'সিন্ধু-হিন্দোলে'র 'সিন্ধু', 'অ-নামিকা', 'মাধবী প্রলাপ', 'গোপন-প্রিয়া প্রভৃতি কবিতায় সেই প্রেম দেহের বাসনা নিয়ে ফুটে উঠেছে। সেজন্যে কবি চাঁদের কলঙ্কের মধ্যে ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ দেখেছেন; 'চক্রবাকে'র 'এ মোর অহঙ্কারে' ঈদের প্রথম চাঁদকে প্রিয়ার কানের পার্সি-দুল হিসেবে দেখেছেন। এ সব ভাব বাংলা-সাহিত্যে নতুন না হলেও (গোবিন্দ দাস, মোহিতলালের মধ্যে দেহারতির পরিচয় নজরুলের পূর্বে পেয়েছি) সেগুলিতে কবি-প্রাণের সাহসের পরিচয় আছে। যে সব নীতিবাগীশের দল বিজ্ঞানসম্মত সত্যেও দুর্নীতির ছোঁয়াচ, অসংযম, অশ্লীলতা আবিষ্কার করেন, তাঁদের সেই বিচারের মাপকাঠিতে কাব্য-সমালোচনা করতে গেলে সাহিত্য ও মানবজীবনের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে তাকে অস্বীকার করতে হয়। তাঁর যখন 'মাধবী-প্রলাপ', 'অ-নামিকা' বেরুল তখন সমাজের ধনুর্ধররা অশ্লীলতার গন্ধ পেয়ে 'গেল গেল' রব তুলেছিলেন। প্রেমের কবিতার মধ্যে কামের গন্ধকে যদি অশ্লীলতা বলেন তাহলে শুধু গাঁ নয়, পৃথিবী শুদ্ধু উজাড় হয়ে যাবে। মানুষমাত্রের মধ্যেই যে আদিম উদ্দামতা আছে, প্রেমের কবিতার এটাই হোল প্রাণ। নজরুলের কথায়—'সুন্দরী বসুমতী চিরযৌবনা দেবতা ইহার শিব নয়—কামরতি। তাই প্রেমের মধ্যে তিনি সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ মানেন নি; তাঁর কাছে প্রেম অসুন্দরকেও সুন্দর করে। তাঁর দৃষ্টিতে তাই বারাঙ্গনাও মা হিসেবে শ্রদ্ধা পায়—

: কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে ?
হয়ত তোমার স্তন্য দিয়াছে সীতাসম সতী মায়ে।
না-ই হ'লে সতী তবু ত তোমার মাতা-ভগিনীরই জাতি,
তোমাদের ছেলে আমাদের মত, তারা আমাদের জ্ঞাতি
আমাদেরই মত খ্যাতি-যশ-মান তারাও লভিতে পারে,
তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ দ্বারে।—

(বারাঙ্গনা—সাম্যবাদী : সবহারা)

তাই অস্কার ওয়াইল্ড্ বলেছেন, "There is no such things as obscene literature. Books are either well written or badly written. That's all." গোঁড়া সমালোচকের মাপকাঠিতে নজরুল immoral হতে পারেন কিন্তু তাথাকথিত moralit'yর নামে প্রেমকে ধর্ম ও নীতির মুখোশপরা মিথ্যার ওপর দাঁড় করাননি। তাই নজরুল প্রকৃত রসস্রষ্টা।[1]

প্রেমের মধ্যে মিলন ও বিরহ দুই-ই রয়েছে। মিলন ক্ষণিকের, বিরহ অনন্তের। বিরহ রয়েছে বলে প্রেম এত সুন্দর, দুঃখ আছে বলেই সুখের মাহাত্ম্য মানুষ উপলব্ধি করে বেশী করে। কেননা, প্রেমের অমৃত-দীপ-শিখাটিকে আগ্রহের স্নেহরসে প্রোজ্জ্বল করে রাখে এই বিরহ, ভবিষ্যৎ সুখ সম্ভাবনার একটি গভীরতর আনন্দের প্রেরণাকে জ্বালিয়ে রাখে এই দুঃখ। উজ্জ্বল ভাষ্যের ভাষায়, 'অত্র দুঃখে সুখধর্ম এবানুভূয়তে নতু দুঃখধর্ম'। এই কথাই বলেছেন দার্শনিক শ্লেগেল (Schlegel) 'Lectures on Dramatic Art and Literature গ্রন্থে। বলেছেন, 'There is no bond of love without a separation, no enjoyment without the grief of losing it.' বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে এরই নাম 'বৈয়াগ্র' অর্থাৎ উৎকণ্ঠা। তাই বিচ্ছেদ-বেদনাপূর্ণ মিলনের পাত্র থেকে যে গান উত্থিত হয় সেই গান তত মধুর। এই গানেই মোহিত হয়ে কবি শেলী গেয়েছেন, 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.' এই হোল গীতি কবিতার রস। তাই নজরুলের 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাসের মধ্যে দেখেছি তরুণ প্রেমের করুণ কাহিনী, 'আলেয়া' নাটকে পেয়েছি তিনটি পুরুষ তিনটি নারীর ভালবাসার আগুনে দগ্ধ হওয়ার কাহিনী। 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক,' 'নতুন চাঁদ' প্রভৃতি কাব্যের কতকগুলি কবিতায় (যেমন, 'সিন্ধু', 'গোপন-প্রিয়া', 'পথচারী', 'গানের আড়াল', 'চির জনমের প্রিয়া',

'নিরুক্ত', 'আর কতদিন' প্রভৃতি) নিঃসঙ্গ-বিধুর হৃদয়ের গভীর বেদনার ইতিহাস রয়েছে। প্রেমের এই বেদনা থেকেই যে মানুষের আদিকাব্যের উৎপত্তি। কবি বাল্মীকির কাছে ক্রৌঞ্চ যুগলের মিথুন-বিলাস মনকে যতটা আনন্দিত না করেছিল তার চেয়ে বেশী মনকে ভাবাক্রান্ত করেছিল ব্যাধের শরে ক্রৌঞ্চের বিয়োগের পর ক্রৌঞ্চীর বিলাপে। সে-বেদনার মধ্য দিয়ে প্রেমের চিরন্তন সত্য জন্ম নিল, আদিকাব্যের প্রথম শ্লোক বাল্মীকির মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল। সীতা, দ্রৌপদী, শকুন্তলা' যক্ষপ্রিয়ার মধ্যে প্রেমের গভীরতম বেদনার এই অনুভূতি পুঞ্জীভূত ও কেন্দ্রীভূত হয়েছে বলেই 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত' প্রভৃতি স্থায়ী সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। এই ব্যথা-বেদনায় জীবন তাঁদের কাছে তিক্ত হয় নি, বরং জীবন তাঁদের কাছে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন ক'রে দিয়েছে, মন ঐ করুণ সুরের মর্মস্থলে বৈচিত্র্যকর জীবনের সন্ধান পেয়েছে। প্রেম ও বিরহের বিষণ্ণতা নজরুলের কবি-মনকে সঙ্কুচিত করেনি বরং নিঃসীম ব্যাপ্তি দিয়েছে। তাঁর বিরহ-গাঁথার মধ্যে বাণীর ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বিরহের মধ্য দিয়ে বীর্যের সঙ্গে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার একটা মোলায়েম অথচ সুতীব্র নেশা আছে।

বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মন একসূত্রে গ্রথিত—মানুষের স্পর্শকাতর চিত্তে প্রকৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। তাই প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেন না এমন কোন কবি নেই; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অবশ্য খুবই অল্প, এঁরাই বিশেষ করে প্রকৃতির কবি, যেমন Wordsworth। পঞ্চেন্দ্রিয়-সাক্ষী সুন্দরী প্রকৃতি নজরুলের সাহিত্যে খুব বড় একটা স্থান লাভ করেনি; কিন্তু তা' বলে প্রকৃতির প্রভাব তিনি যে একেবারে অস্বীকার করেছেন এমন কথা বলা যায় না। জীবন-রসের রসিক কবি নজরুল প্রকৃতি-প্রেমেও মাঝে মাঝে স্বপ্নমদির বিহ্বলতা যে অনুভব করেছেন তার স্বাক্ষর তার কাব্যের মধ্যেই চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। তার কাছে প্রকৃতির রূপ বর্ণনার চেয়ে প্রকৃতি প্রেমের উদ্দীপনা হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। যেমন—

ঃ ঘোমটা পরা কাদের ঘরের বউ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা?
তোমার চোখের দৃষ্টি জাগে হারানো কোন্ মুখের পারা॥
... ...

এই যে নিতুই আসা-যাওয়া
এমন করুণ মলিন চাওয়া,
কার তরে হায় আকাশ-বধূ
তুমিও কি আজ প্রিয়-হারা ॥

(সন্ধ্যা তারা : ছায়ানট)

ওগো ও কর্ণফুলী !
তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কান-ফুল খুলি ?
তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন্ তরুণী কে জানে,
'সাম্পান,'-নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে !
আন্‌মনা তার খুলে গেল খোঁপা, কান-ফুল গেল খুলি
সে ফুল যতনে পরিয়া কর্ণে হলে কি কর্ণফুলী ?

(কর্ণফুলী : চক্রবাক)

ওগো বাদলের পরী ।
যাবে কোন্ দূরে, ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরী !
ওগো ও ক্ষণিকা, পুব-অভিসার ফুরাল কি আজ তব ?
পহিল্ ভাদরে পড়িয়াছে মনে কোন্ দেশ অভিনব ?
... ...
ওগো ও কাজল-মেয়ে,
উদাস আকাশ ছলছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে !
... ...
সেথা রবে তুমি ধেয়ান মগ্না তাপসিনী অচপল,
তোমার আশায় কাঁদিবে ধরায় তেমনি 'ফটিক জল' ।

(বর্ষা-বিদায় : চক্রবাক)

: কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্বুদ, জোছনা সোনায় রাঙে ।
তৃতীয়া চাঁদের 'সাম্পানে' চড়ি' চলিছে আকাশ-প্রিয়া,
আকাশ-দরিয়া উতলা হ'ল গো পুতলায় বুকে নিয়া ।

নীলিম-প্রিয়ার নীলা গুল্-রুখ নাজুক নেকাবে ঢাকা
দেখা যায় ঐ নতুন চাঁদের কালোতে আবছা আঁকা।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রাণী,
'লায়লা'-সেহেলি দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি-মশারি টানি'।
নীহার-নেটের ঝাপসা মশারি, যেন 'বর্ডার' তারি
দিক্-চক্রের ছায়া ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি।

(চাদনি রাতে : নতুন চাঁদ

: দিবা চ'লে যায় বলাকা-পাখায়
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়।
কেঁদে চখা-চখী মাগিছে বিদায়
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরী॥
সাঁঝে হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে
ছায়াপথ সিঁথি রচি' চিকুরে,
নাচে ছায়া-নটি কানন পুরে,
দুলে লটপট লতা-কবরী॥
... ...
কালো হয়ে আসে সুন্দর নদী,
নাগরিকা সাজে সাজে নগরী।

বুলবুল ১ম

: চাঁদের পিয়ালাতে আজি
জোছনা-শিরাজী ঝরে।
ঝিমায় নেশায় নিশিথিনী
সে শারাব পান ক'রে।

(গীতি শতদল)

এইসব উদ্ধৃতি থেকেই বুঝতে পারি যে Eternal verities নিয়ে ব্যস্ত থাকার মত মনঃসঙ্কলন নজরুলের ছিল, ভূয়োদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে রূপদর্শনের ক্ষমতাও তাঁর আয়ত্তাধীন।

রস ও সৌন্দর্য সৃষ্টি যা কিছু সাহিত্যের প্রাণবস্তু হোক না কেন মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা যখন সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করে, তখন সে রস ও সৌন্দর্য

মানুষের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই জন্ম নেয়; কঠিনতার মধ্যে যে সৌন্দর্য ফুটে উঠে তার প্রমাণ নজরুলের 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা', 'প্রলয়-শিখা', 'ভাঙার-গান', 'বিষের বাঁশী', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি কাব্য। দুঃখ-পীড়ন লাঞ্ছনার মধ্যেই আনন্দের সন্ধান দেন কবি। অনাগত সুদিনের তরে শত উৎপীড়ন-নিপীড়নকে জয় করেই কবি অমৃতের গান শোনান। কালিদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা' বলেছিলেন তা নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় কবিকুলের অন্তরের গানও হলো তাই—

ঃ জীবনমন্থনবিষ নিজে ক'রি' পান,
অমৃত যা উঠেছিল ক'রে গেছ দান।

(কাব্য ঃ চৈতালী)

নানা দুঃখ, আঘাত, অনাদর, অপমানের মধ্যে থেকে নজরুল এই অমৃত পরিবেশন করেছেন, 'কাল ভয়ংকরের বেশ' সুন্দরকে দেখেছেন বলেই সে-সময়কার পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিছু পরিমাণে ফিকে হয়ে গেলেও সেসব বই আমরা মুগ্ধচিত্তে পড়ি।

সত্য-সুন্দরের পরিচয় তর্ক সিদ্ধান্তের দ্বারা হতে পারে না, সেটা reason-এর কাজ নয়, সেটা soul-এর কাজ। তাই "The sequence of literature is emotional, not logical" সুন্দরকে যেখানে এই soul দিয়ে তিনি অনুভব করেছেন সেখানে তর্ক-বিতর্ক আসেনি, মানুষের অন্তশ্চর sensitive সাড়া দিয়ে উঠেছে, যেমন প্রেম ও প্রকৃতি সম্পর্কে কবিতা ও গান। যখন তিনি logic দিয়ে সুন্দরকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন সেটা মানুষের মনের বুদ্ধিজাত আবেদনকে পুষ্ট করেছে, যেমন 'সর্বহারা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান' প্রভৃতি বিদ্রোহাত্মক কাব্য।

ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ বলেছেন যে আমাদের সত্যোপলব্ধি দু'প্রকারে হয়ে থাকে—জ্ঞান ও অনুভূতির সাহায্যে। জ্ঞানের দ্বারা যে সত্যোপলব্ধি তা মানুষকে স্তম্ভিত করে বটে, কিন্তু মানুষের মনকে তৃপ্ত করে না। যেমন মহাকবি গ্যেটের ফাউষ্ট চরিত্র, বিপুল তার ঐশ্বর্য, অফুরন্ত তার জ্ঞানভাণ্ডার, অমেয় তার শক্তি, যা কিছু আকাঙ্ক্ষার, যা কিছু কামনার সবই তার হস্তগত তবুও তার অন্তরাত্মা চিরক্ষুধিত। জ্ঞানের সহিত মানবমনের এইরূপ দ্বন্দ্ব

আছে বলে শিল্প ও সাহিত্যের প্রযোজন হয়। কারণ শিল্প-সাহিত্য অনুভূতির সাহায্যে এই দ্বন্দ্বকে ঘোচাতে সাহায্য করে, হৃদয়ের সঙ্গে জ্ঞানের পার্থক্য ঘুচিয়ে একে জীবনের অঙ্গীভূত ক'রে ফেলে। নজরুল যদি জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সত্যের দ্বারা উপলব্ধিকে এই হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ না করতেন তাহলে তাঁর কাব্যগুলির আবেদন অনেক আগেই সোরগোল তুলে বিদায় নিত—যেমন স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের যুগে অনেক কবির ভাগ্যে এই বিধান ঘটেছে। তাঁদের কাব্য মানুষের অন্তরের সাময়িক আবেগকে তৃপ্ত করতে চেষ্টা করেছে, সময়ের বুদ্ধিসর্বস্বতাকেই আঁকড়ে রয়েছে কিন্তু মানব-মনের গভীর গহন কক্ষের অন্ধকার তাঁদের প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। সাহিত্য সৃষ্টি যখন বাস্তবের সত্যকে চিরন্তন সুন্দরের সঙ্গে মেশাতে পারে তখনি তা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। বস্তুর স্বরূপ অর্থাৎ সমগ্রতা দর্শনই সৌন্দর্যদর্শন। জীবনের সমগ্ররূপ সম্বন্ধে এই চেতনাই (totality of experiences) মহৎ কাব্যের প্রাথমিক স্বীকৃতি। নজরুলের সাহিত্যসৃষ্টি সেই সমগ্রতাবোধের ইংগিত বহন করে। তাঁর যুগে তিনিই হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে সত্যের উপলব্ধি সত্যের প্রেরণাকে সুন্দরের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সত্য ও সুন্দরের অর্থাৎ realism-এর truth এবং feeling-এর অপূর্ব সমতা রক্ষা হয়েছে তাঁর প্রতিভায়। তাঁর প্রতিভায় এই যে অপূর্ব সমতা রক্ষিত হয়েছে তার কারণ হল subjective ও objective দৃষ্টির একত্র মিলনে যে দিব্যদৃষ্টি ফুটে ওঠে তারই প্রভাবে। দুঃখ-বেদনার ভাব বহন করেও হৃদয়ের গোপনে যে স্বপ্ন পুষ্পের মত ফুটে উঠে তাকে তিনি প্রভাতের আলোয় প্রকাশ করেছেন। তিনি pessimist নন, তিনি robust optimist। হাজার উৎপীড়নের মধ্যে জীবনের ওপর বিশ্বাস তাঁর আলগা হয়নি, মানুষের ওপর তাঁর বিশ্বাস হারায়নি বরং মানুষের সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি কল্পনা করে সম্ভাষণ করেছেন আগামী দিনের মানুষকে—যারা পদানত মানুষের কাছে নিয়ে আসবে স্বাধীনতা, ধ্বংস করবে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। এই যে এষণা, এই যে অনুভূতির তীব্রতা, জীবনের প্রতি গভীর প্রেম, মানবের জন্যে অনন্ত ভালবাসা, মানুষকে উন্নততর মহত্তর করবার জন্যে বিপুল আবেগ, দুর্বার চেষ্টা, তাঁর সাহিত্যের আদর ও প্রতিপত্তির মূল

এইখানে। তাই 'The touch of truth is the touch of life'—একথা যে কতখানি সত্য তা নজরুলের কাব্য পাঠ করলেই বোঝা যায়।

নজরুলের কবিতায় আপাতদৃষ্টিতে দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে মনে হবে—কেননা একবার তিনি সুন্দরকে ভৎ'সনা করেছেন আর একবার তার জয়গান গেয়েছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় তাঁর এই দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে অনেকে কবিতাটির প্রধান ত্রুটি বলে নির্দেশ করেন। তাঁর কাব্যে কামনা, বাসনা, মোহ, প্রেম, সংগ্রাম, সংশয় সব আছে শুধু সত্য-সুন্দরের সুর বেজে উঠবে ব'লে। কোনখানে সেটা presentiment-এর মত (যেমন 'বিদ্রোহী'), কোনখানে sensuousness-এর মতো (যেমন 'সিন্ধু', 'অ-নামিকা', 'মাধবী-প্রলাপ', 'চক্রবাক', 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরু সারি', 'গানের আড়ালে', 'এ মোর অহঙ্কার', 'নিরুক্ত,' প্রভৃতি কবিতা), কোনখানে তা অসীম অনিবচনীয় হয়ে উঠেছে (যেমন 'বুলবুল', 'চোখের চাতক', 'জুলফিকার', 'গুলবাগিচা', প্রভৃতি গানের বইতে)। সাধক যেমন তাঁর ইষ্টমন্ত্রকে সকল সাধনায় সাধন করতে চান, নজরুল তেমন তাঁর মন্ত্রদৃষ্টিকে প্রকৃত কবির মত বহু বিচিত্র তত্ত্বের অধীন ক'রে সাধনা করেছেন, কেননা জীবন একরঙা ছবি নয়, তার পর্দায় পর্দায় যে বহু রঙের বিকাশ! তাঁর একই মানস-মণিকে সকল দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ভাষা, ভঙ্গী ও সুরে যে নতুন নতুন রশ্মিপাত করেছে তাতে অনেক সমালোচক ভাবের ঐক্য খুঁজে পান না। এ তাঁর ত্রুটি নয—সৃষ্টির প্রাণ-প্রাচুর্যকে সাধনা করার প্রয়াস, বৈচিত্র্যের সমন্বয়ই যে সৌন্দর্যের প্রাণমন্ত্র। এই যে অফুরন্ত সৃষ্টির উৎসব, এই যে এক বাঁশীতে নানারকম সুরের উদ্বোধন, এই যে কবি-প্রাণের উল্লাসময় বহু বিচিত্র নৃত্য-ভঙ্গী—সেই 'এক'-কে পাবার মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে। সেই 'এক' হল,—সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্।

অপরিণত মনের অনেক ছেলেখেলা তাঁর রচনায় রয়েছে, চিত্ত চাঞ্চল্যের জন্যে রুচি নিখুঁত না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধ ফুটে ওঠেনি সত্য; কিন্তু তিনি তাঁর কতকগুলি কবিতা ও গানে সৌন্দর্যকে প্রাত্যহিক সংসারের আওতার মধ্যে এনে সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্ব, অসুন্দরের মধ্যে সৌন্দর্য, হীনতার মধ্যে মহত্ত্বের যে পরিচয় দিয়াছেন তা বাংলা-সাহিত্যে রেখাপাতের দাবী রাখে। যা অস্ফুট, যা অতীন্দ্রিয় তাতে তাঁর প্রতিভা খেলা করেনি। তাঁর কারণ হোল—

: —মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি ! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হ'য়ে জায়া হ'য়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশী ?
কোথা পাব অনিন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব ?—ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করিছে পান নয়ন-নির্যাস।···

(দারিদ্র্য : সিন্ধু-হিন্দোল)

এই অপ্রাকৃতিক সুন্দর বিশ্বকে ছেড়ে বিশ্বাতীত সৌন্দর্যের কবি তিনি নন, কেননা সংসারের নিত্য সংগ্রাম ও কর্মক্ষেত্রে থেকে দূরে বসে শুধু বাঁশী বাজিয়ে আরামের বিলাস-জীবন তিনি কখনো যাপন করেননি ; দেশ জাহান্নমে যাক, চারধারে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলুক আর নীরোর মত ঘুরে বসে বীণার তারে আঁচড় দিয়ে কল্পলোকের জাল বোনার স্বপ্ন তাঁর ছিল না। দুঃখ-ব্যথা বেদনায় উদাসীন বৈরাগ্যের মত নির্লিপ্ত নির্বিকার শান্তির বাঁধা বুলি আওড়াননি তিনি। তাই চিরকালের যা প্রকৃত, যা নিত্যের প্রত্যক্ষ, যা সহজে প্রাপ্ত, তাতে যে রস ও যে সৌন্দর্য থাকে, নজরুল সেই রসের রসিক, সেই সৌন্দর্যের কবি।

ভারত আজ স্বাধীন হলেও মানুষের মানসিক পটভূমি আজও শান্ত হয়নি ; বাঁচার জন্যে কাঠ-খড-কেরোসিনের সন্ধানে মানুষ আজ সদা-বিব্রত, অভাব-অনটন, অত্যাচার-অবিচার ইত্যাদির পীড়নে সে আজ নুব্জপৃষ্ঠ। তাই ক্ষুধার গদ্যময় রাজ্যে নজরুলের সর্বহারাদের নিয়ে বিষ-বেদনায় সকরুণ আলেখ্যর আবেদন আজও কমেনি। অনাগত ভবিষ্যতের সুস্থ সমাজগঠনে মানুষ আজও তার থেকে প্রেরণা পেয়ে থাকে। নিষ্করুণ সংগ্রামের মধ্যে সুন্দরের জয়গান তাই আজও তার কাছে পাগলের অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে মানুষের আশ্চর্য কারখানা হচ্ছে এই মন। Conscious মনের ওপর রুটির চিন্তা সব সময়ে থাকলেও Sub-conscious মনের ওপর চাঁদকে সব সময়ে কাস্তে বলে মনে হয় না—সে-মন তখন প্রেম দিয়ে বাঁধা, আশা দিয়ে ঘেরা একটি স্বপ্নের কুটির রচনা করতে চায়। তাছাড়া ঋতু-পরিবর্তনের

মত এই বুড়ো পৃথিবীও আবার একদিন শস্যশ্যামলা শান্তির আবাস হবে, তার চেহারায় আসবে নবীন বীর্যের উন্মাদনা, আসবে সেই প্রেম যে-প্রেম আজ ফল্গুধারার মত তাঁর মনের মধ্যে মিলিয়ে আছে। সেদিন মানুষ নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বালিরাশি সরিয়ে সেই স্বচ্ছতোয়া বারির সন্ধান করবে। তখন বিদ্রোহী নজরুল, সাম্যবাদী নজরুল, সবহারাদের কবি নজরুলের কোন মল্য থাকবে না—-বিগত চিন্তানায়কের দৃষ্টান্ত হিসেবে রসগ্রাহীর উপেক্ষণীয় হয়ে ঐতিহাসিকের প্রিয় হবেন। কবি নজরুল সেই দূরকালের শংখধ্বনি একালেই করে রাখলেন।

প্রেমিক কবি নজরুল

কোন কবির নামের আগে যদি কোন বিশেষণ জুটে তাহলে সেটি সেই কবির বিরল সৌভাগ্যের কথাই বলতে হবে কারণ সে-রকম খুব কম কবির ভাগ্যেই ঘটে থাকে; আর প্রদত্ত বিশেষণটি উচ্চারণ করলেই সেই নির্দিষ্ট কবিকে অনায়াসেই সূচিত করা যায়। তবু এটিরও একটি দুর্ভাগ্যের দিক রয়েছে কারণ আমাদের অভ্যস্ত বিশেষণ কবিকে চিহ্নিত করলেও কবি-কৃতির পূর্ণ পরিচয় বহন করে না। সাধারণের মধ্যে তাঁর খণ্ডিত দিকটির পরিচয় থেকে যায় এবং সময় সময় সেটি শিক্ষিত সমাজকেও প্রভাবিত করে। এত সব কথা আজ মনে পড়ল নজরুলের কবিতা পড়তে গিয়ে। বিদ্রোহী কবি বললে যে একমেবাদ্বিতীয়ম কবিকে বোঝায় এবং তাঁর যে-রূপটি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় সেটিই তার একমাত্র পরিচয় নয়, এর বাইরেও রয়েছে তার কবি-মানস যা তাঁর সৃষ্টির মঞ্চে সাফল্যের মালা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে, তিনি যে মানব-মনের চিরন্তন আকুলি-বিকুলি, প্রেম-বিরহ, ব্যথা-বেদনার মধুময় মুহূর্তের রূপ সার্থকভাবে ফুটিয়ে আমাদের মন ভুলিয়েছেন এ পরিচয় আমাদের অনেকেরই অগোচরে রয়ে গেল। সভা-সমিতিতে, পত্র-পত্রিকায় কবির বিদ্রোহী কবি-সত্তার আলোচনা এত বেশী হয়েছে এবং তার জ্বালাময়ী কবিতা আমাদের বাস্তব-প্রয়াসী মনে এত বেশী স্থান পেয়েছে, কবি যে কোন কালে প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা লিখেছিলেন সেটি হঠাৎ কেউই চট করে বিশ্বাস করতেই চাইবেন না। যুগের 'হুজুগে কবি'র পরও তিনি যে যৌবনের কবি সে-বিষয়ে আমরা প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। অবশ্য একথা মানা ভাল যে তাঁর বিদ্রোহের রূপ তাঁকে সাহিত্য-সমাজে এত বেশী পরিচিতি দিয়েছে এবং সে-ক্ষেত্রে তিনি যেরূপ অনন্যতা দেখিয়েছেন সেটির মত বাংলা প্রেম-কবিতার সুবিপুল ঐতিহ্যে প্রখর উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, আমাদের সাহিত্যে প্রেমের কবিতার অভাব নেই, আত্মপন্থী প্রেমের কবিতা উপভোগের জন্যে বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরের উত্তরসাধকদের গীতিকাব্যের ব্যাপ্তি

ও গভীরতায় আমরা এমনি রসাপ্লুত হয়ে পড়ি যে নজরুলের প্রেমের কবিতার রোমান্টিসিজমের মুগ্ধ হবার আগ্রহই থাকে না। নজরুল-সাহিত্যের পাশাপাশি এই দুটো ধারার পরিচয় না রাখলে তাঁর কাব্য-প্রতিভার সার্বিক মূল্য-বিচার সম্পূর্ণ হবে না।

নজরুল কোন ধরা-বাধা পথে পদচারণা করেন নি—বাধাবন্ধনহারা দুরন্ত বালকের মত সবকিছু আচার-বন্ধন, নিয়ম-কানুন ভেঙে পথ তৈরী করেছেন। তাঁর কবিতার এই বৈশিষ্ট্য প্রেমের কবিতাতেও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। যে তারুণ্যের জোরে তাঁর শির উন্নত, চির-দুরন্ত, দুর্মদ তিনি, সেই তারুণ্য বন্ধনহারা ষোড়শী কুমারীর প্রেমেও উদ্দাম, চঞ্চল মেয়ের ভালবাসায় মুখর। বাঙলার মজ্জাগত রোমান্টিসিজমের প্রভাবকে তিনি এড়িয়ে চলতে পারেন নি। বাঙলার মাটির এমনই গুণ যে এখানে ওজগুণসম্পন্ন কবিতা লিখলেও কোন-না কোন মুহূর্ত কবিকে উদ্বেল করে তুলবেই। যে মধুসূদন বীররসের অবতারণার জন্যে লিখতে চেয়েছিলেন "মেঘনাদ বধ", শেষ পর্যন্ত সেটি তো করুণরসে পরিণত হলই উপরন্তু সেই কবিকে "ব্রজাঙ্গনা" লিখে বাঙলার ঋণ শোধ করতে হল। জাতীয় কবিতা ও সঙ্গীতে নজরুলের ভাষা যেমন অগ্নিস্রাবা, প্রেম-বিরহের কবিতাতেও তেমনি তাঁর ভাষা অশ্রুসিক্ত। তাঁর হৃদয়-বেদনার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রকৃতি একাত্ম হয়ে গেছে। তাঁর কাব্য-চরিত্রের এই দুটি দিক পরস্পর বিরোধী সত্তা নয়, একটি মৌল প্রত্যয়, কারণ যে স্পর্শ-চঞ্চলতা ও ভাবালুতা তাঁকে বিপ্লবী করেছিল সেই প্রাণময়তাই তাঁকে প্রেমিক ও হৃদয়ধর্মী করেছে। তাঁর সাহিত্যের স্বরূপ যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; কবি সে-কথা নিজেই উল্লেখ করেছেন এইভাবে—

: দেখেছিল যারা মোর উগ্ররূপ,
অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি!
হে সুন্দর, বহ্নি-দগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়াছিলে "বসন্তের" পুষ্পিত মালিকা!

(অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি : নতুন চাঁদ)

তাঁর প্রেমের কবিতার সংখ্যা কম নয়, প্রণয়-গীতিও অসংখ্য।

॥ ২ ॥

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার দর্পণে নরনারীর প্রেমতৃষ্ণা বর্ণিত হলেও তা প্রধানতঃ 'বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান', লৌকিক রাগানুরাগের সঙ্গে তার সংযোগ অশাস্ত্রীয়। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন, "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের যে প্রণয় ও রতির উল্লেখ আছে তাহাতে দেখা যায় যে সেই রতি, দেহজ রতি নয়, তাহা অপ্রাকৃত রতি, অপ্রাকৃত বিহার।" (রবি-দীপিতা) ধর্মীয় তত্ত্বরসের গন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ সাহিত্য হিসেবে উপভোগের চাইতে বেশী করে উপভোগ করে মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ কিছু পুণ্যলাভের আশায়, কারণ পদাবলী কর্তারা কাব্যরচনার জন্যে পদাবলী রচনা করেন নি, করেছেন বৈষ্ণবধর্মের প্রধান অঙ্গ হিসেবে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সবাবতার শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান আর শ্রীরাধা সেই ভগবানের পরাশক্তি। প্রেমানুভূতির পরিপূর্ণতা প্রেমেই, কোন বৃহত্তর ব্যাখ্যায় অর্থাৎ ভাগবতী অভিমুখীনে প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা তাতে আছে। রবীন্দ্র-নাথের প্রেমবোধ বৈষ্ণব-কাব্যের মত রূপকপরায়ণ বক্রার্থনির্ভর না হলেও তাঁর কাব্যের আবেগ নির্দোষ, পরিশীলিত এবং তাঁর মন অতিরিক্ত রকম আধ্যাত্মিক, দেহ-চেতনার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে, তাতে প্রেমের নিরবয়ব ভাব-রাজি নিয়ে ব্যস্ত থাকার নিরন্তর প্রয়াস লক্ষ্য করি। দেহের স্বাভাবিক কামনার তাগিদকে অন্তরালে রেখে যে প্রেমের কবিতা তিনি লিখেছেন তার মধ্যে যৌবন-স্বপ্ন থাকলেও রক্ত-মাংসের দেহগত বাসনার চিত্র নেই, থাকলেও মূল সৃষ্টির সঙ্গে তা গভীরভাবে যুক্ত নয়। বরং বলেছেন 'নিভাও বাসনা-বহ্নি নয়নের জলে।' তাঁর দেহাতীত আদর্শায়িত প্রেমকবিতা একেবারে নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি গভীরতর প্রেমস্বপ্ন রচনা করেছে। প্রেমকে তিনি যে-চোখে দেখেছেন বা যে-ভাবে পেয়েছেন যুদ্ধোত্তর যুগের তরুণদের কাছে জীবনের অন্যান্য ধ্যান-ধারণার মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সেই ভদ্র শালীন চেহারা আর রইল না। কাজেই যুদ্ধোত্তর সমাজ-জীবনের তরুণেরা এরকম ঊর্ধ্বায়িন বাসনার প্রকাশ-ভঙ্গীকে মেনে নিতে পারলেন না, কল্লোল-

কাশিকলম-প্রগতির মাধ্যমে নতুন জীবনের মদির উপলব্ধির সংস্কারমুক্ত, কামনার আন্দোলন শুরু হোল। এব মধ্য থেকেই মোহিতলাল এগিয়ে এসে বলিষ্ঠ ভাষায় বললেন—

: ত্যাগ নহে, ভোগ,—ভোগ তারি লাগি' যেই জন বলীয়ান,
নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ।
যে জন নিঃস্ব, পঞ্জর-তলে নাই যার প্রাণ-ধন,
জীবনের এই উৎসবে তার হয়নি নিমন্ত্রণ।

(পাপ : স্বপন পসারী

কাজেই তাঁর কাছে "দেহই অমৃতঘট আত্মা শুধু যেন অভিমান"। নজরুলও সংস্কারমুক্ত দেহস্পর্শমুখর কামনার ছবি আঁকলেন—

: উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন-ক্ষুধা উদগ্র কামনা
জন্ম তাই লভি বারে বারে
না-পাওয়ার করি আরাধনা!...
যা-কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন,
যা-কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর—
সে-সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি!—ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে তিলে!
তোমায় যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে।
প্রকাশ গোপন।

(অ-নামিকা : সিন্ধু হিন্দোল)

এই আবেগতীব্রতার রূপায়ণের জন্য নজরুল ইসলাম প্রেমকাব্যে স্মরণীয়। কবি গোবিন্দদাসের রচনার মধ্যে এই তৃষ্ণা প্রত্যক্ষ সাবয়বী অধীরতা নিয়ে প্রকাশিত হলেও তৎকালীন কাব্য-ধারার তুলনায় তাঁর করণ-কৌশলের হাত এত মোটা ছিল, ভাষা এত অপকৃষ্ট ছিল যে সেটি খিস্তী-খেউড়ের কবিতায় পরিণত হতে বাকী রয়েছে। মোহিতলাল প্রেমের কবিতায় বিদগ্ধ মনের দেহবাদী দৃপ্তভঙ্গিমার শাক্ত সুর লাগালেও দার্শনিক ভাবগভীরতায় এমন একটি

প্রজ্ঞার ছাপ দিয়েছেন যা তরুণসুলভ উন্মাদনার চেয়ে চিন্তানিবিড় প্রৌঢ়ী স্বাক্ষর প্রধান হয়ে উঠেছে। নজরুলের প্রেমের কবিতা মোহিতলালের কোন কোন কবিতার কথা মনে করিয়ে দিলেও নজরুলের কবিতা যেখানে প্রেমোল্লাসে ঝর্ণার মত চপল, মোহিতলালের কবিতা সেখানে গভীর জলের মত গম্ভীর ; রবীন্দ্রনাথ সত্যেন দত্তের বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ পদলালিত্য শব্দঝঙ্কার তাঁর কবিতায় পাওয়া গেলেও অনতিবিলম্বে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর জোরে তাঁদের প্রভাব এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। জীবনানন্দের প্রেম শরীরী রক্ত-মাংসের হলেও তা যেন একটি বিষণ্ণতার স্পর্শে নিরুত্তেজ। প্রেমের মধুর তিমিরে মগ্ন থাকার মধ্যে কোথায় যেন সামান্যতম গ্লানি রয়েছে—এ ধারণা ছিল জীবনানন্দের অচিন্ত্যকুমারের। বরং নজরুলের স্বকালবর্তী কবি বুদ্ধদেব বসুর ভোগবাদে দুঃসাহসিকতার ছাপ রয়েছে। প্রেম করা যে গ্লানিকর বিষয় নজরুল তা মনে করেন না। কোন মানবীকে দেবীত্বে উন্নীত করেন নি—

ঃ চাইনা তোমায় স্বর্গে নিতে, চাই এ ধূলাতে
তোমার পায়ে স্বর্গ এনে ভুবন ভুলাতে !
ঊর্ধ্বে তোমার—তুমি দেবী
কি হবে মোর সেরূপ সেবি।'
চাহি না দেবীর দয়া, যাচি প্রিয়ার আঁখিজল,
একটু দুখে অভিমানে নয়ন টলমল।

(এ মোর অহঙ্কার ঃ চক্রবাক)

কাজেই তাঁর কবিতা প্রথম যৌবনের কবিতা, যে-মন সর্বপ্রথম চোখ খুলে তাকাচ্ছে, প্রকৃতির দিকে তাকাচ্ছে সেই বিস্ময়ান্বিত মনের কবিতা এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সেগুলি প্রেমের কবিতা এবং বিশুদ্ধ প্রেমকাব্য অর্থাৎ প্রেমের সঙ্গে আবেষ্টনী-চেতনা, ইতিহাসবোধ, রাজনৈতিক ধারণা মিলিয়ে কবিতা লেখেন নি। যে-যৌবনের পিছনে একটি নারীর প্রেম কাজ করতে থাকে সেই প্রেমের মানবীয় আবেগময় রসের তিনি শ্রদ্ধাবান কবি ; একটি তৃষিত চোখে একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকার যে ইচ্ছে হয় তাকে ঘিরে মনের রঙীন কল্পনা যে মিলন-বিরহের জাল বুনে চলে সেই মায়া-মদির আসক্তির বাঙ্ময় রূপকার তিনি। আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক কিংবা উপদেশমূলক তত্ত্বের সঙ্গে

হৃদয়কে বাঁধা রাখতে রাজী ছিলেন না বলেই তাঁর প্রেমানুভূতির মধ্যে কোন অস্বচ্ছন্দতা বা অস্পষ্টতা নেই ; তা বলে তাঁর প্রেমের কবিতা চটুল নয়, দুর্বল কামনার উগ্র প্রকাশ কবিতার মাধুর্যকে পীড়িত করেনি, অনুভূতির গভীরতা কবিতাগুলিতে গাম্ভীর্য এনেছে, এনেছে স্মৃতির ভারে গভীর বিষণ্ণতা। বিরহের বিভিন্নতা বয়স্ক মানুষের কাছে ভাববিলাসিতা হিসেবে উপহাসিত হতে পারে কিন্তু প্রতি মানুষের জীবনে এমন একটা বয়স আসে যে-বয়সে সঙ্গিনীর অভাবে পৃথিবীকে বিস্বাদ লাগে, জীবনটা ফাঁকা ফাঁকা বলে মনে ভাবতে বেশ ভাল লাগে—সেই বয়সের নীলাঞ্জন অনুভূতি দিয়ে তাঁর কবিতা উপলব্ধি করতে হবে। তাঁর প্রণয়ের সাধনবেগের প্রবলতা দীপ্তির ঔজ্জ্বল্যে সংদীপ্ত হলেও শিল্প-কর্মের দিক দিয়ে তাঁর স্বভাব-জাত সূক্ষ্মতার স্পর্শ পায় নি, কয়েকটি কবিতার নির্মিতি অতিমাত্রিক দুর্বল, কারণ যন্ত্রণাকে ধ্যানময় করে প্রত্যেকটি কবিতাকে শিল্পসম্মত করার মত প্রতিভা তাঁর ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কবি-কৃতিতে অপ্রবীণতা ঘুচেনি, শিল্প-প্রবীণতা আসেনি কিন্তু প্রেমকাব্য স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগের স্পর্শগ্রাহী বেগবতী প্লাবন আছে বলেই তাঁর প্রেম কবিতার আকর্ষণী প্রচুর।

যাঁদের পড়াশুনার পরিধি দূরবিস্তৃত তাঁরা তাঁর প্রেমের কবিতায় বায়রণের অন্তর্দাহপ্রতপ্ত আবেগ, কীটসের স্পর্শকাতর চিত্ররূপ, শেলীর আদর্শবাদের কাব্যিক সান্নিধ্য কম-বেশী অনুভব করবেন। তিনি প্রেমের মিলনের কবি নন, তিনি বিরহের কবি, ব্যথার কবি, চোখের জলের কবি। এ বিরহ রাধিকার ন্যায় বুক ভাঙা বিরহ নয়, সংসার-অনভিজ্ঞ বাউণ্ডুলে তরুণ-তরুণীদের ইচ্ছে করে পরস্পরের অভাবজনিত মন উদাস করে রাখা। এজন্য তাঁর বায়রণ কিংবা পোপের মত তিক্ততা ও বিরক্তি আসেনি, শেলী কীটসের স্পর্শকাতরতা থাকলেও ব্যর্থতা ও বিক্ষোভের সুর উগ্র হয়ে ওঠেনি। তীব্র বেদনায় সমাচ্ছন্ন হলেও সুন্দর এক আশার অভীপ্সায় তিনি মুখরিত কবি—

: এপার ওপার জুড়িয়া অন্ধকার
মধ্যে অকূল রহস্য-পারাবার,
তারি এই কূলে নিশি নিশি কাঁদে জাগি
চক্রবাক সে চক্রবাকীর লাগি'।

•• ••• •••

এই বেদনার নিশীথ তমসা-তীরে
বিরহী চক্রবাক খুঁজে খুঁজে ফিরে
কোথা প্রভাতের সূর্যোদয়ের সাথে
ডাকে সাথী তার মিলনের মোহানাতে।

(চক্রবাক : চক্রবাক)

এক সামান্যা মানবীর অন্তরে কি অসামান্য রহস্যের গ্রন্থি রয়েছে, কাছে এসেও দূরে সরে যাচ্ছে কিসের জন্যে, প্রেমিককে ফিরিয়ে দিচ্ছে কিসের মোহে—সেই নৈরাশ্যের চেয়ে বিস্ময়ের গ্রন্থি-মোচনের চিত্র তিনি রসগ্রাহীর আনন্দে উন্মোচন করে চলেছেন। আত্মপ্রকাশের প্রবল আবেদন, প্রতি অঙ্গের তরে প্রতিটি অঙ্গের ক্রন্দন কবিকে অধীর করেছে—পেয়েও যেন কিছু পেলেন না বলে মনে হচ্ছে। যৌবন-বেদনার এই তৃষাতুর অনন্ত পিপাসাকে এক গণ্ডূষে পান করেও তৃষ্ণা মিটছে না—

: অনন্ত অগস্ত্য-তৃষাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি বিন্দুসম মাগে সিন্ধু আর!
ভগবান! ভগবান! একি তৃষ্ণা অনন্ত অপার!
কোথা তৃপ্তি? তৃপ্তি কোথা? কোথা মোর তৃষা-হরা প্রেম-সিন্ধু
অনাদি পাথার!

(পূজারিণী : দোলন চাঁপা)

তার প্রেমের কবিতা সেই যৌবনতৃষ্ণা মিটাবার সাধনা, অন্তরতৃষার বাণী। কখনও সংশয়—

: ভুল করে যদি ভালবেসে থাকি
ক্ষমিও সে অপরাধ;
অসহায় মনে কেন জেগেছিল
ভালোবাসিবার সাধ॥

(বুলবুল, ২য়

কখনও নিদারুণ অভিমান—

: পর জনমে দেখা হবে প্রিয়।
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও॥
এ জনমে যাহা বলা হলো না,
আমি বলিব না, তুমিও বলো না।

(চোখের চাতক

✓ কখনও প্রত্যাখ্যানের নিবিড় বেদনা—

ঃ শাঙন আসিল ফিরে সে ফিরে এল না

বরষা ফুরায়ে গেল, আশা তবু গেল না !

ধানি রং ঘাঘরী, মেঘ রং ওড়না

আমারে পরিতে মাগো অনুরোধ করো না

কাজরীর কাজল মেঘ পথ পেল খুঁজিয়া,

সে কি ফেরার পথ পেল না মা পেল না।

(বুলবুল, ২য়)

কখনও উজাড় করে আত্মবিসর্জন দেবার আনন্দে মুখর—

ঃ মহান তুমি প্রিয়

এই কথাটির গৌরবে মোর চিত্ত ভরে দিয়ো ॥

অনেক আশায় বসে আছি যাত্রা-শেষের পর

তোমায় নিয়েই পথের ধারে বাঁধবো আমার ঘর—

(আশা ঃ পূবের হাওয়া)

তাই তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের উৎকণ্ঠিত অন্বেষু বাসনার কবিতাই হোল তাঁর প্রেমের কবিতার vital feelings—

ঃ সে বুঝি সুন্দরতর—আরো আরো মধু!

আমারি বধূর বুকে হাস তুমি হ'য়ে নববধূ।

বুকে যারে পাই, হায়

তারি বুকে তাহারি শয্যায়

নাহি-পাওয়া হয়ে তুমি কাঁদ একাকিনী,

ওগো মোর প্রিয়ার সতিনী!······

বারে বারে পাইলাম—বারে বারে মন যেন কহে—

নহে এ সে নহে!

(অনামিকা ঃ সিন্ধু হিন্দোল)

॥ ৩ ॥

"অগ্নি-বীণা"য় যে বিদ্রোহের সুর বেজেছে তার মধ্যেই একদিকে রয়েছে সামাজিক কুসংস্কার ও রাষ্ট্রীয় পেষণ থেকে মুক্ত করে মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে সুন্দর ও আনন্দপূর্ণ করে তোলার প্রয়াস, অপরদিকে একটি তরুণ কবির প্রেমিক মনের যৌবন স্বপ্ন রচনা করার আকূতি। কুমারী মেয়ের প্রথম স্পর্শের শিহরণ, গোপন প্রিয়ার কটাক্ষ, তার কাঁকন-চুড়ির মিষ্টিসুর, তরুণ মনের নবজাগ্রত প্রেমানুভূতির কয়েকটি ছবি কবির প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রেমের কবিতা না হলেও বিদ্রোহের কোন স্পষ্ট দিক নির্দেশ নেই, রয়েছে তরুণ মনের এক বল্গাহীন উচ্ছ্বাস আর সামাজিক রাষ্ট্রীয় বিদ্রোহকে প্রেরণা দিয়েছে কবির ঐ উদ্দাম প্রেম-স্বপ্ন।

"অগ্নি-বীণা"য় যে প্রেম বীজাকারে তরুণমনে আচ্ছন্ন ছিল সেটিই "দোলন-চাঁপা"য় পুষ্পাকারে প্রস্ফুটিত হয়েছে। "অগ্নি-বীণা"য় প্রেমস্বপ্ন সফল করার জন্যে যে স্ফুলিঙ্গ মনের বনে লাগিয়েছিল আগুন, "দোলন-চাঁপা" তারই ওপর দিয়ে ফাগুন হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে বিদ্রোহী কবির ব্যক্তিত্ব প্রখর রৌদ্রস্নাত সেই কবিরই বহ্নিরাগ বেহাগ-রাগের মূর্ছনায় মিশে গেল। হৃদয়-জগতে অহঙ্কার থাকলে প্রণয়ে সিদ্ধি নেই, ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধনেই প্রণয়ের সাফল্য সম্ভব, পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারা প্রণয়ের মূল্য দিতে হয়। যে দুর্জয় দুরন্ত আত্মা কারুর কাছে নতি স্বীকার করবে না বলে দৃপ্ত ঘোষণা করেছিল "অগ্নি-বীণা"য় সেই আত্মাই প্রেমের ব্যাপারে আত্মসমর্পণের প্রথম ইঙ্গিত "দোলন-চাঁপা"য় দিয়েছে—

ঃ না-চাহিতে বেসেছিলে ভালো মোরে তুমি—শুধু তুমি,
সেই সুখে মৃত্যু-কৃষ্ণ অধর ভরিয়া
আজ আমি শতবার ক'রে তব প্রিয় নাম চুমি!

(পূজারিণী ঃ দোলন-চাঁপা)

তাই কবির প্রেমের কবিতার একটা মোটামুটি রূপ-প্রকৃতি এই কাব্যের মাধ্যমেই আমরা প্রথম পাই। 'পূজারিণী' কবিতায় প্রগলভতা আছে, অতি

নাটকীয়তা আছে, অতি কথন দোষ আছে তবু এ কবিতাটি। কবির প্রেমানুভূতি ও সৌন্দর্য চেতনার একটি দীর্ঘ মন্থর বিশ্লেষণ। একদিকে প্রেয়সীকে পাওয়ার ব্যাকুলতা অপরদিকে জন্মজন্মান্তরের সৌন্দর্যময়ীর রহস্যসত্তা উদ্‌ঘাটনে কবির যে অশান্ত হৃদয়ের চিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে তার মধ্যে তাঁর রোমান্টিক কবি-স্বপ্নের একটি বর্ণময় আলিম্পন সঞ্চারিত। যুগে যুগে একটি মর্ত্যের স্পর্শ-সাধ্য নারীকে কেন্দ্র করে যে প্রেম রূপায়িত হয়, একটি প্রেমের মাঝে সকল প্রেমের স্মৃতি এসে মিলিত হয় সেই অতীতের স্মৃতি-মন্থন করতে করতে একালের প্রেয়সীর জন্য প্রেমের বিচিত্র হৃদয়-লীলার স্পন্দন অর্থাৎ প্রেমিকের মধুর অভিমান, অভিযোগ, যৌবন-বেদনার তৃষাতুর চিত্ত বিক্ষোভের রূপকল্প চিত্র "দোলন চাঁপা"র সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। 'বেলাশেষে', 'ব্যথাগরব', 'সমর্পণ', 'চপল সাথী', 'আশান্বিতা', 'মুখরা', 'আশা', 'অভিশাপ', 'পিছু ডাকে', 'বেদনা-অভিমান', 'নিশীথ-প্রীতম', 'প্রতিবেশিনী' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের এক একটি মেজাজ ধরা পড়ে।

"দোলন-চাঁপা"র ক্রমানুবন্ধী কাব্য "ছায়ানট", "পূবের হাওয়া"। যে বিষণ্ণতা ও স্মৃতি-বেদনার চিত্র কবিকে উতলা করেছে "ছায়ানট-পূবের হাওয়া" সেই নমনীয় আস্বাদনের রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতির অপূর্ব কাব্য। কামনার আরক্তিম দীপ্তিকে এখানে শুধু আরতি করা হয়নি, এক সংস্কার-মুক্ত জীবনের মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে; প্রিয়াকে ভালবাসতে গিয়ে ভালবেসেছেন প্রকৃতিকে, প্রিয়া আর প্রকৃতি এক হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিরহী কামনার রঙীন লীলা বর্ণময় হয়ে উঠেছে—

ঃ চৈতী রাতের গাইত গজল বুলবুলিয়ার চর
দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদত কবুতর।
ভুঁই তারকা সুন্দরী
সজনে ফুলের দল ঝরি'
থোপা থোপা লাজ ছড়াত দোলন-খোঁপার পর,
ঝাঁঝাল হাওয়ায় বাজত উদাস মাছরাঙার স্বর।

(চৈতী হাওয়া ঃ ছায়ানট)

কবি-চিত্তের আবেগ-রঞ্জিত ভাষা প্রকৃতিকে করে তুলেছে সজীব ও মুখর এবং এ ধরণের স্মরণীয় আশ্চর্য মধুস্বাদী পঙক্তি তাঁর প্রেমের কবিতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন—

ঃ মাটির প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটির কুটিরে
খুসীর রঙে করবে সোনা ধূলি-মুঠিরে।
আধখানা চাঁদ আকাশ' পরে
উঠবে যবে গরব ভরে
তুমি বাকী আধখানা চাঁদ হাসবে ধরাতে
তড়িৎ ছিঁড়ে পরবে তোমার খোঁপায় জড়াতে।

(এ মোর অহঙ্কার ঃ চক্রবাক)

ঃ মোর প্রিয়া হবে, এসো রাণী
দেব খোঁপায় তারার ফুল।
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির
চৈতী চাঁদের দুল॥
কণ্ঠে তোমার পরাব বালিকা
হংস সারির দুলানো মালিকা
বিজলী-জরীন ফিতায় বাঁধিব
মেঘ-রং এলোচুল॥

(বুলবুল, ২য়)

ঃ "চোখ গেল চোখ গেল" কেন ডাকিস্ রে—
চোখ গেল পাখীরে।
তোর চোখে কাহার চোখ পড়েছে নাকি রে—
চোখ গেল পাখীরে।
তোর চোখের বালির জ্বালা জানে সবাইরে—
জানে সবাই
চোখে যার চোখ পড়ে তার ওষুধ নাইরে—
তার ওষুধ নাই ;
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয় কাহার আঁখিরে—
চোখ গেল পাখীরে।

(বুলবুল, ২য়)

দু' জনের ভালবাসা সীমাবদ্ধ থাকছে না দু' জনের মধ্যে, অসীম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য কবির অন্তরে তুলেছে কম্পন, জাগিয়েছে নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষা, আবেগ। সেই প্রকৃতির আবেগময় দৃশ্যকে প্রেমের দর্পণে প্রতিফলিত করেছেন, কারণ কবির কাছে বিশ্বের আকাশ তাঁর যৌবন-স্বপ্ন দিয়ে মোড়া। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন, প্রকৃতির সহিত প্রত্যেক কবি বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ। কাজেই নজরুলের প্রেমের কবিতায় প্রিয়া যেন প্রকৃতিরই স্থান অধিকার করেছে। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বরমার উপাসনা কবিকে প্রেম সত্যের গভীরে নিয়ে গেছে। প্রেমের পরিণতি সুন্দরের অভিসারে, কারণ শেকস্পীয়ারের কথায় Beauty is lover's gift—প্রেমানুভতির গভীর রসতত্ত্ব কবিকে আত্মস্বরূপ নির্ধারণে তৎপর করেছে—

: তুমি আমায় ভালবাস তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ সে যে তোমার ভালবাসার ছবি॥

একজনের ভালবাসা বিশ্বের ভালবাসা হয়ে কবি-চিত্তকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। এর ফলেই কবি নিজেকে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁর প্রেয়সীর নিকট—

(কবি রাণী : ছাযানট)

: কি চেয়েছিনু বুঝিতে পারনি ক তুমি হায়
তোমারে চাহিতে আসিনি, আমারে দিতে এসেছিনু পায়।

বিদ্রোহী কবিকে হার মানতে হল—

: হে মোর রাণি! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে।

(বিজয়িনী : ছাযানট)

ভালোবাসার রণে পরাজয় হেরে যাওয়া নয়, নুয়ে পড়া মানে দুর্বলতা নয়।

"অগ্নি-বীণা"য় কবির ক্ষুরধার যৌবনের বর্ণবহ্নি, "দোলন-চাঁপা" "ছায়ানট' "পুবের হাওয়া"য় প্রেমের সুকুমার রূপায়ণ পরবর্তীকালের "সিন্ধু-হিন্দোল", "চক্রবাক" ও গজল গানের বইয়ে প্রচণ্ড প্রেমের উদ্দামতার সঙ্গে প্রেমের একটি স্নিগ্ধ সুর এসে মিশেছে।

প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের রয়েছে মনের ও ভাবের নিবিড় যোগ। প্রেম-মিলন-বিরহ প্রকৃতির মাধ্যমে আমাদের কবিরা হৃদয়ানুভূতির বিভিন্ন রঙকে রূপ দিয়েছেন। প্রকৃতির মাধ্যমে প্রেমের বিশ্লেষণ "সিন্ধু-হিন্দোলে"র মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এ কাব্যে এক-একটি ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, এক-একটি পঙক্তি শুধু একটি চিত্র নয়, চিত্রের সঙ্গে ভাবের সমন্বয়, ভাবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগ। সমুদ্র বাঙালী কবিকে আকর্ষণ করেছে, সমুদ্রকে অবলম্বন করে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের রূপের বর্ণনা তাঁরা করেন নি, তাঁরা নিজের হৃদয় রহস্যকেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এ কাব্যটির অন্তঃপ্রকৃতিও তাই। সমুদ্রকে অবলম্বন করে কবি যেন তাঁর হৃদয়ের অতৃপ্ত, উদ্বেগিত ও অশ্রান্ত কলরোলকেই রূপ দিয়েছেন। সমুদ্র এখানে একটি অখণ্ড প্রতীক, তার তরঙ্গে তরঙ্গে কত কথা, কত সুর, কত কাহিনী—কান পেতে শুনলে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। গর্জমান ফেনিল সমুদ্র যেন কবিরই বাসনা বিক্ষুব্ধ হৃদয়, মনোজগতের আলোছায়ায় কত বিচিত্র রহস্য লীলায়িত, বিরহ-মিলনের কত আনন্দ-বেদনার সুন্দর বর্ণচ্ছটা উদ্ভাসিত। 'সিন্ধু' কবিতা-সমষ্টি প্রেমবঞ্চিত কবির হৃদয় মথিত বেদনার ইতিহাস। চিত্রকল্পের প্রাচুর্যে ও কামনার মদিরতায় প্রত্যেকটি স্তবকে শব্দ-চয়ন প্রকাশ-শক্তির অসাধারণ নৈপুণ্য ও স্বচ্ছন্দ গতির যে পরিচয় রয়েছে তার তুলনীয় কবিতা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নেই। 'অ-নামিকা', 'মাধবী-প্রলাপ' কবিতায় উদগ্র কামনার সঙ্গে বাসনার ভীরু লাবণ্য যুক্ত হয়েছে। স্পর্শকাতর লালসামদির ভঙ্গিমায় শিল্প-চাতুর্যের অনবদ্য উদাহরণ 'ফাল্গুনী' কবিতা। 'চাঁদনীরাতে', 'উন্মনা', 'বাসন্তী' কবিতায় বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে প্রেমের উল্লাসময় লঘু-স্পর্শ, ইন্দ্রিয় চেতন রূপ পিপাসার এমন একটা অভিনবত্ব আর অনির্বচনীয়তা ফুটে উঠেছে যা অপূর্ব। 'বধূ-বরণ', 'নারী' কবিতায়—'নারী' যদিও "সিন্ধু-হিন্দোলের" অন্তর্গত নয়—প্রেম তার স্নিগ্ধ নম্রতা ছেড়ে বীরের প্রেমরূপে উৎসারিত হয়েছে, তাঁর প্রিয়া ঘোমটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে—

ঃ (আমি) শান্ত উদাসীন মেঘে আনি বর্ষণ বেগ
আমি-তড়িৎ লতা,

পরাজিত পৌরুষে জাগায়ে তুলি
দূর করি' নিরাশা দুর্বলতা।

আমি গার্গেয়ী মৈত্রেয়ী ভাগবতী শক্তি—
আমি নবারুণ আলোক আনিব বিশ্বে
তিমির বিদারি' ॥

(নারী : সর্বহারা)

প্রেমের একটা বলিষ্ঠ তেজস্বিতা প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'সবলা, কবিতায়ও নারীর সুদৃঢ় আত্মঘোষণা আমরা আগে পেয়েছি।

কবির প্রেম ও যৌবন স্বপ্নের আর একটি দিক আছে। ইরাণী রোমান্স ও মুসলিম ঐতিহ্যের যৌবনস্বপ্ন সত্যেন দত্ত ও মোহিতলালের কবিতায় পাওয়া গেলেও তাঁরা যেন ওপর ওপর থেকে দেখেছেন। নজরুল তার মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন—গাঙ্গেয় সংস্কৃতির সঙ্গে আরবীয় সংস্কৃতির অপূর্ব মিলন সংসাধিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। আর আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগে রোমান্টিক ব্যঞ্জনা আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। 'নওরোজ', 'নিকটে' প্রভৃতি কবিতা এবং ওমর খৈয়াম, হাফিজের রুবাই অনুবাদের মধ্যে বাদশাহী রোমান্সের নতুন আস্বাদ পেলাম।

"চক্রবাক" থেকে নজরুলের প্রেমের কবিতা ও গানে উদ্দামতা যেন অনেকটা কমে এসেছে। একটা শান্ত অনুদ্বেগ সকল উচ্ছ্বাসকে সংহত করেছে কিন্তু তাঁর প্রেমের কবিতার বর্ণগরিমাকে ম্লান করেনি। স্নিগ্ধতা কল্পনার রূপময় নির্যাস, মত্ত কল্লোলের মধ্যে নির্জন উপলব্ধির সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রগলভ কবিকে আবিষ্টচিত্ত করেছে। তাঁর এই অন্তর্মুখীনতা নিখুঁতভাবে ফুটেছে তাঁর গানে। "বুলবুল" (১ম, ২য়), "চোখের চাতক", "সুর-সাকী" প্রভৃতি গানের বইতে প্রেমানুভূতির নিবিড়তা, চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনা ও ইন্দ্রিয়ানুগত সৌন্দর্যের তন্ময়তায় অপরূপ হয়ে উঠেছে। যেমন—

: আমার গহীন জলের নদী
আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি।
... ...
আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই, ভাঙলে কেন মন
হারালে আর পাওয়া না যায় মনের রতন।
জোয়ারে মন ফেরে না আর রে
(ও সে) ভাটিতে হারায় যদি।

(চোখের চাতক)

নজরুলের প্রেম কবিতা সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি বড় সোচ্চার ও ঘোষণাতৎপর। কিন্তু যে সমস্ত কবিতা বা গান হৃদয়গত বোধের বিন্যাসে চৈতন্যের শুদ্ধিকরণ থেকে উদ্ভূত সেখানে তাঁর উদ্দাম দেহ-কামনা চিরসুন্দরের স্বপ্নে তন্ময় হয়েছে। চেতনার অন্তর্মূল থেকে উৎসারিত বোধদীপ্ত রচনার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

ঃ ঝুরিবে পূবালী বায় গহন দূর বনে
রহিবে চাহি তুমি একেলা বাতায়নে।
বিরহী কুহু-কেকা গাহিবে নীপ-শাখে
যমুনা নদী পারে শুনিবে কে যেন ডাকে।

(বুলবুল ২য়)

ঃ মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নম, নমো নম, নমো নম।
শ্রাবণ মেঘে নাচে নটবর,
ঝমঝম, ঝমঝম, ঝমঝম॥

(চোখের চাতক)

ঃ পদ্মার ঢেউ রে—
ও মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা যারে।
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা
আমি হারায়েছি তারে॥

... ...

ও পদ্মারে ঢেউএ তো ঢেউ ওঠায় যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি ঝিলমিল করে কৃষ্ণ কালো।
সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশী বাজায়
যদি দেখিস্ তারে—দিস সে পদ্ম তার পায়
বলিস্ কেন বুকে আশার দেয়ালী জ্বালিয়ে
নেমে গেল চির অন্ধকারে॥

(বুলবুল ২য়)

শিল্পজীবনের এই পর্যায়ে এসে তাঁর আবেগ পরিণত হয়েছে ধ্যানে। ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে মহত্তর সৃষ্টি-সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি-বহনে যখন তৎপর, অনুভূতির

জগতে নতুন সূর্যোদয়ের লগ্ন যখন আসন্ন, ঠিক সেই মুহূর্তেই আকস্মিক ব্যাধি কবিকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিল। রূপের এই তন্ময়তাই কবিকে ইসলামি ও শ্যামাসঙ্গীত রচনার প্রেরণা দিয়েছে এবং এই প্রণয় তৃষ্ণাই তাঁকে ভগবৎপ্রেমে বিভোর করেছে। কারণ নিখাদ প্রেমই মানুষকে ত্যাগ ও মহিমার পথে বৃহত্তর উদ্দেশে দীক্ষা দেয়।

পরিশেষে বলি, তিনি সংগ্রামে যেমন 'বজ্রাদপি কঠোরানি' প্রণয়ে তেমনি 'কোমলানি কুসুমাদপি'। তাঁর জীবন সাধনার দুটি দিক তাঁর একটি মাত্র কথায় এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে যা হাজার কথা খরচ করলেও বলা যেত না—

ঃ মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাশরী, আর হাতে রণতূর্য।

(বিদ্রোহী ঃ অগ্নি-বীণা

এটির মধ্যেই তাঁর বাইশ বছরের সাহিত্য-জীবনের পূর্ণ পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে।

সাধক কবি নজরুল

যে কবি বলেছিলেন, 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন, আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন' সেই কবিই গেয়েছেন 'শিরোপরি মোর খোদার আরশ, গাই তারি গান পথ-বেভুল'। 'লা-শরীফ আল্লা'র প্রেমিক কবি আবার পঞ্চপ্রাণের প্রদীপ শিখায় আরতি করলেন 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন'। কথাগুলোর মধ্যে অসামঞ্জস্য আবিষ্কার করা কঠিন নয় কিন্তু নজরুলের কবি-মানস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তিনি প্রথম থেকেই বিশ্বাসী কবি। হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম ঐতিহ্যধারায় যাঁর জীবন স্নাত হয়েছিল, সেই সাধক কবি নজরুলের ধর্মপ্রবণতা বুঝতে হলে তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের পরিচয় আমাদের নিতে হবে।

কবির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না—খুব অল্প বয়সে কবির পিতার মৃত্যু হয়। সংসারের যোয়াল কবির ঘাড়ে চেপে বসে। কবির পিতা অবস্থার দুর্বিপাকে হাজী পাহলোয়ানের মাজার শরীফ ও মসজিদের সেবা করে জীবন নির্বাহ করতেন। পিতার মৃত্যুর পর কবিকে এই কাজই বেছে নিতে হয়—পড়াশুনাও খুব বেশী করেন নি, বয়সও অল্প, চাকরী কে আর দেবে! আশেপাশের পাড়াগাঁয়ে মোল্লাগিরি করেছেন। কাজেই ইসলাম ধর্মের ক্রিয়া-কলাপ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁকে পালন করতে হয়েছিল। ঐ সময় কোরাণ শরীফ অনর্গল নির্ভুল পড়ে যেতে পারতেন। মোল্লাগিরি করলেও নিজেকে তিনি গুটিয়ে রাখেন নি, গণ্ডীবদ্ধ জীবে পরিণত না হয়ে নিজেকে প্রসারিত করেছেন, গ্রামের অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মিশেছেন। পীরের খাদেম হয়েও তিনি হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রাদির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন লেটো দলের সংস্পর্শে এসে। লেটো দলে যোগ দেয়ার ফলে পালাগান লেখার সময় তাঁকে হিন্দুপুরাণগাথার সাহায্য নিতে হয়েছিল। উভয় ধর্মের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় তাঁর এভাবেই হয়েছিল—পরে এ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান আরও বিস্তৃত হয়েছে। তিনি তখন থেকেই দেখেছেন কতিপয় অভিজাত হিন্দু মুসলমানের নাক সিটকানো মনোভাব—পরস্পরকে ঘৃণা করার, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা। তিনি আরও দেখেছেন ধর্মের আবরণে

ক্ষুধিত পীড়িত মানুষের সহজ বিশ্বাসকে বিকৃত করে কেমন করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে পীর-পুরোহিতরা।

প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে চলে গেলেন করাচী। এখানে পাঞ্জাবী মৌলবীর কাছে ফার্সী কবিতা অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলেন বাঙলায়। বাঙলায় তখন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠছে—তিনি নিজের লেখা রাঙিয়ে নিলেন রক্তে। চারদিকে অগ্নিবিষাণ বেজে উঠল। সময়ের প্রয়োজনকে অনুভব করে একের পর এক "অগ্নি-বীণা", "ভাঙার গান", "বিষের বাঁশী", "প্রলয় শিখা" বেরুতে লাগল। কবিতার মধ্যে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কথাই তিনি বললেন না, সামাজিক কুসংস্কারকেও আঘাত করলেন, কারণ তিনি জানতেন দেশের আন্দোলনকে জোরদার করতে হলে নিজেদেব মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান সবপ্রথম বিলুপ্ত করতে হবে। মানুষকে সচেতন করার জন্যে তাঁর এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল সেদিন। যে ধর্ম মানুষকে নির্জীব করে রাখে, যে আচার মানুষের মধ্যে ভেদপ্রথা জীইয়ে রাখে সে-ধর্ম ও আচারের প্রতি কবির সমর্থন ছিল না। আচার-সর্বস্ব জড়বাদী দেশে তিনি আনলেন এক জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। সেজন্যে ভগবানের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করতে তাঁর দ্বিধা হয় নি। তা'বলে একথা কিছুতে বলা চলবে না যে তিনি নাস্তিক ছিলেন। যে ভগবানের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন; যাকে লাথি মেবে ঘুম ভাঙাতে চেয়েছিলেন তাকেই 'ফরিয়াদ' কবিতায় নিজের নালিশ পেশ করেছেন। একদিকে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর একদিকে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস এই টানা-পোড়েনে নজরুলের কবি-মানস অচঞ্চল হয় নি বরং এক স্থির বিশ্বাসের দিকে তাঁকে চালিত করেছে। পরবর্তীকালের শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামী সঙ্গীত লক্ষ্য করলেই একথা উপলব্ধি করা যাবে। মানুষকে ও ধর্মকে এক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যেখানে জীবনের সঙ্গে ধর্মের মিল হবে, ধর্মের আওতায় মানুষ গড়ে উঠবে না, ধর্ম গড়ে উঠবে জীবনের আওতায়—

ঃ মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও' কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি!
ও' মুখ হইতে কেতাব গুচ্ছ নাও জোর ক'রে কেড়ে,
যাহারা আনিল গুচ্ছ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে।

পূজিছে গুচ্ছ ভণ্ডের দল ।—মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গুচ্ছ ; গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো ।

(মানুষ—সাম্যবাদী : সর্বহারা)

তাই মানুষকে জাতের গণ্ডী দিয়ে বিচার করা হবে না, ধর্ম মানুষের সঙ্গে আচার-আচরণের প্রতিক্রিয়ারূপে থাকবে না, থাকবে মানুষের উদার মনের প্রতিভূ হিসেবে। সেজন্যে নজরুলের কাছে আল্লা ও হরির মধ্যে কোন ব্যবধান নেই—যিনিই রাম তিনিই রহিম, কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, "পাগল তারা আল্লা ভগবানে ভাবে ভিন্ন যারা"। তাই হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের দিনে এই দুটি জাতকে নিজের জীবনময় সাধনার মাধ্যমে একটি রাখীবন্ধনে বাঁধতে চেয়েছেন। এমন কি নিজের পুত্রদের নাম রেখেছেন দুটি ধর্মের মিল দিয়ে। মধ্যযুগের সাধক কবীর বলেছিলেন—

: হিন্দু মুখে রাম কহি মুসলমান খুদাই
কহে কবীর সো জীবতা দুহ মেঁ কদে ন জাই ॥

হিন্দু মরে রাম রাম করে, মুসলমান মরে খোদা খোদা করে, কবীর বলছেন এই সব ভেদবুদ্ধির মধ্যে যে না পড়ল সেই বাঁচল। নজরুল ইসলামও হিন্দু-মুসলমানের ভেদবুদ্ধির মধ্যে পড়েন নি। কবীর আরও বলেছিলেন—

: মো কো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে
মৈঁ তো তেরে পাস মেঁ।
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ
না কাবে কৈলাস মেঁ ॥

আমাকে কোথায় খুঁজছ। আমি তো তোমার পাশেই রয়েছি ; আমি মন্দিরে নেই, মসজিদে নেই, কাবায় নেই, কৈলাসে নেই। একথার প্রতিধ্বনি তো আমরা নজরুলের কণ্ঠেও শুনতে পেলুম—

: কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে'
কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে ?
হায় ঋষি দরবেশ
বুকের মাণিকে বুকে ধ'রে তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ।

(ঈশ্বর—সাম্যবাদী : সর্বহারা)

মধ্যযুগের কবীর-নানক-দাদু-রজ্জব-মৈনুদ্দীন চিশতী-নিজামউদ্দীন আউলিয়া এবং আরো অনেক সাধু-সন্ত আউল-বাউলের সাধনার ধারাকে তিনি এ শতাব্দীতে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন। ভারতীয় সাধনার চিরন্তন বাণীকে মর্যাদা দিতে গিয়ে গোঁড়া রক্ষণশীল ধর্মান্ধরা কবিকে ভালো চোখে গ্রহণ করেনি—স্ব সমাজে তিনি 'কাফের' বলে নিন্দিত হয়েছেন (অবশ্য এখন এ অপবাদ তুলে নেওয়া হয়েছে), জন্মতঃ মুসলমান বলে হিন্দু সমাজও তাঁকে অবজ্ঞা করেছে। হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করতেই উভয় সমাজের মাতব্বররা ক্ষেপে গেলেন। কবি-চরিত্রে নানারূপ বক্র ইঙ্গিত করতে কসুর করলেন না। কবি উভয় সমাজের ধিক্কারকে এক কৌতুককর চিত্রে প্রকাশ করেছেন—

ঃ সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা কন, 'আড়ি চাচা'।
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি, নাড়ি কাছা !
মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্-লারা' কন হাত নেড়ে,
'দেব-দেবী,' নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে ;
ফতোয়া দিলাম—কাফের কাজী ও
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও !
"আমপারা" পড়া হাম্‌বড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে'।
হিন্দুরা ভাবে, 'পার্শী-শব্দে কবিতা লেখে, ও পা'ত-নেড়ে।'

(আমার কৈফিয়ৎ ঃ সর্বহারা)

তাঁর প্রিয় পুত্র বুলবুলের আকস্মিক মৃত্যু কবিকে তাঁর বিশ্বাসের দিকে অন্তর্মুখী সাধনার দিকে আরও ঠেলে দিয়েছে। মনে রাখা দরকার যে এ সময়তেও তিনি মানুষকে বাদ দিয়ে অবতারকে আশ্রয় করেন নি। তাঁর ইসলামী ও শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসা, অপরিসীম সহানুভূতির পরিচয় পাই। মনকে শান্তি দেওয়ার জন্যে এ সময় তিনি বেদান্ত-সাংখ্য চণ্ডী-গীতা যৌগিক মুদ্রা ইত্যাদির অনুশীলন করতে শুরু করেন। যোগ-সাধনায় গুরুর প্রাধান্য তিনি চান নি—গুরুকে তিনি সন্ধান করেছেন, হয়ত তাঁকে পেয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করেছেন কিন্তু অষ্টপ্রহর গুরুর নির্দেশ কবিকে পরিচালিত করবে তা তাঁর মনঃপূত ছিল না। নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তির অনুসন্ধান নিজেকেই করতে হবে। নিজস্ব শক্তিকে

জাগ্রত করার চেষ্টা থেকেই শ্যামা-সঙ্গীত, ইসলামী গানের জন্ম। এ সব গানে বাঙালী হৃদয়ের মাধুর্য প্রকাশের ভাবরাজি তাঁর ভাষার অনুসারী হয়েছে।

শ্যামাসঙ্গীত রচনায় রামপ্রসাদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। রামপ্রসাদের পর কমলাকান্ত চক্রবর্তী, রাজা মহাতাবচাঁদ, নিধুবাবু, রাম বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি শ্যামাসঙ্গীত লিখেছেন। আলাওল, সেখ ফয়জুল্লাহ এবং আরো অনেক বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি দেব-দেবী নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, নজরুল ইসলাম এঁদেরই অবশ্যম্ভাবী উত্তরপুরুষ হলেও হিন্দু-মুসলমানের মাথা ভাঙাভাঙির দিনে ইসলামী সঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে তিনি যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তা অভূতপূর্ব কারণ ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে মুক্তকণ্ঠে প্রাণের বাণী সরল সুরে ব্যক্ত করেছেন।

রামপ্রসাদের পদাবলীতে যেমন অসহায় শিশুর আবেদন প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তেমনি নজরুল রচিত শ্যামাসঙ্গীতেও মর্মরিত। নজরুল শ্যামাসঙ্গীতে নতুন সুরের স্রষ্টা কিংবা দ্রষ্টা নন, তিনি তাঁর গানে হৃদয়ের দরদ এমনি করে মিশিয়েছেন যে রসের নিবিড়তায় তাঁর গান ও রামপ্রসাদের গান প্রায় একাত্ম হয়ে গেছে। তাঁর গানের অনেক পদ রামপ্রসাদের রচিত বলে মনে হয়—পাড়াগাঁয়ের সাধারণ মানুষ রামপ্রসাদের গানরূপে গেয়ে থাকে—এইখানেই শ্যামাসঙ্গীত রচনায় নজরুলের কৃতিত্ব। চিন্ময়ী সচ্চিদানন্দময়ী কুলকুণ্ডলিনীরূপে কালী মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে একদিকে মহাকালীকে লোলরসনা রণরঙ্গিণী মূর্তিতে আবাহন করেছেন, অন্যদিকে তাকেই স্নেহময়ী জননী প্রেমময়ী মূর্তিরূপে দেখেছেন। কবির কাছে কালীই রাসবিহারী—শ্যামা ও শ্যামে তফাৎ নেই। কখনো তিনি লোল-শোণিত-লোলুপা কাল-দণ্ডধারিণী, কখনো প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ, কখনো তিনি দনুজদলিনী দশপ্রহরণধারিণী, কখনো শ্বেত শতদল-বাসিনী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর এ জাতীয় সঙ্গীতগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) মহিমা কীর্তন, (২) রণসঙ্গীত, (৩) সংসার বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্য, (৪) করুণাভিক্ষা ও আত্মনিবেদন।

'মাতৃনামের হোমের শিখা,' 'শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে', 'মা তোর কালো রূপের মাঝে রসের সাগর লুকিয়ে আছে,' 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়' প্রভৃতি গানে কালীর গুণকীর্তন করা হয়েছে।

নজরুলের কবি-মানস দেশ ও জাতির চিন্তা ও ভাবনার সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত ছিল বলে তিনি শুধু কালীর মহিমা কীর্তন করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁকে রণরঙ্গিনী-বেশে আবাহন করেছেন—

: জাগো শ্যামা, জাগো শ্যামা
আবার রণচণ্ডী সাজে।
তুই যদি না জাগিস আগে
ছেলেরা তো জাগবে না যে॥

(সুর-সাকী)

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার মধ্যে নিজের ভক্তিভাব এইভাবে তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। তাঁর এই জাতীয় আরো কয়েকটি সঙ্গীত আছে, যেমন—'কারা-পাষাণ ভেদি জাগো নারায়ণ', 'জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী', 'তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী কৃষ্ণমুরারি আগত ঐ', 'বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা', 'জাগো হে রুদ্র, জাগো রুদ্রাণী', 'জাগো যোগমাযা জাগো মৃন্ময়ী চিন্ময়ীরূপে জাগো' প্রভৃতি।

সংসার যে মায়ার খেলা চোখ বুজলে যে সব অন্ধকাব তখন 'কা তব কান্ত কস্তে পুত্রঃ' ইত্যাদি কথার উল্লেখ করে কবি বৈরাগ্যের সঞ্চার করতে চেয়েছেন—

: রাতে রাজা সাজে নাট-মহলে
দিনে ভিক্ষা মেগে পথে চলে
শেষে শ্মশান-ঘাটে গিয়ে দেখে
সবাই মাটির ঢেলা।
এই ত বিধির খেলা রে ভাই
ভব নদীর খেলা॥

(বুলবুল, ২য় খণ্ড)

কবির চিত্তে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সমস্যা ও ক্ষুব্ধতার অবসান হয়েছে, ধনসম্পদ দারাপুত্র পরিবার সমস্তই অনিত্য বলে মনে হয়েছে—বাউলের মত তিনি গাইলেন—

: দারা-সুত-পরিজন-রূপে প্রভু অনুখণ,
তোমার আমার মাঝে আড়াল করে সৃজন,
তুমি যবে চাহ মোরে লও হে তাদের হ'রে
ছিঁড়ে দিযে মায়া-ডোর ক্রোড়ে ধর আপন।

(বন-গীতি)

যে-দুঃখকে, যে-ব্যথাকে, যে-শোককে ভুলবার জন্যে তিনি সাধন-ভজন আরম্ভ করেছিলেন—

: দুঃখ ক্লেশ শোক পাপ তাপ শত
শ্রান্তিমাঝে হরি শান্তি দাও দাও।
... ...
অভাব দৈন্য শত হৃদি-ব্যথা-ক্ষত
যাতনা সহিব প্রভু, কোলে তুলে নাও॥

(গীতি-শতদল)

সেই দুঃখকে তিনি সাধনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। দুঃখময় জীবনের ওপরই জোর দিয়ে আত্মনির্ভরতার আমাদের শুনিয়েছেন—

: তুমি দুখের বেশে এলে ব'লে ভয় করি কি হরি
দাও ব্যথা যতই তোমায় ততই নিবিড় ক'রে ধরি
আমি ভয় করি কি হরি॥
আমি শূন্য ক'রে তোমার ঝুলি
দুঃখ নেব বক্ষে তুলি,'
আমার ব্যথা শোকের শতদলে তোমায় নেব বরি'।
আমি ভয় করি কি হরি॥

(চন্দ্রবিন্দু)

তাই তাঁর অন্তরাত্মা পরমার্থ লাভের জন্য নিজেকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছে—যে প্রেম-স্বপ্ন যৌবনে কবিকে প্রকৃতির মধ্যে প্রিয়াকে আবিষ্কার করার আনন্দে প্রেরণা দিয়েছিল সেই প্রেমই ক্রমশঃ ভগবৎপ্রেমে বিলীন হযে গেল—

:   আমার সকলি হরেছ হরি
এবার আমায় হ'রে নিও।
যদি সব হরিলে নিখিল-হরণ
এবার ঐ চরণে শরণ দিও॥

আমার দিল যারা আড়াল ক'রে
হরি তুমি নিলে তাদের হ'রে
দিল প্রিয় যা'রা গেল তা'রা
হরি এবার তুমিই হও হে প্রিয়॥

(চন্দ্রবিন্দু

ইসলামী গানেও গহন অনুভূতিকে প্রাণের গভীর সত্যে উদ্দীপিত করে প্রাণের আকৃতিকে সহজ ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন। কখনো তিনি আল্লাকে রুদ্ররূপে, কখনো করুণাময়রূপে অঙ্কিত করেছেন। উইলিয়ম ব্লেকের মত পৃথিবীর সমুদয় প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ এবং পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েছেন। মুসলমান সমাজের কুসংস্কারপূর্ণ অসহায় অবস্থা দেখে তার চৈতন্যকে জাগ্রত করবার জন্যে আল্লাহের রুদ্ররূপের আশ্রয় নিয়েছেন। ইসলাম ধর্মের ক্রিয়া-কলাপ, পাল-পার্বণ নতুন দিনের আলোকে নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছেন। 'কোরবাণী', 'শহিদী-ঈদ', 'মোহররম' ইত্যাদি কবিতা তার সাক্ষ্য। প্রাচীন বাঙালী মুসলমান লোক-কবিরা ইসলামী গান রচনা করেছিলেন কিন্তু সেগুলি শিক্ষিত জনসাধারণের মনঃপূত হয় নি, সেজন্যে সেগুলি অধিকাংশই লুপ্তপ্রায়। নজরুল নতুন প্রেরণায় ইসলামী গান রচনা করলেন যাতে শুধু শিক্ষিত মুসলমানই নয়, গানের সহজ সরল প্রকাশে আকৃষ্ট হয়ে অশিক্ষিত সাধারণও সাড়া দিলেন। সে-সাড়া শুধু গানে পর্যবসিত রইল না, জেগে ওঠার জাগরণী গানে রূপায়িত হল। বর্তমান মুসলমান সমাজের প্রগতির মূলে কবির ইসলামী সঙ্গীত অনেকখানি কাজ করেছে। এদিক দিয়ে শ্যামাসঙ্গীতের চেয়ে তাঁর ইসলামী গান সামাজিক প্রয়োগক্ষেত্রে অনেকখানি সার্থকতা লাভ করেছে। তাঁর ইসলামী সঙ্গীতকে সাধারণতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) জাগরণী গান, (২) ইসলামের মূলতত্ত্ব বিশ্লেষণ।

জড়গ্রস্ত মুসলমান সমাজকে সেদিনকার স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ

করার জন্যে 'আনোয়ার', 'ওমর', 'খালেদ', 'কোরবানী', 'মোহর্‌রম', 'শাত-ইল-আরব', 'শহিদী ঈদ' এবং আরো অনেক কবিতা লিখেছিলেন। মুসলমান সমাজ বিমর্ষ হতচেতন অবস্থায় বাদশাহী তখ্‌তের অলস স্বপ্নমায়ায় দিন অতিবাহিত না করে বর্তমান যুগের কঠিন বাস্তবের মধ্যে তার চেতনা জাগ্রত হোক—এটি একান্তভাবে কবির কাম্য ছিল। তাই তিনি অসংখ্য গানে তাদের ডাক দিয়েছেন—

: দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ্‌ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল॥

(জুলফিকার)

এ সব গানে হেমচন্দ্রীয় কণ্ঠের আভাষ পাওয়া যায়। মুসলমানকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে ধীরে ধীরে তিনি সুফী-সাধকদের আল্লাহ ও হজরত মোহম্মদ সম্পর্কে গান রচনা শুরু করলেন। "জুলফিকার" বইতে তাঁর ইসলামী সঙ্গীতের কিছু অংশ সংকলিত হয়েছে—এখনও বহু গান আছে যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় নি। "মরু-ভাস্কর" বিশ্বনবীর অসমাপ্ত জীবনী। সাধনার পূর্ণতা লাভের পূর্বেই কবির বাহ্য-চেতনার বিকৃতি ঘটে।

শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামী সঙ্গীতের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। সাধনার বিভিন্ন স্তরকে অতিক্রম করে 'একে'র দিকে অগ্রসর হবার প্রেরণা শ্যামা-সঙ্গীতের মাঝে দেখেছিলাম, সেই প্রেরণাই ইসলামী সঙ্গীত রচনায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

: একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা॥

সেই এক পরমেশ্বরই সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতান্তরাত্মা। নজরুল এই সত্য জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি নয় প্রেম দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। কাজেই হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদ রাখেন নি। যে মন বলতে পারে 'মোহম্মদ মোর নয়ন-মণি মোহম্মদ মোর জপ-মালা' সেই মনই গাইতে পারে 'আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়ন-তারা হৃদয়ে মোর রাধাপ্যারী।'

আবহমানকাল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে মিলিত সাধনা চলে আসছিল সেই যুক্ত-সাধনা নজরুলের সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া গেল। হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম তমুদ্দুনের অপূর্ব সংমিশ্রণে যে সংস্কৃতির জন্ম তাকেই একালে নজরুল ইসলাম নাম দিতে পারি, আর নজরুল ইসলামের নাম নেয়ার অর্থই হোল ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বধর্মসমন্বয়ের অপূর্ব, আত্মীয়তার বন্ধনকেই স্বীকার করা। এজন্যে সকল সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে নিশ্চল ধ্রুবতারার ন্যায় আমাদের মানস আকাশে তাঁর নাম জ্বল জ্বল করে।

নজরুল-প্রতিভার পৌরুষ

জীবনের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে একথা সর্ববাদিসম্মত। জীবনের ভিত্তি যখন নড়ে যায়, যখন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আঘাতে জীবনের প্রাচীন অর্থ ও আদর্শ সব ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, জীবনাকাশে যখন বিচিত্র রঙের রোমাঞ্চ তোলে তখন শিল্পেরও রূপান্তর ঘটতে বাধ্য। জীবনের গতিবেগের সঙ্গে সাহিত্য তখন স্বচ্ছন্দে মিলিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ একেই নদীর বাঁকের সঙ্গে তুলনা করে সাহিত্যে 'মডার্ণ' আসা বলেছেন। বিশ শতকের বাংলা-কাব্যে এই মডার্ণ এসেছে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিক থেকে। আধুনিক বাংলা কবিতা শুধু কালগত অর্থে আধুনিক নয়, বিশিষ্ট চিহ্ন ও লক্ষণের দিক থেকেও আধুনিক। কাব্য ছন্দের সুললিত সুরকে সেদিন ভেঙে ভাবে ও ছন্দে রূঢ়তা এসেছিল স্বাভাবিক ভাবেই, কেননা যুদ্ধপূর্ব যুগে আমরা যে ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়িয়ে ছিলুম তা যুদ্ধান্তে ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। ভাবলোক থেকে কঠোর বাস্তবের ধূলিধূসরতার মধ্যে নেমে এলুম আমরা—জীবনসংগ্রাম কঠোরতর হল, যেমন-তেমন করে প্রাণ বাঁচানও যেন প্রাণান্ত হয়ে উঠল। এদিকে যুদ্ধে সাহায্য করার বিনিময়ে ইংরেজ কর্তৃক ভারতকে স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি এবং যথাসময়ে সে-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, তার ওপর রাউলাট আইন জারী করে যতদিন খুসী বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা, জেনারেল ডায়ার কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরীহ নিরপরাধ নিরস্ত্র জনতাকে নৃশংসভাবে হত্যা প্রভৃতি সারা দেশের জনতাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। ওদিকে রম্যাঁ রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বশান্তি কামনা করে যুক্ত আবেদন প্রচার করছেন কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা সে আবেদনে কর্ণপাত করেনি। কাজেই স্বপ্ন-বিলাসে মুগ্ধ হবার সময় আর রইল না, আলেয়ার মায়ায় ভুলে অনিশ্চিতের পিছনে উধাও হয়ে অলস অবসরের কর্মহীন বিরতিকে ভরবার জন্যে সাহিত্য নিয়ে বিলাস করা চলল না। মানুষ এবার সুন্দরের সন্ধান পেলে যুক্তির রাজ্যে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে সমাজে যখন ভাঙন এল তখন অনিবার্যভাবেই সাহিত্যেও

এল তার প্রতিফলন। শিল্প সাহিত্যের কাছে সে যুগের পটভূমি রূপায়িত করার স্পষ্ট দাবি জানালো। মোহিতলাল যতীন সেনগুপ্ত এগিয়ে এসে সেই দাবী মেনে নিলেন। কিন্তু তাঁদের রচনায় তার কোনো শরীরী উপস্থিতি প্রত্যক্ষগোচর হল না। প্রয়োজন হলো এমন কোন কবির যিনি এই চেতনাকে আরো জীবন্ত প্রত্যক্ষ করে তুলবেন, যিনি সমব্যথীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জনতাকে বুঝবেন এবং যাঁর কাব্যে তাদের মর্মজ্বালার বলিষ্ঠতর উচ্চকণ্ঠ প্রকাশ থাকবে এই আবশ্যকতা যখন প্রবলভাবে অনুভূত তখনি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব।

সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক পচা আদর্শবাদের বিরুদ্ধে সঞ্চালিত হল তাঁর ক্ষুরধার লেখনী। দলিত মানবের পরিত্রাণের অভয়বাণী, সাম্রাজ্যবাদের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে আহ্বান জানালেন জনসংহতির, মধ্যবিত্তের আশাভঙ্গের জগতে নিয়ে এলেন কালবৈশাখী সতেজতা প্রখরতর প্রতিরোধের অগ্নিশ্বসিত সুর। যুদ্ধের বীভৎসতা ও অপচয়, বিদেশে নিপীড়িত শ্রেণী কর্তৃক সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ পত্তন, স্বদেশে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রসার এবং জাতীয় জাগরণ তাঁর কাব্যের মূল প্রেরণার উৎস হল। নজরুল আজীবন মনে রেখেছেন যে, গ্রাসাচ্ছাদন, স্ফূর্তি, হল্লা, শিক্ষা, সংস্কৃতি শুধু ধনিক সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। তাই দেশ বলতে শুধু কয়েকজন ইংরেজী শিক্ষালব্ধ মুষ্টিমেয় কেরাণী উকীলকেই বোঝেননি, তার বাইরেও নিরক্ষর কোটি কোটি কৃষক আছে, লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত শ্রমিক আছে, সমাজপরিত্যক্ত অস্পৃশ্য শ্রীভ্রষ্ট নরনারী রয়েছে যাদের অন্তররাজ্যের ভিতরে সত্য-শিব-সুন্দরের আনন্দরাজ্য রয়েছে, সেই অমৃতলোকের তারাও সমান অধিকারী—এ চেতনা তাঁর কাব্যে একটা অভূতপূর্ব বলিষ্ঠতা এনেছিল। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবিশ্রেণী ও প্রগতিশীল বৃহত্তম মানবগোষ্ঠিকে যে শক্তি আজ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অদম্য সাহস ও অফুরন্ত অনুপ্রেরণা দিচ্ছে এযুগে সেই elemental force'কে বাংলা-কাব্যে নির্ভয়ে প্রকাশ করে একেলে বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি গণচিত্তে নিজের আসন তৈরী করে নিলেন।

প্রতিভা বলতে যে মনীষা, ভাবুকতা বোঝায় নজরুলের মধ্যে তার অত্যন্ত অভাব ছিল, তাঁর চিন্তা-ভাবনার পরিধি অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর ছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিভার মধ্যে যেটুকু শক্তি ছিল তার সঙ্গে ছিল বজ্রবিদ্যুৎময়

ব্যক্তি-সত্তা একটি সুদৃঢ় পুরুষ-মহিমা। তিনি ভাববিলাসী সাহিত্যিক ছিলেন না। যে সকল চিন্তা অলস শক্তিহীন পুরুষের ভাববিলাস মাত্র কিংবা ব্যক্তির একক সাধনা বা আত্মোৎকর্ষের সহায়ক তাকে তিনি সাহিত্যের অঙ্গনে স্থান দেন নি। যখন তাঁর সাহিত্যে লীলাবাদ এলো তখনও তিনি সেই ইসলামী ও শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ধর্মের আসল রূপ মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, তাকে দেখিয়ে দিয়েছেন মোল্লা-পুরুতরা তাদের সহজ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নিয়ে কিভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করে। জড়তার দেশে তিনি ছিলেন জীবনবাদী, যুক্তিহীন আচার-সর্বস্বতার দেশে তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার দেশে তিনি সংস্কারমুক্ত। প্রাণ ও মনের মধ্যে তাঁর কোন বিরোধ ছিল না, অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতা ছিল না, বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে সন্দেহের সঙ্গীণ তাঁকে খোচা মারেনি! মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'inferiority complex' বলে তাঁর চরিত্রে ও সাহিত্যে তার লেশমাত্র অস্তিত্ব নেই। তাঁর উন্নতশির কখনও অবনত হয়নি কারুর কাছে। এই স্থির দ্বিধাহীন দৃষ্টির মূলে যে আত্মপ্রত্যয় রয়েছে নজরুল-প্রতিভার পৌরুষের নিদান হলো সেটি এবং এরই শক্তিতে তাঁর সাহিত্যের প্রকাশ এত ঋজু সহজ ও সোচ্চার হতে পেরেছে, দীর্ঘকালের তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতীয়-জীবনের জীর্ণভিত্তি সংস্কার করে জাতিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে প্রাণে এক অপূর্ব জীবনোল্লাস সঞ্চার করেছে। ভদ্র কেতা-দুরস্ত পোষাকী সংস্কৃতির দেশে নজরুল তাই একটা বিপ্লব।

এজন্যে সমাজের প্রতিপত্তিশালী বৃহৎ গোষ্ঠী তাঁকে সহ্য করতে পারেনি, বিদেশী সরকার তাঁর পিছনে টিক্‌টিকি লাগিয়েছে, বারেবারে বই বাজেয়াপ্ত করে আর্থিক দিক দিয়ে নাস্তানাবুদ করেছে, রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করলেও কবির কঠিন ইস্পাতের মতো মনোবল একটুকুও বাঁকে নি। আসামীর কাঠগড়া থেকে জবানবন্দীতে বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন,

> "আমার হাতের বাঁশী কেড়ে নিলেই বাঁশীর সুরের মৃত্যু হবে না; কেননা আমি আর এক বাঁশী নিয়ে বা তৈরী করে তাতে সেই সুর ফুটাতে পারি। সুর আমার বাঁশীতে নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশীর সৃষ্টির কৌশলে।...উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য-বারি, ভগবানের আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই—অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।......দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে

অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর ক'রে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো—একি সত্য সহ্য করতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়ত সত্য উদাসীন ছিল ব'লে; কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত-আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে।"

এর থেকেই বুঝতে পারি ঔপনিবেশিক বশ্যতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে, সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, মুনাফা-শিকারীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে, অন্ধসংস্কার ও আবেগহীন স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম আঘাত করেছেন; মেহনতী মানুষের আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছেন, নবজাগরণের মহাকল্লোলের আহ্বান শুনিয়েছেন নিজের বস্তুবাদী কবিতার মাধ্যমে। তাই পরাধীন ভারতে শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সাহিত্য বিপ্লবের ইন্ধন জুগিয়েছে, তাঁর গান কণ্ঠে ধরে হাতে হাতিয়ার নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে কত বীর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজও মুক্তি-পিয়াসী মানুষ যারা নয়া-জমানার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মত্ত, তাদের কাছে তাঁর কবিতাগুলি সংগ্রামের একটি অক্ষয় নিশান হিসেবে পরিগণিত। একালে উত্থাধনর মূলে নজরুলের কাব্যের দান অপরিমেয়। এদিক দিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক মূল্য অনুপেক্ষণীয়।

তিনি অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো জটিলতায় দুরূহ হয়ে ওঠেন নি। সরলতার সঙ্গে দৃঢ়তার ভিয়ানে যে সাহিত্যরসের উদ্ভব হয় তারই অবলেপে তাঁর পৌরুষ সমাচ্ছন্ন ছিল বলেই তাঁর প্রতিভার পৌরুষও ছেড়েছে 'বিশুদ্ধ' শিল্পের সকল অলংকার, জনতার দুঃখকে তিনি জনতার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, কলাকৌশলের দিক দিয়ে তাকে ঘোলাটে করেন নি। পড়াশুনাজনিত বিদগ্ধতা ছিল না বলেই ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই নির্ধারিত 'emotion recollected into tranquility' যে কবিতা তা তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ যখন আমরা শুনি—

ঃ বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি',
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি!
... ...

যুগের না হই হুজুগের কবি
বটি ত রে দাদা, আমি মনে ভাবি, আর কবে কষি হৃদ্ পেশী
...   .
বড় কথা বড় ভাব আসেনাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে !

(আমার কৈফিয়ৎ : সর্বহারা)

তখনকার কবির গভীর মর্ম বেদনার সঙ্গে পরিচিতি হই এবং কলা-কৈবল্যবাদীর প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে সচকিত হই। শেষের দিকে তাঁর বিদ্রোহীভাব সাধকের ভাবে সমাহিত হলেও তার পৌরুষের দার্ঢ্য তাঁকে সব সময় সচেতন করে রেখেছে, ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে আচ্ছন্ন করলেও তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অরণ্যে পথ হারান নি, বারে বারে লোকালয়ে ফিরে এসেছেন, কোন অবতারকে আশ্রয় করে ভবসিন্ধু পার হবার জন্যে পিছন ফিরে দাঁড়ান নি, প্রতিভার পৌরুষের নির্দেশে তাঁর দিগদর্শনের কাঁটা সর্বদা এই পৃথিবীর দিকে অত্যাচারিত জনগণের শিবিরের প্রতি দ্বিধাহীন পক্ষপাতে শাণিত, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন করাই তাঁর সাহিত্য-সেবার লক্ষ্য। এজন্যে কবি নজরুলের, ভাবুক নজরুলের, সমগ্র সাহিত্য-সাধনায় এমন একটি বীরোচিত পুরুষ মূর্তি ফুটে উঠেছে যাকে তাঁর প্রতিভা থেকে পৃথক করে নেয়া দুঃসাধ্য।

আমাদের দেশে কবি-প্রতিভার সঙ্গে পৌরুষের মিলন কচিৎ ঘটেছে যা অঙ্গুলিমেয়। মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই মিলন সাধিত হয়েছিল। মধুসূদন বাংলা-সাহিত্যে যে বিপ্লবী ধারাটির প্রবর্তন করেছিলেন বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্য-কুঞ্জে তা এনেছিল পৌরুষের তূর্যনিনাদ কিন্তু সে-পৌরুষ-নিনাদ কিছুদূর এগিয়ে অন্ধঅনুকারকদের হাতে ব্যর্থতায় পরিণত হল—কাব্যের মোড় আবার পূর্বের মোড়ে গিয়ে পৌঁছে গেল। বাংলা-সাহিত্যে রোমান্টিক লিরিক কবিতার কাব্য-কূজন বিহারীলালের মধ্য দিয়ে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথে সে-ধারা পরিপূর্ণতা লাভ করল। রবীন্দ্রনাথ কাব্যগঙ্গাকে মানবমুখীন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মানুষের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর আক্ষেপ রয়ে গেছল—

: পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার ;
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
... ...
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে ;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

(ঐকতান : জন্মদিনে)

কবি-জীবনের এই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন,

"মানবমুখিতা রবীন্দ্রনাথের প্রধান ধর্ম হইলেও তাহাতে কোথায় যে একটি ত্রুটি বা দুর্বলতা আছে যাহাতে তিনি সুখদুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র খণ্ড দোষ-ত্রুটিবহুল মানবের অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করতে পারেন নাই। ইচ্ছা আছে, চেষ্টা আছে, কিন্তু শক্তি নাই, বারে বারে তিনি মানুষের দ্বারে করাঘাত করিয়াছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দ্বার খোলে নাই। তিনি দ্বারের বাহিরে বসিয়া অনুমানের দ্বারা কল্পনার দ্বারা আভাসে যেটুকু পাইয়াছেন তাহার দ্বারা ভিতরের জীবনযাত্রার চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, মানব-সংসারের গান গাহিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কবি-প্রতিভা সারাজীবন এই দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিয়াছে।··· ইহাই রবীন্দ্র-প্রতিভার ট্র্যাজেডি।" (রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহ)

বহুদিন পর মধুসূদনের সেই পৌরুষনিনাদ নজরুলের কণ্ঠে ঘোষিত হল সম্পূর্ণ নতুন ঢঙে নতুন রঙে। মধুসূদন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোঠায় নামেন নি ; তিনি অভিজাত সমাজে যে অনাচার দেখেছেন তাকেই তিনি প্রকাশ করেছেন। আর নজরুল নেমে গেলেন অনেক নীচে, জেগে

ওঁঠার দুর্নিবার গতিবেগ তাদের মধ্যে সঞ্চার করে দিলেন। একদিকে নিপীড়িত মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত অন্ধকুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি করেছেন নির্মম আঘাত। অপরদিকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে ভাঙিয়েছেন হতাশার অন্ধকারে গা এলিয়ে দেওয়া তাদের মোহনিদ্রাকে, কথায় কথায় অদৃষ্টের প্রতি দোহাই দেবার মনোবৃত্তিকে, উদ্বুদ্ধ করেছেন তাদের সংগ্রামী চেতনাকে। তাই—

ঃ চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির।
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি' ভেঙেছে কারা প্রাচীর।
এতদিনে তার লাগিয়াছে ভালো—
আকাশ বাতাস বাহিরের আলো,
এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ।

(ফরিয়াদ ঃ সর্বহারা)

সফল কবির জীবনটাই হোল এই রকম যে তিনি নিজেকে ভাববেন সমাজের একজন এবং জীবনের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত করবেন জীবনের সংগঠক হিসেবে। তাই যে সকল চিন্তা শুধুমাত্র নিজেকে নিয়েই মগ্ন থাকে অপরের কোন কাজে আসে না তা অতিশয় স্বার্থপরতার লক্ষণ, জীবনের সমস্ত সংঘাত-সংগ্রাম, জয়-পরাজয় থেকে পলায়ন কাপুরুষতার লক্ষণ। নজরুল এই স্বার্থপরতা ও কাপুরুষতাকে ঘৃণা করেছেন। তিনি নিজে বলেছেন,

"জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান, বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব আমি নিজেকে নিঃশেষ ক'রে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।" (চিঠিপত্র)

এ যুগের সাহিত্যের দাবী হল বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের বিকৃতরূপ প্রকাশ করার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই, বাস্তবের মধ্যে পরিপূর্ণ মানুষকে রূপায়িত করতে হবে, মানুষের আশাহত চিত্তকে আনন্দমন্ত্রে প্রবুদ্ধ করে মহত্তম সৃষ্টির পথে প্রবর্তনা দেবার জন্যে সাহিত্যকারকে সজ্ঞানভাবে শপথ নিতে হবে। তাই আজকের মানুষও চায় তার জীবনের সত্যরূপ শিল্পের

মধ্যে প্রতিফলিত হোক, আজ তারা দেখতে চায় শিল্পের মধ্যে তাদের নিজেদের জগৎকে। কবি ও পাঠকের এক হওয়া তখনি সম্ভব যখন কবি পাঠকসমাজের হয়ে কাব্য রচনা করবেন—গোর্কির কথায় কবির কাজই হোল তাই। তিনি বলেছেন,

"শিল্পী হচ্ছেন তাঁর দেশের ও তাঁর শ্রেণীর মুখপাত্র। তিনি তাঁর স্বদেশ ও সমাজের যেন চক্ষু কর্ণ আর হৃদয়। এককথায় তাঁর যুগের বাণী বা প্রতিধ্বনি। তিনি যথাসাধ্য সবকিছু জানবেন। অতীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকবে যত বেশী ততই তিনি নিজের যুগকে ভালভাবে বুঝতে পারবেন, ততই তিনি তাঁর কালের সার্বজনীন বিপ্লবীরূপ ও কর্তব্যের পরিধি তীব্রভাবে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। জনগণের ইতিহাস তাঁর জানা উচিত, শুধু উচিত বললেই হবে না তাঁকে তা জানতেই হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে জনগণের মনোভাব কি তাও তাঁকে বুঝতে হবে।"

কবি-শক্তির সঙ্গে তাব চরিত্রে পুরুষতার মিলন হয়েছিল বলেই নজরুল দেশ ও সমাজের নানা সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কবির কর্তব্যই শুধু পালন করেন নি, কবি ও পাঠকের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে কোটি কোটি নির্যাতিত জনসাধারণের মুক্তি-সংগ্রামে বুদ্ধিজীবিদের হাত মেলানোর বাধা নিজের সাহিত্য দিয়ে অপসারিত করে দিয়েছেন।

শিল্পী-যোদ্ধা নজরুল

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বর্বরতা দেখে ভিক্টর হুগো শিল্পীর কর্তব্য সম্পর্কে বলেছিলেন,—

"গোণা কয়েকটা দিন মাত্র আমাদের আয়ু। সেই দিনগুলি যেন আমরা নীচ দুর্বৃত্তদের পায়ের তলায় গুঁড়ি মেরে না কাটাই।"

কবি নজরুল এই সত্যকেই তাঁর জীবনবেদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, লাঞ্ছিত মানবতার পক্ষ নিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে এসেছেন, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার শোষণে যাদের নাভিশ্বাস উঠছে তাদেরই গান গেয়েছেন, কেননা, তারাই "ধরণীর হাতে দিল আনি ফসলের ফরমান।" তাই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, অন্য যে কোন দিক থেকে সাধারণ জন-জীবনের ওপর যখনই কোন অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তখনি তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন সবল কণ্ঠে, প্রচার করেছেন তাঁর অগ্নিবাণী যার লেলিহান শিখা স্পর্শ করেছে প্রতিটি হৃদয়।

নজরুলের বিদ্রোহ সর্বাত্মক। সমাজে যেখানে তিনি দেখেছেন শোষণ ও অবিচার, স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বেধে ক্ষুদ্রতা ও নীচাশয়তার পরিচয়, রাষ্ট্রীয় জীবনের যেখানে দেখেছেন পশুশক্তির উন্মত্ততা, ধর্মীয় জীবনের যেখানে দেখেছেন মুখোশধারী মানুষের ভণ্ডামী, সেখানেই তিনি সৃষ্টি করেছেন দাবানলদাহ। তাঁর নিজের কথায়—

ঃ যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করব সেথায় বিদ্রোহ।
ধামা-ধরা! জামা-ধরা! মরণ-ভীতু! চুপ রহো।

তাঁর বিদ্রোহের মধ্যে ধ্বংসের ক্রন্দন শুধু নেই, সৃষ্টির প্রত্যক্ষ আহ্বানও রয়েছে। নারীর মুক্তি, শ্রমজীবী জনতার মুক্তি, বুদ্ধিজীবীর মুক্তি, ধর্মের পৈশাচিক বন্ধন হতে মুক্তিই কবির লক্ষ্য। বর্তমান গলিত সমাজকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে মানুষের পূর্ণ-বিকাশের জন্যে একটি সুন্দর সুস্থ সমাজগঠন তাঁর উদ্দেশ্য, যে সমাজে সকলের সমান অধিকার থাকবে, ধনী দরিদ্রের প্রভেদ থাকবে

না,—শ্রেণী-বৈষম্য থাকবে না, শোষণ নিষ্পেষণ থাকবে না, উৎপাদনের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক অধিকার ও শ্রেণী-প্রয়োজনের দাসত্ব থেকে সংস্কৃতি পাবে মুক্তির আস্বাদ। এই সত্যকে উপলব্ধি করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি, কর্তব্যপালন করেছেন প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে নির্ভয়ে সংগ্রাম ক'রে।

নজরুল বলেছেন,

"আমার কাব্য, আমার গান, আমার অভিজ্ঞতার মধ্য হ'তে জন্ম নিয়েছে। আমি জীবনের ছন্দ গেয়ে চলেছি—এসব তারই প্রকাশ।" (বঙ্গীয় মুসলমান সমিতির অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ—মাসিক মোহম্মদী, মাঘ ১৩৪৭)।

জনগণের দুঃখবেদনাকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন বলেই সমাজের অবনত মানুষ তাঁর আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছে। এই অনুভূতির প্রাবল্যহেতু তিনি আপন সত্তার পার্থক্য ভুলে গিয়ে ঘরের বন্ধন, শ্রেণীগত বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত শুভ্র জীবন ও বৃহত্তর সত্তার জন্যে ব্যাকুলচিত্তে জনসাধারণের মধ্যে এসে দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন। বুদ্ধির কাল্পনিক আভিজাত্যকে আশ্রয় করে তিনি গণমুক্তির সংগ্রামকে এড়িয়ে থাকাকে ঘৃণা করেছেন। অন্যান্য আত্মপ্রবঞ্চক লেখকদের থেকে তাই তাঁর বাঁশীর সুর আলাদা। তাঁর রচিত সাহিত্য ভাবধর্মী কাব্যসাহিত্যের প্রতি প্রচণ্ড প্রতিবাদ। তিনি এযুগের মৌলিক আবেগের বিশেষ ভঙ্গী বুঝেছেন, বুঝেছেন জীবনের গতিশীলতা, তার নব-চেতনার মর্মকথা, তাই তাঁর সৃষ্টি একালে সবচেয়ে বেশী সমাদৃত হয়েছে এবং সমসাময়িক কালকে স্পর্শ করেও তাঁর সাহিত্যের রশ্মিচ্ছটা নিরবধিকালের সীমাহীন আকাশে বিচ্ছুরিত হয়েছে।

জনগণের চিন্তাধারা ও ভাবাবেগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয়বস্তু বেছে নিতে হবে—একথা নজরুল বুঝেছিলেন বলেই যুগধর্মের বেদনা-বোধ কবিকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল আর এরই তাড়নায় তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন ছন্নছাড়া যাযাবরের মতো। জীবনের প্রতি শিল্পীর এই মনোভাবই সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। বর্বর ফ্যাসিস্ত আক্রমণে জর্জরিত ফরাসী কবি পল এলুয়ার জবানবন্দীতে বলেছিলেন,

"সময় এসেছে যখন সব কবির উপর অধিকার ও কর্তব্য ন্যস্ত হয়েছে —এই কথা ঘোষণা করবার যে তারা অন্য মানুষদের জীবনে, সর্বসাধারণের

জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত…মূক জনতার হয়ে কথা বলবার সাহস তার থাকা চাই।"

নজরুলেরও ছিল এই ব্রত। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বন্দীকারায় নজরুলের জবানবন্দীও ছিল এই উক্তির প্রতিধ্বনি—

"আমি জানি আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয়-হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আর্ত পীড়িত আত্মার যন্ত্রণা-চীৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না, হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারা-বাণীই তাদের আরেকজনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।"

তাই রমা রল্যাঁর মতে বুদ্ধিজীবিরা হলেন মানস-ক্ষেত্রের শ্রমিক। তিনি বলেছেন

"শ্রমিকেরা যে পথ গড়ছে, বুদ্ধিজীবিদের তা আলোকিত করতে হবে। তাঁরা দুটি বিভিন্ন মজুরের দল, কিন্তু কাজের লক্ষ্য এক।……যে সংগ্রাম আজ নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি করছে তার মহান যোদ্ধা হওয়ার চাইতে বুদ্ধিজীবিদের আর বড় কোন কাজ নেই।" (শিল্পীর নবজন্ম)।

তাই নজরুল শুধু কবি নন, তিনি একজন শিল্পী-যোদ্ধা।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে গণতন্ত্রের সংগ্রাম শ্রেণী-নেতৃত্বে পরিচালিত হত। জাতীয়তা বন্ধন-মুক্তির হাতিয়ার হলেও অতি সাবধানী বিপ্লবভীরু বুর্জোয়াশ্রেণীর চক্রান্তে সাম্রাজ্য-প্রয়াসী লুব্ধতার ছদ্ম আবরণরূপে কাজ করত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় আবির্ভাব হোল নতুন জীবনবোধ ও জীবনদর্শন নিয়ে বলশেভিক রাশিয়ার। রুশ বিপ্লবের গণমুক্তির উদার উদাত্ত সাম্যবাদীয় তূর্যধ্বনি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিয়ে এল এক প্রচণ্ড ধাক্কা—জাতির জীবনে নতুন করে জাগল মুক্তি আন্দোলনের সাড়া। জাতির মুক্তি-সংগ্রাম আর আঞ্চলিকতা মানল না, দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে শ্রমজীবিদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ অধিকারের লড়াই জেগে উঠল, মুক্ত জীবনানন্দের আস্বাদের আশায় নিপীড়িত মানুষের মনে জাগল দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, সর্বহারা মানুষ অন্তরের অন্তস্থলে অনুভব করল বৃহত্তর সত্তার ব্যাকুলতা। এই সময়কার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ এবং বৈপ্লবিক আবেগকে রবীন্দ্রনাথ রূপায়িত করতে পারেননি, করেছিলেন যুদ্ধ ফেরৎ নজরুল। প্রায় একটি সম্পূর্ণ শতাব্দী তার পরস্পর-বিরোধী আবেগগুলিসমেত রবীন্দ্র-সাহিত্যে

প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু এই ছোট্ট যুগ যার মেয়াদ প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকে ১৯৩২-৩৩ পর্যন্ত তা সম্পূর্ণরূপে নজরুলের। এই ছোট্টযুগের হিংস্র দিকটার এখনও অবসান হয়নি। আমরা আজও দেখছি—

ঃ মা'র বুক হ'তে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ খাও হে ঘাস।
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ।

(আমার কৈফিয়ৎ ঃ সর্বহারা)

সমাজের কণ্ঠে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার জ্বালাময়ী প্রতিবাদের বাণী জোগানোর এই যে প্রচেষ্টা, চাষী-মজদুরদের মধ্যে স্বাধিকারের সংগ্রামকে সকলের শীর্ষে তুলে ধরা, শিল্পকে এই যে জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া তা সৃষ্টিধর্মী শিল্পীরই স্বধর্ম, নজরুল তাই সৃষ্টিধর্মী আত্মসচেতন শিল্পী। তাঁর আবেদনের মধ্যে কোন দ্বিধা নেই, কৃষক শ্রমিকদের মুক্তির মন্ত্রকে অতি-রঞ্জনের আতিশয্য বা কল্পনার অবলেপে অস্পষ্ট করে তোলেননি। স্পষ্টবাদিতা ও প্রত্যক্ষ উক্তির মধ্যেই তাঁর নতুনত্ব। তিনি যা বলেছেন তা শুধু কবিজনোচিত নয়, সৈনিকোচিত।

মানুষের প্রতি মানুষের পাপ-গ্লানি, অন্যায়-অবিচারকে নির্যাতিত মানবের দুঃখ-বেদনাকে, সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার বীভৎসতা ও কুশ্রীতাকে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, তাঁর সাহিত্যে ধ্বনিত হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের দুঃশাসন অবসানের জয়োদ্ধত ঘোষণা। তাই আজও ধনকুবেরী সভ্যতা তাঁর সাহিত্যকে ভয় করে, বুর্জোয়াপদলেহী সমালোচকরা তাঁর সাহিত্যকে বলে রাজনৈতিক গলাবাজী, উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তির অভাব, প্রতিভা তৃতীয় শ্রেণীর। সাহিত্যিক তত্ত্বকথার অবতারণা করে এখানে এসব গুরুগম্ভীর মতামত খণ্ডন বা বিশ্লেষণ করার কোন সদিচ্ছা আমার নেই, তার জন্যে আবার একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। তবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ঐ সব সমালোচনাকে মিথ্যা বলেই প্রতিপন্ন করেছে। তাছাড়া শান্তি ও সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার পর তাঁর সাহিত্য টিকবে কি টিকবে না, এ নিয়ে তিনি বুর্জোয়া কবির মত মাথা ঘামাননি, অমরতার তিনি দাবী করেননি, ভাবীকালের পথপ্রদর্শক হবার দম্ভ তাঁর নেই-

ঃ বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি,'
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি

... ...

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারিনা ত একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসেনাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।

(আমার কৈফিয়ৎ : সর্বহারা)

বর্তমানকে অস্বীকার করে সুদূর স্বপ্নচারী, আত্মসর্বস্বতার যূপকাষ্ঠে বুর্জোয়া কবিদের মত তিনি আত্মহত্যা করেননি। বরং তাঁর কথায় বলা যেতে পারে,

"বর্তমানের প্রতি উদাসীন থাকাই তো সর্বমানবের চিরন্তন স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।"

সাম্প্রতিক উপভোগ্যতার পালা সুদূর ভবিষ্যতে যদি শেষ হয়, তাহলেও তাঁর সাহিত্যের দর ও কদর সমান থাকবে, বিংশ শতাব্দী বাংলা দেশের তথা ভারতের একখানি নগ্নসত্যের ইতিবৃত্ত হিসেবে, যার মধ্যে আমাদের মত সাধারণ মানুষ নিজেদের ভাষা খুঁজে পেয়েছে, নিজেকে সজাগ করে তুলেছে। নজরুল সাহিত্যকে বাদ দিলে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস ও বাংলা সমাজ-জীবনের ইতিহাসের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান থেকে যাবে। তাই তাঁর সাহিত্য সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মহৎ সাহিত্য ও জাতীয় সাহিত্য।

দেশের মুক্তি-সাধনায় নজরুল

ভারতের তন্দ্রাচ্ছন্ন যুব-শক্তি সাহিত্যের সোনার কাঠির স্পর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে কারণ সাহিত্য জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী। সাহিত্য-শিল্পকে বাহন করে স্বাধীনতার মন্ত্র দিক থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল সেদিন। পরাধীন ভারতে শৃঙ্খল মোচনের জন্যে বাঙালী যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সবার আগে 'লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে' তার একমাত্র প্রেরণা সে তার জাতীয়-সাহিত্য থেকেই পেয়েছিল। চাষা-মজদুর আন্দোলন, হরিজন আন্দোলন, নারী-প্রগতি, কুটির-শিল্প উজ্জীবন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, অহিংস অসহযোগ, সন্ত্রাসবাদ সব কিছুরই আদি প্রেরণা দিয়েছে সাহিত্য তবেই তা মূর্ত হতে পেরেছে বাস্তব আন্দোলনে. দুঃখের বিষয় কার্যকে কারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়েছে তাই রাজনীতিক আন্দোলনের সাফল্যের পশ্চাতে সাহিত্যের এই প্রাণসঞ্চারিণী দান যে কত বড় তা কেউ ভেবে দেখেন নি। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারত সরকাব স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়ন করছেন এবং যাঁরা স্বার্থত্যাগ করেছেন আত্মত্যাগী লাঞ্ছিতদের পুরস্কৃত করছেন কিন্তু বাংলা-সাহিত্য এ সংগ্রামে কি করেছে তার অবদান যে কত বড়, শাসন-পীড়িত কণ্ঠেও বাংলা-সাহিত্য জাতীয় জীবনে যে কি উদ্দীপনা উৎসাহের সঞ্চার করেছে তা কেউ ভেবে দেখেছেন কিনা সন্দেহ। স্বাধীনতার ইতিহাস যদি কতকগুলো ঘটনার সংকলন হয়, সে ইতিহাস জাতির জীবনের ইতিহাস হবে না, হবে কতকগুলো শুকনো ঘটনার ইতিবৃত্ত মাত্র। সাহিত্য যেমন আন্দোলনকে জাগিয়েছে তেমনি আন্দোলনও সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে— বাইরে যখন কর্মের সক্রিয় সংগ্রাম চলেছে, ভেতরে তখন সাহিত্যিকের সৃজনী মনও তারি সঙ্গে পাল্লা রেখে নব নব পথে নিজেকে প্রকাশ করে গেছে। কাজেই ইতিহাস লেখা হোক উভয়কে জড়িয়ে—কাউকে বাদ দিয়ে নয়।

আজকের আলোচনা স্বাধীনতা সংগ্রামে নজরুলের সাহিত্য কি সাহায্য করেছে সেটুকুই বলা মুখ্য উদ্দেশ্য, সমগ্র ঐতিহাসিক তদন্ত নয়। তবু বক্তব্যের পটভূমির জন্যে আগে থেকে কয়েকটি কথা বলা হচ্ছে।

॥ ২ ॥

অপরের মতের সঙ্গে কতখানি মিলবে জানি না, তবে আমার মনে হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই, শুধু সূত্রপাতই নয়, সূত্রবন্ধনও। তবে কি গেল শতাব্দীতে শৃঙ্খলমোচনের কোন চেষ্টাই হয় নি? জবাবে 'কিন্তু' দিয়ে বলতে চাই, হয়েছে। 'কিন্তু' রেখে বলার কারণ হোল যারা সে আন্দোলনের মাতব্বর হয়েছেন তাঁরা হয় মধ্যস্বত্বভোগী কিংবা জমিদার নয়ত ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করে শাসন-ব্যবস্থায় নিজেদের স্থান লাভে সৌভাগ্যবান হবেন বলে তাঁবা—কাজেই তাকে বুর্জোয়াধর্মী আন্দোলন বলা যেতে পারে। বিদেশী শাসনের আওতায় বিদেশী বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের আকর্ষণে এসে এই শ্রেণী ডেরা বাধতে শুরু করেছে শিল্পাঞ্চলে; ফলে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে দেশের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বাংলার রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব তাঁদের করার অর্থ ছিল যে তাঁরাই হচ্ছেন শাসক ও শাসিতের মধ্যে হাইফেনের মত। সেজন্য স্বাভাবিক-কারণে মধ্যবিত্তের সংরক্ষিত স্বার্থ শ্রেণী-জীবনের আদর্শকে আঁকড়িয়ে গড়ে ওঠার জন্যে তার সাহিত্যেও বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য আকাশচারী কল্পনার পক্ষবিস্তার করেছে, গণতান্ত্রিক প্রেরণা ও চিন্তা, বৈজ্ঞানিক সাধনা ও দীক্ষার ধার দিয়ে চলে নি। এই প্রতিনিধিদের প্রতিবাদের মধ্যেও রয়েছে নানারকম অসঙ্গতি। যারা জমিদারি-প্রধান ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল তাঁরা সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা স্বপক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে কিংবা বিক্ষুব্ধ শ্রেণীর সংগ্রামে যোগদান করেন নি। সে শতকে বড় বড় কয়েকটি সংগ্রাম, যেমন সিপাহী বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল তাতে শিক্ষিত বাঙালীর কোন ভূমিকা ছিল না। ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার আকস্মিক আলোয় যে ইয়ংবেঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁরা মদের গেলাসে স্বাধীনতা চেয়েছেন, অবশ্য সে স্বাধীনতার মানে ইংরেজ তাড়িয়ে দেয়া নয়, আর্থিক দিক থেকে মুক্তি নয় বরং ভূষি পেলে তুষ্ট হতে ঘুঁষি খেলে বাঁচব না গোছের। এজন্য দেখি জনগণের সংহত জাগরণের কোন নজীর গেল শতাব্দীর ইতিহাসে নেই—স্থানিক ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

আগেই বলেছি আমাদের তথাকথিত স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা মাথা ঘামিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেই বারবার দেখা দিয়েছে দ্বিধা, কুণ্ঠা, সাহসের শোচনীয় দৈন্য। কাজেই বাংলা-সাহিত্য যা প্রধানতঃ বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহিত্য তাঁদের মানসলোকেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ছাপ দেখা দেবে তাতে বিস্মিত হবার কি আছে—বাঙালীর রাজনীতিক ইতিহাসের দৈন্যই যে তার কারণ। সামন্ত-তান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধাচরণ করা সাহিত্যিকদের সাহসে কুলোয় নি—মাঝে মাঝে একটু হুমকি দিলেও পরে এমনভাবে চুপসে গেছেন যে ইংরেজ-শাসনকে প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করে তল্পিদার হতে লজ্জা পান নি। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন কোন কোন লেখক যেমন দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" নাটকেই শাসকের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে, ভূমিহীন চাষী-মজুর, বিত্তহীন সম্প্রদায়ের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে, আম-জনতার মধ্যে অত্যাচার প্রতিরোধ করার দৃঢ়তা দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া সে-যুগে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি আরো অনেক সাহিত্যরথী। তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যেটুকু দাঁড়িয়েছেন সেটুকু নির্যাতিত জনতার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে নয়, বরং আন্দোলনকে মাঝে মাঝে ভৎর্সিত করেছেন। তাঁদের যে জাতীয়তাবোধ ছিল তা নিশ্চয় ইংরেজের বিরুদ্ধে সন্ত্রস্ত সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেনি, এ স্বপ্নও তাঁরা দেখেন নি। ইংরেজি-জানা বাঙালীরা ইংরেজের সঙ্গে মিতালী করেছে। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় স্বদেশ প্রেমের আভাষ থাকলেও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়গান করেছেন—

ঃ রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে,
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি,
তোমার জয়ের বাসনা।

বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'এ স্পষ্টই বলে ফেললেন,

"ইংরেজরা বাংলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এ গ্রন্থে বুঝানো গেল।……ইংরেজ আমাদের শত্রু নহে…ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।" ইত্যাদি।

কৃষকদের সম্বন্ধে কিংবা চলতি ঘটনার ওপর শাসকের বিরূপ মন্তব্য একটু আধটু লিখলেও তাঁর মনোভাব ইউরোপীয় মিল বেন্থাম, রুশো, কোঁৎ প্রমুখদের রচনাবলীর অনুবাদ মাত্র। তাঁর জাতীয়তাবোধ রক্ষণশীল হিন্দুদের

হিন্দুত্ব-আদর্শে পুষ্টিলাভ করেছিল বলেই তিনি কতকগুলো উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের চেহারাকে এমন বিকৃত করে দেখেছেন যে তাঁর কাছে বর্ণহিন্দুর সংহতি ও পরিপুষ্টিই প্রকৃত দেশাত্মবোধের পরিচায়ক। তবে ইয়ংবেঙ্গলের যথেচ্ছাচারে যখন দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষার ভাব দেখানো হচ্ছে, ইংরেজী সভ্যতা ও শিক্ষার বাইরে যে আর কিছু ভাল জিনিষ থাকতে পারে তা তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না, সে-সময় বঙ্কিম জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন করেছিলেন ; তাতে ত্রুটি যাই থাক দেশের বিমূঢ় দৃষ্টিকে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে সংস্কৃত করতে চেয়েছিলেন। এদিক দিয়ে তিনি ঋষিতুল্য ব্যক্তি সন্দেহ নেই।

সামন্ততান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে জনতার ছোটখাট মালমশলা নিয়ে সাহিত্য রচনা খুব বেশী হয়নি সেদিন ; টডের রাজপুত কাহিনী, হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রাম, মোগল বা পাঠান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব গুজরাটের দেশাত্মবোধক হিন্দুসামন্তশক্তির প্রতিরোধ কাহিনী সত্য-কল্পনায় মিশিয়ে উদ্দীপিত ভাষায় বলা হয়েছে প্রচুর—আদর্শবাদী দেশপ্রেম সেদিন বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি বরং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক দুরত্বের ভাব ক্রমশঃ গড়ে উঠেছিল।

গেল শতকের সৃষ্টির মধ্যে যতই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাক না কেন সেই সৃষ্টির মাধ্যমেই আমরা সঞ্জীবিত হয়েছি, তার ওপর আমাদের আন্দোলনের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তোলার প্রেরণা ঐসব সত্যে-কল্পনায় মিশিয়ে কাহিনীর দ্বারাই শিক্ষালাভ করেছি। তাছাড়া গেলো শতকের সাহিত্য থেকে আমাদের আরো একটি লাভ হল যে আমাদের দেশপ্রেম গোড়া থেকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে তৈরী হয়েছে, প্রাদেশিকতা উঁকি মারে নি।

পরে ইংরেজ শাসনের আর্থিক শোষণ ক্রমশঃ নব্যবাবুদের পকেট ধরে টান দিল, তখন তাঁরা সুপ্তসিংহের মত জেগে উঠলেন, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আদিগন্তব্যাপী ডাক দিলেন, তখন কিন্তু স্বদেশী যুগ সুরু হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন জেগে উঠল তাকেই বলা হয় স্বদেশী আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অগণ্য সহযোগী বাংলার জনতাকে সংগ্রামী করে তুললেন—এই আন্দোলন থেকেই আদর্শবাদী দেশপ্রেম ক্রমশঃ বাস্তববাদী হয়ে উঠতে সুরু করল। দেশের সামান্যতম

ঘটনাকে বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলা সাহিত্যিক-ব্রত হয়ে উঠল। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর আত্মদানের কাহিনী গানে কবিতায় বাংলার পল্লীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল—শাসকের অত্যাচারের কাহিনী প্রতি লোকের কানে পৌঁছে দেওয়া হল। কাউকে বাদ দিয়ে নয় সবাইকে নিয়ে সংগঠিত আন্দোলন এই সময় থেকেই সুরু হয়েছে। এছাড়া বাংলার যা নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতি তা উদ্ধার করে বাঙালীকে স্বাধীনতা মন্ত্রে উজ্জীবিত করা এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। গেল যুগের সাহিত্যের মধ্যে যে স্বদেশপ্রেম ইতস্তত ছড়িয়েছিল সেগুলোকে একত্র করে সেদিনের আন্দোলনের উপযোগী মূল্যায়ন নির্ধারণ করা হল। যে 'বন্দেমাতরম' গান বঙ্কিম লিখেছিলেন উপন্যাসের প্রয়োজনে, সেই গানকেই ইংরেজ-বিতাড়নের মন্ত্ররূপে গ্রহণ করা হল। আমরা মধু-বঙ্কিম-হেম নবীনকে জাতীয় কবি হিসেবে বরণ করলাম এবং এই আন্দোলনেব উত্তাপেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, কামিনীকুমার, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল-প্রসাদের গান, অক্ষয় মিত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, রমাপ্রসাদ চন্দ, দীনেশ সেন, নিখিল রায়ের ইতিহাস রচিত হয়েছে। একদিকে এসব সাহিত্য জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডে শক্তিসঞ্চার করেছে অন্যদিকে জাতির দৃষ্টিভঙ্গী ও মননশীলতাকে নব নব প্রবণতার পথে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিয়েছে এবং এই সাহিত্যের কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে বাংলা থেকে আন্দোলন উৎসারিত হয়ে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হয়েছে। সাহিত্যেব দ্বারা অনুপ্রাণিত জনতাকে সংগ্রামের পথে চালিত করেছেন রাজনীতিক নেতারা। আন্দোলনের পটভূমিকায় সাহিত্য না থাকলে বাঙালীর ঘুমন্ত শৌর্যকে ভাঙিয়ে নেতারা আন্দোলন আনতে সক্ষম হতেন কিনা সন্দেহ।

॥ ৩ ॥

স্বদেশী আন্দোলনের পর এল অসহযোগ আন্দোলন—একটা প্রবল আলোড়নে দেশ টলমল করছে। পরাধীনতার আগুন মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করছে এক দাবদাহের। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এদেশের জনসাধারণ

তখন সক্রিয় সংগ্রামে পা দিতে চলেছেন। বাঙালী জীবনের এই একটা সুতীব্র রাজনৈতিক প্রকাশ আবার বাঙালী স্রষ্টাকে ব্যাকুল করেছে। এই আন্দোলনের সাহিত্য-সারথ্য গ্রহণ করলেন নজরুল ইসলাম। নতুন আশার বাণী নিয়ে করুণ গন্ধঢালা চেতনার পরিবর্তে শোনালেন অগ্নিবীণার ঝঙ্কার—

: আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।
ঐ বামন বিধি সে, আমারে ধরিতে বাড়িয়েছিল রে হাত
মম অগ্নি-দাহনে জ্ব'লে পুড়ে তাই ঠুঁটো সে জগন্নাথ।
আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী,
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি,
আমি জানি জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তাও।
তাই বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তা'ও!

(ধূমকেতু : অগ্নিবীণা)

সাম্রাজ্যবাদীর কূট চক্রান্তকে ফাঁসিয়ে দিতে দেশকে তিনি আহ্বান করলেন এক মহান কর্তব্যের সম্মুখীন হতে—

: ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব জীবনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান.
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

(চল্ চল্ চল : সন্ধ্যা)

আমাদের সাহিত্য প্রাণবান হ'য়ে উঠল নতুন ভাবে, নতুন ছন্দে, নতুন ভাষায়। অন্যায় কুসংস্কার ও জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর রুদ্র বীণার বজ্রঝঙ্কারে উৎসারিত হল তীব্র ক্ষোভ, পার্লামেণ্টারী স্বরাজের ও আপোষকামী বেশ্যা রাজনীতির মুখোশ ছিঁড়ে ফেললেন কবি।

মানুষের জীবনের প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধা থেকেই তিনি বিদ্রোহের অগ্নি-মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। তিনি সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন মানুষের জীবনকে আর মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি কোনদিন, জীবনের মর্যাদাকে যা-কিছু খর্ব করতে চেয়েছে তাকে তিনি কখনও ক্ষমা করতে পারেন নি, তেমনি সহ্য করতে পারেন নি সমাজ ও জাতীয় জীবনের মিথ্যা আড়ম্বর, কাপুরুষতা, চিত্তের দৈন্য, ভিক্ষার প্রবৃত্তি, মূঢ় নিশ্চেষ্টতাকে। অত্যাচার অবিচার যেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেখানেই ধ্বনিত হয়েছে তাঁর বজ্রগর্জন, মানুষের সঙ্গে মানুষের কৃত্রিম পার্থক্যের ফলে যে সমাজ গড়ে উঠেছে আর এই পার্থক্যকে যে ব্যবস্থা ও নীতি ক্রমাগত শোষণ করে চলেছে সেই সমাজের বিরুদ্ধেই তিনি ধ্বনিত করে তুলেছেন বিদ্রোহের সুর। তাঁর বিদ্রোহের মূলমন্ত্র দাসত্ব নয়—স্বাধীনতা, রক্ষণশীলতা নয়—অগ্রগতি, ভীরুতা নয়—সাহস। যে জীবন স্থবির নয়, সবসময় চলমান সে-জীবনের জয়গানই তিনি গেয়েছেন। রমাঁ রলাঁ নিজস্ব সাহিত্য স্থষ্টির দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বলেছিলেন,—

> "My activities have always and in every case been dynamic. I have always written for those who are on the move. Life will be nothing to me if it is not movement —straight ahead, of course !"

নজরুলের সাহিত্য-স্থষ্টিও সেই গতিময় জীবনের স্বীকৃতি—

: আমি গাই তারি গান—
দৃপ্ত-দম্ভে যে-যৌবন আজ ধরি' অসি খরসান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।

... ...

—গাহি তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।...

(আমি গাই তারি গান : সন্ধ্যা)

তিনি কবিতায় গানে বাংলার তন্দ্রাচ্ছন্ন যুবশক্তিকে বারবার আহ্বান করেছেন যারা বন্ধন মোচনের জন্যে আত্মপ্রকাশের দ্বারা মরণের মুখে অকুতোভয়ে ছুটে যাবে—

৫ঃ অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা শুন্!
মোদের পিছনে চীৎকার করে পশু, শকুন।
ভ্রুকুটি হানিছে পুরাতন পচা গলিত শব,
রক্ষণশীল বুড়োরা করিছে তাহারি স্তব
শিবারা চেঁচাক, শিব অটল!
নির্ভীক বীর পথিক দল,
জোর কদম্ চল রে চল্॥

(অগ্র-পথিক : জিঞ্জীর)

তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন জাতীয়তাবোধের চেতনা, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও বিক্ষোভের বহুমুখী চিত্রকে জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বলেই তাঁর সাহিত্যে পাই প্রাণধর্মের উচ্ছলতা। দেশের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংগ্রামের সাথে নিজের যোগ রেখেছিলেন বলেই অসহযোগ আন্দোলনে দেশের শক্তিকে আবার নতুনভাবে জাগ্রত করেছিলেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে 'ধূমকেতু' কাগজ বের করেন—অগ্নিগর্ভ লেখনী থেকে বজ্রবিষাণ বেজে উঠল। সরকারের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করার জন্যে তাঁর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল। তাঁর একাধিক বই রাজদ্রোহের অপরাধে বাজেয়াপ্ত হল। আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করেও তিনি সংগ্রামী জনতার মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন নি। কোন বিশেষ রাজনীতিক মতামতের অন্ধ দাসত্ব তিনি করেন নি। তিনি প্রত্যেক দলের হয়ে কাজ করেছেন। মনে হতে পারে তাঁর কোন নির্দিষ্ট রাজনীতিক অভিমত নেই, কিন্তু সে-ধারণা অমূলক এইজন্য যে কোন কবি বা সাহিত্যিক নির্দিষ্ট বাঁধাবুলি আওড়িয়ে সমস্ত বিষয়কে একই ছকে ফেলে দিতে পারেন না। যাদের নিয়ে পার্টির কাজ সেই মেহনতী মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন। সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির যখন সংপৃক্ত ঘটে তখন মস্তিষ্কের চেয়ে হৃদয়বৃত্তির চর্চা হয় বেশী। আবার বিশেষ করে নজরুলের মত কবি—যিনি সব কিছুতেই উচ্চকণ্ঠ ও বিচিত্রভাষী প্রগলভ। নজরুল তখনকার রাজনীতিতে এনেছিলেন উন্মাদনা অস্থির চঞ্চল মানসিকতা, স্থিতিহীন উচ্ছ্বাস, গতির উদ্দীপ্ত আবেগ যা চিন্তার

প্রতিবন্ধক হলেও চিন্তার পরে যে কাজ না হলে চিন্তা বন্ধ্যা হয় সেই কাজের পক্ষে কিন্তু অত্যাবশ্যক। মতাদর্শের চেয়ে তাঁর কাছে কাজ করার মূল্য ছিল সর্বোচ্চ। কাজের বেলায় নিজস্ব মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কাজে ফাঁকি দেওয়ার যে মনোবৃত্তি আমাদের তথাকথিত নেতাদের রয়েছে তা থেকে তিনি মুক্ত। গোটা বাংলাদেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তিনি উন্মাদনাময়ী কবিতার সাহায্যে জনগণের জড়তা ভেঙেছেন। বাংলার যুব ও ছাত্র সমাজ কবির এমন অন্ধ ভক্ত ছিল যে কোথাও কোনো সভা-সমিতিতে কবি গান গাইবেন শুনলেই হাজারে হাজারে দল বেঁধে গিয়ে উপস্থিত হত। কবিকে কাঁধে করে নিয়ে নগর পরিভ্রমণ করত। অবস্থার গুরুত্ব দেখে শাসকবর্গ পুলিশ লেলিয়ে কিংবা ১৪৪ ধারা জারি করে সভা মাঝে মাঝে বন্ধ করে দিত। আন্দোলনের উপযোগী ক্ষেত্র তিনি তৈরী করে দিতেন আর দেশের নেতৃবৃন্দ তাকে স্বাধীনতার পথে চালিত করতেন। সচেতন অবস্থা নির্ধারণ করার মত মানসিক অবসর তাঁর ছিল না। বায়রণ সম্পর্কে গ্যেটে বলেছেন—চিন্তা করতে গেলেই সে বিদ্রোহী শিশু হয়ে পড়ে। নজরুলের অবস্থাও হয়েছে তাই।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন আমাদের চেতনাকে বিপ্লবমুখী করেছিল সন্দেহ নেই, যেমন মেদিনীপুরের চাষীরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করল, শিখচাষীদের বিদ্রোহ কিন্তু যেমনি চৌরিচৌরায় রক্তপাত দেখা দিল সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। বুর্জোয়া নেতৃত্বের এই দ্বিধা দুর্বল জড়ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অবিশ্বাস ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল নজরুলের কাব্যে সেটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। গান্ধীজীর আন্দোলনের বৈপ্লবিক চেতনা কবিকে মুগ্ধ করেছিল আবার যখন সেই চেতনা শ্রেণী-নেতৃত্বের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ল তখন তাকে কবি ভৎর্সনা করেছেন—

ঃ সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, ব'সে ব'সে কাল গুণি!
জাগোরে জোয়ান! বাত ধ'রে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি!

(সব্যসাচী ঃ ফণি মনসা)

কংগ্রেস সেদিন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল অথচ তার কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে এমনই ত্রুটি ছিল যে তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতে দেখা দিল অস্থির মানসিক ভাবাবেগ—সন্ত্রাসবাদী মনোবৃত্তি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার

লুণ্ঠনের আগে পরে পর পর অত্যাচারী কয়েকজন সাহেব ও তাদের সাহায্যকারী এদেশী মানুষ নিহত হল টেরোরিস্টদের হাতে। এতে শাসকশ্রেণী ভীত হল কিন্তু জনতার মধ্যে এ আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। না পারলেও নজরুলের কবিতা এঁদের প্রেরণা দিয়েছে। রাজনৈতিক পরাজয়ে অর্থাৎ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ব্যর্থতায় আমরা ভাবছিলাম গণজাগরণের কথা। কিন্তু সে-সম্পর্কে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা বা সঙ্কল্প ছিল না। ফলে এক-একটি মতবাদী অনুযায়ী এক-একটি পথ গজিয়ে উঠেছে। দেশবন্ধু দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে স্বরাজ্যদল গড়লেন। সেদিন নজরুল ছিলেন অবিশ্বাস্য রকমের জনপ্রিয় কবি। দেশবন্ধু তাঁকে নিজের দলে নিয়ে এলেন। কিন্তু ফাঁকা ভেজাল পলিটিক্সের বুলি নজরুলের মনঃপূত হল না—দেশের গরীব দীনদুঃখীদের অভাবমোচন কিংবা তাদের সমতলে নেমে আন্দোলনকে তাদের মধ্যে বইয়ে দেবার কোন প্রচেষ্টাই দেখা গেল না। দেশবন্ধুর মহৎ উদার প্রাণ থাকতে পারে, 'Swaraj for 95 percents' এ ঘোষণাও তাঁর, গরীবদের জন্যে তিনি ভাবতেন কিন্তু তার চারপাশে যাঁরা ছিলেন তারা দীন দুঃখীদের সহিত মাখামাখি পছন্দ করতেন না—তাঁরা এসেম্বলিতে প্রবেশের জন্যে ভোট-ভিখারী ছিলেন। নজরুল এঁদের সম্পর্কেই বলেছেন—

ঃ হায় গণ-নেতা ভোটের ভিখারী, নিজের স্বার্থের তরে
জাতির যাহারা ভাবী আশা, তারে নিতেছ খরিদ করে।

ঠিক এই সময়তেই গৌরবময় রুশ বিপ্লবের চিন্তাধারার অনুপ্রেরণায় ভারতের নতুন পরিস্থিতিকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করার কথা মুষ্টিমেয় নিঃসঙ্গ বুদ্ধিজীবিরা তখন ভাবতে শুরু করেছেন। তাদের সঙ্গে নজরুল হাত মেলালেন, দেশের সবহারা শ্রেণীর সঙ্গে এই আত্মনিয়োগ তাঁর কাব্যে খুবই সুস্পষ্ট—শ্রমিক-কৃষকদের সম্বন্ধে কবিতাগুলি তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের প্রাথমিক আন্দোলনে কবির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। অর্থাভাবে পার্টির নেতৃবৃন্দ যখন অনাহারে দিন যাপন করছেন, মীরাটে ষড়যন্ত্র মামলা চলছে তখন কবি বিভিন্ন গানের জলসার আয়োজন করে পার্টি-তহবিলে টাকা তুলে দিয়েছেন। আজ পার্টি সবহারা জনগণের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার মূলে রয়েছে নজরুলের কবিতা। বাংলার জাতীয় আন্দোলনকে তিনি সমাজের নীচু-তলার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন—যুগধর্মের তাড়নাতেই mass contact

প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। শ্রমজীবী মানুষের রক্ত ও ঘামের মূল্য, বাঁচবার জন্মগত অধিকারকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিতেই স্বাধীনতা আন্দোলন মেহনতী মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। জীবনের কঠিন মৃত্তিকা থেকে শিকড় তুলে নিয়ে নিষ্ফল বিক্ষোভে কাব্যকে শুকিয়ে মারার কথা তিনি কোনদিন চিন্তাও করেন নি। তাঁর সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে এইখানেই পার্থক্য, গুরুতর পার্থক্য। তাঁর কাব্য-সাধনাকে তিনি অনায়াসেই বিপ্লবী রাজনীতির সামিল করতে পেরেছিলেন। তিনি সাহিত্যকে সামাজিক প্রগতির অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলেই বাংলার বিপ্লবী তরুণ হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছে আজাদীর যুদ্ধে। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও তাঁর কণ্ঠে সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে—

ঃ তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে করব তারে লয়,
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল॥

(শিকল পরার গান ঃ বিষের বাঁশী)

॥ ৪ ॥

বিদ্রোহী কবি নজরুলের মতবাদ ছিল বিপ্লবাত্মক। প্রথম থেকেই তিনি বিপ্লবের পূজারী ছিলেন। "অগ্নি-বীণার" ছত্রে ছত্রে এই বিপ্লবের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তারপরই যখন মহাত্মাজী অহিংসার মাধ্যমে নতুন কর্মপন্থা নিয়ে এলেন তখন দেশবাসী তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করল। কবি সমাজছাড়া জীব নন।— তিনিও মহাত্মাজীর কর্মপন্থাকে সমর্থন করলেন।

ঃ আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে
ঐ ফুল-ফুটানো পা ফেলে॥

(বাংলার মহাত্মা ঃ ফণি মনসা)

অসহযোগ আন্দোলন মানুষকে সক্রিয় করে তুলল কিন্তু স্বরাজ এনে দিতে পারল না। নজরুলও দেখলেন—দাও দাও বলে চাইলেই দাবী পূরণ হয় না,

অমানুষিক শাসন ও শোষণের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে হলে বিপ্লব চাই। তিনি আবার তুলে ধরলেন শক্তিশালী লেখনী। তাঁর কণ্ঠেই শুনলাম নিষ্ক্রিয় আন্দোলনের তীব্র ধিক্কার—

ঃ ধর্ম-কথা প্রেমের বাণী জানি মহান উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়ে যে বেকুব!
"ব্যাঘ্র সাহেব, হিংসে ছাড়, পড়বে এসো, বেদান্ত!"
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ অম্‌নি হবে কৃতান্ত!
থাকতে বাঘের দন্ত নখ
বিফল ভাই ঐ প্রেম-সেবক!
চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দ্দূলও হয় বেদ-পাঠক,
প্রেম মানে না খুন-খাদক।
ধর্ম-গুরু ধর্ম শোনান, পুরুষ ছেলে যুদ্ধে চল্!
সেও ভি আচ্ছা, মরব পিয়ে মৃত্যু-শোণিত-এল্‌কোহল্!

(বিদ্রোহীর বাণী ঃ বিষের বাঁশী)

নজরুলের যে সমস্ত কবিতা জনগণকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিযে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে সেগুলোকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়—(ক) বিদ্রোহ-মূলক কবিতা, (খ) দেশভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনমূলক কবিতা, (গ) পরাধীনতাজনিত বেদনা-বিহ্বল কবিতা, (ঘ) ব্যঙ্গ কবিতা।

বিদ্রোহমূলক কবিতা, যথা 'বিদোহী', 'প্রলযোল্লাস', "ধূমকেতু', 'আত্মশক্তি', 'যুগান্তরের গান', 'ভাঙার গান', "দুঃশাসনের রক্ত পান' ইত্যাদি কবিতায় জাতিকে নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলেছেন। এই বিদ্রোহমূলক কবিতার মধ্যেই সামাজিক সংস্কারের গণ্ডী উত্তরণের কঠোর আহ্বান আছে। 'আগমনী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা' ইত্যাদি কবিতায় হিন্দু সমাজের ক্ষুদ্রতা নীচতাকে আঘাত করে জাগ্রত করতে চেয়েছেন আ'. 'কোরবানী', 'মোহররম', 'জুলফিকার' প্রভৃতি কবিতা ও গানে সমাজকে সজাগ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম দুনিয়ায় যে মুক্তি-আন্দোলন আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেদিন খেলাফতের ওপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম অবমাননায় ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মন যেরূপ বিক্ষুব্ধ ও আন্দোলিত

হয়েছিল—সেদিনকার আবহাওয়ায় কবি এই বিদ্রোহেরই আহ্বান জানিয়েছিলেন। পৃথিবীর সর্বদেশে যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ক্রমেই তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠছে নজরুলের বিপ্লবী কাব্যের মূল-সুরের সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্য।

স্বদেশ বা বিদেশের যখন যে বিপ্লবী নেতা স্বৈরাচারী রাজশাসনের বিরুদ্ধে শোষিত জনশক্তির পক্ষ থেকে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন নজরুল তাঁকে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছেন। তুরস্কের কামাল পাশা, মিশরের জগলুল পাশা, মরোক্কর রীফ সর্দার, আফগানিস্তানের আমানুল্লাহ থেকে শুরু করে লোকমান্য তিলক, অশ্বিনীকুমার, দেশবন্ধু, যতীন দাস, বাঘা যতীন, আশুতোষ আরও অনেক জানা-অজানা দেশ-প্রেমিকদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

পরাধীনতার জন্যে আক্ষেপ ও গ্লানি তাঁর কবিচিত্তকে উদ্বেল করে তুলেছে। উপরোক্ত কবিতাগুলির মধ্যে এই গ্লানির কথা ব্যক্ত করেছেন—

ঃ "এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে", হে ঋষি
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চরিতেছে দিবানিশি।

চিরঞ্জীব জগলুল ঃ জিঞ্জীর)

ঃ পরের মুলুক লুঠ করে খায়
ডাকাত তারা ডাকাত
তাদের তরে বরাদ্দ ভাই
আঘাত শুধু আঘাত।

(কামাল-পাশা ঃ অগ্নি-বীণা)

ঃ তোর গাঁয়ের মাঠে রবিফসল ছবির মতন লাগে,
তোর ছাওয়াল কেন খাওয়ার আগে নুন লঙ্কা মাগে ?
তোর তরকারীতেও সরকারী কোন্ ট্যাক্স বুঝি বসে !
তোর ইক্ষু এত মিষ্টি কি হয় চক্ষু জলের রসে ?

(উঠ রে চাষী ঃ নতুন চাঁদ)

হিন্দু-মুসলমান বিরোধে কবির মন ব্যথায় ভরে উঠেছে—

ঃ (ওরে) তোরা করিস লাঠালাঠি (আর) সিন্ধু ডাকাত লুঠছে ধান !
(তাই) গোবর-গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় শেয়ান ॥

(মিলন গান ঃ ভাঙার গান)

কিন্তু তাঁর বৈপ্লবিক মনোভাব শতব্যর্থতায় মুসড়ে পড়েনি, তিনি সব সময়েই জয়ের আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন—

: (ঐ) বিশ্ব ছিঁড়ে আনতে পারি, পাই যদি ভাই তোদের প্রাণ।
(তোরা) মেঘ বাদলের বজ্রবিষাণ (আর) ঝড় তুফানের লাল নিশান॥

(মিলন গান : ভাঙার গান)

নির্ভয়ের বাস্তবশক্তি থেকে তাঁর আশাবাদ উৎসারিত, সেজন্যে তাঁর কাব্যে ভয় নেই, নৈরাশ্য নেই।

তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে নজরুল পরাধীনতার মর্মজ্বালা ব্যক্ত করেছেন। "চন্দ্রবিন্দুর" কবিতাগুলির মধ্যে এই ব্যঙ্গ-প্রধান কবি-দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বর্তমান তাঁর কাছে শুধু দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি নয়, তাঁর কাব্য আসন্ন ভবিষ্যতের জন্যে আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মন্ত্রেও সঞ্জীবিত। শাসক-শ্রেণী ও সমাজপতিদের অকথ্য অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে শুধু বিদ্রোহ বিপ্লব আনয়ন করেন নি—অত্যাচারিত নিপীড়িতদের প্রতি বেদনাবোধ থেকে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের উপযোগী সমাজ গড়ে তোলার জন্যে তিনি শান্তি ও সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ স্থাপনের ভৈরব আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এ সাম্যবাদ যদিও আজকের মার্কসীয় সাম্যবাদ বিচারে দোষদুষ্ট, কেননা একদিকে তিনি সাম্যবাদে একান্ত বিশ্বাসী, অন্যদিকে এমন নেতার বন্দনা করেছেন সাম্যবাদের সঙ্গে যাঁদের অহি-নকুল সম্পর্ক। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে সেদিন তিনি যে কমরেড বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, তাঁদের মনের দিগন্তে প্রকৃত সাম্যবাদ কী সেটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আমরা যখন তা জানতাম না তখন আমাদের নিজের মানুষ নজরুলই বা জানবেন কি ক'রে?

দেশ বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে তবু অত্যাচার ও নিপীড়ন সমানে চলেছে। মাথাভারী শাসনের টাকা আদায় করা হচ্ছে গরীবের রক্ত শোষণ করে, ঢাক পিটানো হচ্ছে তাদের রক্তশূন্য চামড়ায় ঢোল তৈরী করে। যেখানে মানুষ দুটো শাক-ভাতের প্রত্যাশী সেখানে উজীরে আজম নীল চশমা এঁটে বলছেন ফলমূল খাও, মাছ-মাংস খাও, দুধ খাও। ফ্রান্সের রাণী মারি আঁতোয়ানেতের সেই রুটি না পায় তো প্রজারা কেক খায় না কেন—কুখ্যাত

উক্তিকেও লজ্জা দেয়। মানুষের জীবনকে নিয়ে পরিহাস করার এত বড় স্পর্ধা আর কখনো ঘটেছে বলে তো জানা নেই। তাই আজো নজরুলের কবিতার প্রয়োজন রয়েছে কারণ তিনি যে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তা শুধু সাদার জায়গায় কালোর রাজত্ব নয়, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙাই নয়, সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত মানুষকে সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকার আর্থিক স্বাধীনতাও চেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ বিদেশী শৃঙ্খল মোচনের সাধনা শেষ হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় বাকী। এক সংগ্রামের চারণ-কবি হয়েছেন তিনি, আন্দোলনের সঙ্গে নিজেও সেদিন জড়িত ছিলেন। কিন্তু আজ যখন উৎপীড়নের স্টীমরোলারে শাসক-শ্রেণী জনতার খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দাবিয়ে চলছে তখন আন্দোলনের পুরোভাগে তাঁকে আবার আমরা পেতে চাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবি আজ এক বোধশক্তিহীন দুরারোগ্য ব্যাধিতে নির্বাক।

নজরুল-সাহিত্যের গণবাণী

এক ল্যাটিন কবি বলেছিলেন, "Homo sum humani nihil a me alienum puto—মানুষ আমি, মানুষ সম্পর্কিত কোন কিছুই আমার কাছে উপেক্ষার বিষযবস্তু হতে পারে না।" তাই শিল্পের অন্তিম বিষয়বস্তু মানুষ। এতোদিন মানুষ নিযে সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সে মানুষ ছিল ওপরতলার রাজা-রাজড়া 'the princes and prelates', সভ্যতার যারা পিলসুজ যাদের গাযে তেল গড়িযে পড়ে সেই সাধারণ মেহনতী মানুষ সকালে উঠেই যাদের মুখ দেখতে হয, সৃষ্টির মধ্যে তারা ছিল অন্ত্যজ। আমাদের বাংলা-সাহিত্যেও আমরা দেখেছি এরই প্রতিফলন—শাসক ও সামন্তশ্রেণীর আস্ফালন। এই অপাংক্তেযদের অনাদৃত জীবনের সুষমা ও গরিমার দিকে আলোকপাত করে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিমায যিনি এনে দিলেন এক বিরাট পরিবর্তন, তিনি প্রগতি-সাহিত্যের উদ্বোধক কবি নজরুল ইসলাম। সাহিত্যে পুরোণো গতির ধারাবাহিকতার পরিবর্তনের নাম সাহিত্যে প্রগতি। প্রগতি-সাহিত্যে জনতার কথাই থাকে, ধনতন্ত্রের শত্রু হল তারা আর শিল্পী তখনই প্রগতিপন্থী যখন তাঁর জীবনবোধ তাঁকে এমন একটা সচেতনতা দান করে যে তার রচিত সাহিত্যে জীবনের পূর্ণ স্বীকৃতি পাওযা যায। জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুল নিরন্ন ব্যথাক্লিষ্ট জনতার কথাই গেয়েছেন, তাই যুগসমস্যার প্রতি ও যুগাদর্শের প্রতি তিনি নিষ্ঠাবান প্রগতিশীল শিল্পী। তাঁর ব্যক্তিসত্তা যুগসত্তায বিগলিত হয়ে যুগচেতনাকেই বিশেষভাবে মুক্তিদান করেছে, তাঁর ব্যক্তিকণ্ঠে আমাদের যুগটাই কথা কয়ে উঠেছে। 'ক্ষোভ-ঘৃণা ভর্ৎসনা-জুগুপ্সার ক্ষতসঞ্চারী'তে বিদীর্ণ পুঞ্জীভূত যুগের ক্রোধ জীবন-রুদ্রের উপাসক নজরুলের অসংখ্য সৃষ্টিতে উদ্দীপিত ও মর্মরিত হয়ে উঠেছে। মানুষের প্রাণচাঞ্চল্য যেখানে স্তিমিত, জীবনের গতিবেগ যেখানে স্তব্ধ সেখানে কবি উচ্চারণ করছেন উজ্জীবন-সঙ্গীত, মুক্ত প্রাণধর্মের নীতিকে জয়যুক্ত করার জন্যে অমর যৌবনের আগ্নেয় দুর্দান্ততাকে চাবুক মেরে সজাগ ক'রে তুলেছেন। তাই তিনি মুক্তযৌবনের দুঃসাহসী কবি—

ঃ জাগো দুর্মদ যৌবন ! এসো, তুফান যেমন আসে,
সুমুখে যা পাবে দ'লে চ'লে যাবে অকারণ উল্লাসে ;
আনো অনন্ত-বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি,
কুলের আবর্জনা ভেসে গেলে হবে না কাহারও ক্ষতি।
বুক ফুলাইয়া দুখেরে জড়াও, হাসো প্রাণ-খোলা হাসি,
স্বাধীনতা পরে হবে—আগে গাও "তাজা ব-তাজার" বাঁশী।
... ...
সাগরে ঝাঁপায়ে পড অকারণে, ওঠ দূর গিরি চুড়ে
বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে !
ভোলো বাহিরের ভিতরের যত বদ্ধ সংস্কার,
মরিচা ধরিয়া প'ড়ে আছ সব আলির জুল্‌ফিকার।
জাগো উন্মাদ আনন্দে দুর্মদ তরুণেরা সবে,
নাইবা স্বাধীন হ'ল দেশ, মানবাত্মা মুক্ত হবে !

(দুর্বার যৌবন ঃ নতুন চাঁদ

নজরুলের বিদ্রোহকে যদি কেউ পাইলেট-পন্থী শিল্পীর বিলাস বলে মনে করেন তাহলে তিনি ভুল করবেন ; কেননা মানুষের দুঃখ-বেদনাকে, আধুনিক জগতের নির্মম ঘটনাবলীকে তিনি মনের টেলিস্কোপ দিয়ে বা কোনো থিওরির ছাঁচে ঢালাই করে দেখেননি। তাঁর বিদ্রোহ বা সর্বহারাদের জন্যে ব্যথা-বেদনা শুধু তাঁর অনুভূতির ব্যাপার নয়, ভুক্তভোগীর বেদনামথিত স্বীকারোক্তি। বহু অন্যায় ও নিষ্ঠুরতার বেড়া ডিঙিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে সঞ্চয় করতে হয়েছে। সেজন্যে জীবনকে বন্ধনমুক্ত করার অসীম প্রেরণা নিয়ে বিপুল জনতাকে শুধু সেনাপতির মত পরিচালনা করেননি, সেই সর্বহারা জনতার মধ্যে নিজের স্থান ক'রে নিতে চেয়েছেন। রাজনীতিকে তিনি এড়িয়ে চলেননি, তার মধ্যে নিজেকে হারিয়েও ফেলেননি—তা থেকে বের করেছেন সুর-ঝঙ্কার এবং সেটাই তো কবির কাজ। গোর্কির জীবনে যেমন অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে অকাতর সমাজ-সেবার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখতে পাই, তেমনি আমাদের বাংলা-সাহিত্যে নজরুলের মধ্যে দেখেছি জীবন সঙ্কট মুহূর্তে বুদ্ধিজীবিদের কৌলিন্যকে বিসর্জন দিতে, নিরন্ন জনতার

পাশে সংগ্রামীমন্ত্র নিয়ে দাঁড়াতে, তাদের সুখ-দুঃখের সমভাগী হতে। গোর্কির সম্পর্কে র্‌ঁলা যে কথা কয়টি বলেছিলেন তা নজরুল সম্পর্কেও অসঙ্কোচে উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেছেন,

"সর্বহারা-শ্রেণীর তিনি সংস্কৃতির মধ্যমণি। তাদের সহিত তিনি এক হয়ে মিশে গেছেন। যে মসীকুলীনের গোষ্ঠী অভিজাত্যের অভিমানে জনজীবন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন তাঁদের কলঙ্কময় জীবনযাত্রার জবাব দিয়েছেন নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে একমাত্র গোর্কিই—অন্তত: ইউরোপে এ পথে তাঁর সহযাত্রী বড় কেউ নেই।"

(শিল্পীর নবজন্ম)

কবি সমাজের বা জাতির প্রতিনিধি, চিরকালের মতো আজো চিন্তাজগতে অগ্রগামী জনগণের মুখপাত্র তাঁরা; কাজে কাজেই তাঁদের পুরানো অচলায়তনের মধ্যে বসে থাকলে বিশ্বের সাথে যারা আগুয়ান তাদের সাথে পা ফেলে চলতে পারবেন না—জীবন থেকে সাহিত্য অনেক দূরে পিছিয়ে যাবে। আজকের জীবন স্বপ্নের জীবন নয়, শুধু ফুলের গন্ধ আর কোকিলের ডাক নয়। ক্ষুধার অন্নসংস্থান ও বেঁচে থাকার ঐকান্তিক ইচ্ছাই প্রাধান্য পাচ্ছে তখন ঐ জিনিষের প্রতিফলনই তো সাহিত্যের খোরাক। বাঁচার জন্যে মানুষ যেখানে অহরহ সংগ্রামমুখী, তার সৃষ্টিও তো বিপ্লবী হবে। কবি বা সাহিত্যিক যুগ হতে স্বতন্ত্র নন; কালের শ্রেণীসংগ্রামের তিনিও তো একজন অংশীদার, প্রতিদিনের জীবনকে প্রভাবান্বিত করাই যে তাঁর দায়িত্ব। জীবনের প্রাত্যহিকতায় দৈনিকের বেদনায় যিনি নেই তিনি আজকের কবি হতে পারবেন না। মানুষের বেদনার উত্তাপ নিজে অনুভব করে মানুষকে চলার পথে উৎসাহ দেওয়া, প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে দেয়াই তো আর্টের মহৎ কর্তব্য। তাই বিশুদ্ধ শিল্পের নিয়মানুবর্তিতা বজায় রেখে নজরুল গজদন্ত-মিনারে মানসবিলাসের উন্মাদ প্রলাপ 'শিল্পের খাতিরে শিল্প' প্রচার করেননি। বাস্তব ক্ষেত্রের স্রষ্টাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে তাদের বাস্তব শক্তি থেকে নিজের মানসশক্তির প্রেরণা নিয়েছেন বলে বাংলাতে লিখলেও তাঁর মানবতা, শোষিত মানুষের প্রতি তাঁর দরদ, সাম্য ও মুক্তির অধিকার সর্বস্বীকৃত করার জন্যে

তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস তাঁকে সমস্ত প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে নিয়ে গেছে এবং নানাভাষায় বিভক্ত ভারতেও সর্বভারতীয় লেখকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং একই স্বদেশের বাইরেও মুক্তিকামী মানুষমাত্রই তাঁকে আপনার বলে মেনে নিতে দ্বিধা করেনি

শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ তখন বিদেশীর কারা-প্রাচীরের অন্তরালে ছিল একান্তই নিরুপায়—অধীনতায় সে ক্লিষ্ট, অত্যাচারে সে নিপীড়িত, জড়তা ও ক্লৈব্যে সে সমাহিত। জন্মের প্রথম প্রভাতে তাই নজরুল দেখতে পেলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসনযন্ত্রের নির্মম নিষ্পেষণে মানুষের তিলে তিলে মরণ-বরণের যন্ত্রণা। দেশের জনগণের অচলায়তনের পেছনে দাঁড়িয়ে গোপনে ও কৌশলে তারা লুটে নিচ্ছে আমাদের জমির ফসল আর খনির সম্পদ। এ দেখে কবি চোখের জল ফেললেন না, আবেদন নিবেদন জানালেন না কিংবা নিরপেক্ষ দর্শকের মত মানুষকে প্রবঞ্চিত করলেন না, বরং তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠলো কুণ্ঠাহীন নিত্যকালের ডাক। মানবতার মুক্তি ও প্রতিষ্ঠার উদাত্ত মন্ত্র কবিগুরুর কণ্ঠে মন্দ্রিত হয়েছে, দেশের প্রতি তাঁর অনুরাগ অগণিত কবিতা ও গানে আত্মপ্রকাশ করেছে কিন্তু তাঁর মুক্তি-মন্ত্রে আমরা পেয়েছি সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন-সাধনের সুর, শত্রুর প্রতি প্রেম ও ক্ষমার আদর্শ। শিক্ষিত সমাজকে তাঁর কাব্য ও গান অভিভূত করেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু শোষণজর্জর সাধারণ সংগ্রামী মানুষ তাঁর কাব্যে গণবিপ্লবের প্রত্যক্ষ শঙ্খনাদ শুনতে পায়নি। যা শুনেছে তা 'একলা চলার গান'। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল্‌রে'—এর মধ্যে সবাইকে নিয়ে মহাবিপ্লবে ঝাঁপ দেওয়ার প্রেরণা অনুপস্থিত। বিশ্ব-জোড়া বিপ্লবের আবাহন নজরুলই প্রথম ঘোষণা করেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের বাণীমূর্তি হলেন তিনিই—

: বল বীর—
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির।
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'

ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর।
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর !
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির।

(বিদ্রোহী : অগ্নি-বীণা)

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ সহায়হীন সম্বলহীন সমাজ যখন প্রায় জড়ত্ব পেয়ে বসেছে তখন তারা শুনল এই বন্ধনমুক্তির গান, নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে চেতনার উন্মেষ পেল, অজ্ঞতা ও গ্লানির মধ্যে নিঃশেষিত মানুষ পেল মুক্তির মন্ত্র। সারা দেশেই জাতীয় জীবনের ভাবনায় ধারণায় সংগ্রামমুখী চেতনার সঞ্চার হল। সে যেন এক 'আব্রহ্মস্তম্ভব্যাপক আন্দোলন।' প্রপীড়িত নবনারীর উদ্ধারের জন্যে, নিষ্পেষিত, জর্জরিত, ভীত-জাতিকে মানুষের ভঙ্গিমায় দীপ্তললাটে সোজা হয়ে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন 'ধূমকেতু', 'প্রলয়োল্লাস' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে। তুর্কি সৈনিকের মুখ দিয়ে আনোয়ার স্মৃতির উদ্বোধনচ্ছলে কবি দেশের মুক্তি-সংগ্রামকারী বন্দীদের অতৃপ্ত হৃদয়ের বেদনাকে রূপ দিলেন—

: আনোয়ার। আনোয়ার।
বুক ফেড়ে আমাদের কলিজাটা টানো, আর
খুন কর—খুন কর ভীরু যত জানোয়ার।
আনোয়ার। জিঞ্জির-
পরা মোরা খিঞ্জির ?
শৃঙ্খলে বাজে শোনো রোণা-রিণ্ ঝিণ্ কির,—
নিবু নিবু ফোয়ারা বহ্নির ফিনকির।
গর্দানে জিঞ্জির।

(আনোয়ার : অগ্নি-বীণা

তারপর 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' দেশাত্মবোধের ও জ্বলন্তবিদ্বেষের মন্ত্র-বহ্নি। কোন হেঁয়ালী না রেখে, সমস্ত আলঙ্কারিক আবরণ ত্যাগ করে স্পষ্ট ভাষায় ডাক দিলেন—শুনলুম পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহশিশুর গর্জন—

: নাচে ঐ কাল-বোশেখী,
কাটাবি কাল ব'সে কি ?
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি' !
লাথি মার্, ভাঙরে তালা !
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি' !

(ভাঙার গান : ভাঙার গান)

: মোরা ভাই বাউল চারণ
মানি না শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি
হাসি জোর জয়ের হাসি,
অ-বিনাশী নাইক' মোদের ডর রে।
গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
মরা-প্রাণ উট্‌কে' দেখাই
ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে।

(যুগান্তরের গান : বিষের বাঁশী)

অসহযোগ আন্দোলনে সারা দেশ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল তাতে কবির এই দীপক রাগিনীর আহ্বান নিপীড়িত দেশবাসীকে মৃত্যুঞ্জয়ী নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এর জন্যে শোষণকারী বিদেশী সরকার কবিকে সহ্য করতে পারেনি, বারে বারে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ করেছে, বই বাজেয়াপ্ত করেছে, রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী করেছে। কিন্তু এত করেও নাগশিশু নজরুলকে তারা বেঁধে রাখতে পারেনি। Richard Lovelace-এর কথায় বলা যেতে পারে—

: Stone walls do not a prison make,
Nor iron bars a cage ;
Minds innocent and quiet take
That for an hermitage ;

(To Althea, from Prison)

নজরুল শুধু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতিকে ক্ষেপিয়ে তোলেননি, সমাজের হেয় যারা মানবতার সমস্ত অধিকার হারিয়ে দিনে দিনে পলে পলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, শোষণে-পেষণে যারা দিনের পর দিন ভগ্নস্বাস্থ্য হৃতসর্বস্ব হচ্ছে সেই দীনহীন সর্বহারাদের মধ্যে সর্বপ্রথম শোনালেন বন্ধন-মুক্তির চারণ-সঙ্গীত।

ঃ জাগো—

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত॥

... ...

শোন অত্যাচারী। শোন্ রে সঞ্চয়ী।
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী॥
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ।

(অন্তর ন্যাশন্যাল সঙ্গীত ঃ ফণি-মনসা)

দেশের কোটি কোটি অর্ধনগ্ন ও উৎপীড়িত নাগপাশবদ্ধ নির্বাক মানুষ যারা এতদিনে নিজেদের দুর্বল ভেবে সামন্ততান্ত্রিক বীভৎস শক্তির দাপটে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে আত্মবলি দিচ্ছিল তারা কবির ডাক শুনে সম্বিৎ ফিরে পেল, জীবনব্রতের সাধনমন্ত্র লাভ করল।

কবি দেখলেন এই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী সমাজে বিচারের নামে চলে প্রহসন, মেকি সত্যের দামে যায় বিকিয়ে। যে যত ধড়িবাজ, যে যত ভণ্ড সমাজে সেই তত প্রতিষ্ঠাবান। এই সমাজে একজনের বুকের রক্ত দিয়ে অর্জিত ফল ভোগ করে অন্যলোকে বিনা পরিশ্রমে। যে কৃষক খররৌদ্রতাপে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মুখের রক্ত তুলে শক্ত মাটির বুকে ফসল ফলায়, তার ভাগ্যে জোটে অনশন, এমনিভাবে সমাজের সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে একদল কাঁড়ি কাঁড়ি ধন ঐশ্বর্য জমা করছে—

ঃ বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া কোলে মহাজন-ভুঁড়ি,
নিরন্নদের ভিটে নাশ ক'রে জমিদার চড়ে জুড়ি।

(চোর-ডাকাত ঃ সর্বহারা

যে শ্রমিক পেশীতে আর ঘামে প্রতিনিয়ত সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে চলেছে তাদের কর্মশক্তি কর্মশীল জীবনের বিরাট ব্যাপ্তি ও পরিধি সম্পর্কে কবি সম্পূর্ণ সচেতন। শক্তিমদমত্ত ধনদৃপ্ত সমাজে কবি দেখেছেন, শ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্য লুণ্ঠন করে নির্লজ্জ সমাজপতিরা গড়ে তোলে আকাশচুম্বী ইমারত, ভোগবিলাসের আরামকেদারায় বসে মায়ারাজ্যের সোনার স্বপ্নে বিভোর হয়, আর একজন ফুটপাথে শীতের রাত্রে বস্ত্রহীন অবস্থায় ক্ষুধার জ্বালায় সারারাত ছটফট করে। অথচ এই অবহেলিত শ্রেণীর রক্তশোষণ ক'রে, তাদের শ্রমের ন্যায্য প্রাপ্যকে আত্মসাৎ ক'রে সাতমহলা ভবনে ইন্দ্রের নৃত্যসভা বসায়। কবির কণ্ঠে প্রতিবাদের ঝড় উঠে—

ঃ রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল ত এসব কাহাদের দান? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা?—ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান না ক' কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে।

(কুলি মজুর ঃ সর্বহারা

তাই বুর্জোয়া আত্মসর্বস্ব সমাজের পতন তিনি কামনা করেছেন। যে সমাজ শতকরা ৯০ জনের কল্যাণ ও উন্নতির অন্তরায়, কেবল দু'চার জন ধনী ভাগ্যবানকেই তুষ্ট রাখতে সুখী করতে চায়, সে সমাজের ধ্বংস কামনা মহাপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রই করেন। তিনি পুরাতনের জীর্ণ-প্রাচীর সমূলে বিনাশ ক'রে আগামী নবযুগের জাগ্রত আত্মার নবজন্মের বারতা আমাদের শুনিয়েছেন।

কবি আশাবাদী হলেও অদৃষ্টবাদী নন। বর্তমানের ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে তিনি ভাবীকালের সুদিনের জন্যে দিন গুণ্‌তি করেন নি। বাস্তবের

দিকে চোখ মেলে মানুষের তিক্ত বেদনার অশ্রুকে ঢেকে রেখে বিপজ্জনক আশাবাদের কোন স্বর্গ-ছবির ওপর তিনি নির্ভরশীল হননি। যেখানে ক্ষমতা-ভোগী ধনিক গোষ্ঠি পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে মেহনতী মানুষের জীবনের সুখশান্তিকে স্বার্থের অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্যে বদ্ধপরিকর, সেখানে মানবতাকে সকলের উর্ধ্বে তুলে ধরে বিপ্লবী মানুষের যে দৃপ্ত মিছিল চলেছে সংগ্রামী জনসাধারণের কবি হিসেবে তিনি তাঁর বিশ্বাসের ছবি তারই মধ্যে বিধৃত করে রেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জনতার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সমাজের পুঞ্জীভূত ক্লেদ ও গ্লানির বোঝা দূর হবে। অতএব মানুষকে জাগতে হবে। তাই দুর্বল মানুষকে উঠে দাঁড়াবার মন্ত্র যুগিয়েছেন, শেষ আঘাত হানার প্রেরণা দিয়েছেন। নির্ভয়ের বাস্তবশক্তি থেকে তাঁর আশাবাদ উৎসারিত, সেজন্যে তার কাব্যে ভয় নেই, নৈরাশ্য নেই, বেদনার ভাববিলাস নেই। তাই তাঁর কাব্য আসন্ন ভবিষ্যতের জন্যে আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মন্ত্রেও সঞ্জীবিত। মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের উপযোগী সমাজ গড়ে তোলার জন্যে তিমির-বিদারী কণ্ঠে চাষীকে ডাক দিলেন—

ঃ আজ চারদিক হতে ধনিক-বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষ্‌ছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা নাই ক' আমার হাত।
আজ সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল॥

... ...

আজ জাগরে কৃষাণ, সব তো গেছে কিসের বা আর ভয়
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যু রাজার হয়কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্য জগৎ চাষার কত বল॥

(কৃষাণের গান ঃ সর্বহারা)

জমিদারকে সেলাম করার দিন হ'য়ে আসছে—'দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।' 'লাঙল যার জমি তার' আজকের এই শ্লোগানে সেদিন নজরুল কৃষককে উদ্বোধিত করেছিলেন। সভ্যতার উত্তর-সাধক শ্রমিক-শ্রেণীকে নকীব দিলেন 'করুণায় নয় ভয়ঙ্করীর দুয়ার খোল'—

: যত শ্রমিক শু'ষে নিঙ্‌ড়ে প্রজা,
রাজা উজির মারছে মজা,
আমরা মরি ব'য়ে তাদের বোঝা রে।
এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দল্‌বিরে আয় মজুর দল!
ধর্‌ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

(শ্রমিকের গান : সর্বহারা)

'রুদ্রমঙ্গল, থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই—

: 'জাগো জনশক্তি। হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা। তোমার হাতের ঐ লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হযে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক—উল্টে ফেলুক। আনো তোমার হাতুড়ি, ভাঙো ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ—ধূলায় লুটাও অর্থ-পিশাচ বলদর্পীর শির। ছোঁড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্তমাখা লালে লাল ঝাণ্ডা।'

—সামন্ততান্ত্রিক বেদনার বিরুদ্ধে এত বড রণহুঙ্কার বাঙালী এর আগে এমন করে শোনেনি।

মেহনতী জনতার সংগ্রামী চেতনা কবির সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেযেছিল বলেই শোষক ও অত্যাচারীর স্বরূপ এবং তাদের মৃত্যু-পরোযানা স্পষ্টভাষায ঘোষণা করেছিলেন তিনি—

: কালের চক্র বক্রগতিতে ঘুরিতেছে অবিরত,
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে কাল তারা পদানত?
আজি সম্রাট কালি সে বন্দী,
কুটিরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী।
কংস-কারায় কংস-হন্তা জন্মিছে অনাগত,
তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ, যারে করে পদাহত!

(সব্যসাচী : সর্বহারা)

এই সমাজ চেতনা, মানুষের শুচিসুন্দর জীবনের জন্য সুতীব্র আকুলতা, নতুন উষার অভ্যুদয়ের স্বপ্নই নজরুলের কবিতাকে একটা অপূর্ব বিশিষ্টতা দান করেছে। তিনি মানুষকে দেখতে চেয়েছেন দৃঢ়, সবল, প্রাণোচ্ছল; সেহেতু জীবনের দুর্বার দুরন্ত ভঙ্গী তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর কবিতা মুক্তগতি প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত, চিরসুন্দরের জয়গানে মুখরিত। মানুষের মুক্তির প্রতি গভীর আসক্তি তাঁর কবিতার মৌলিক প্রেরণা বলেই কবি গতিচাঞ্চল্যহীন, স্পন্দনহীন, উল্লাসহীন জীবনযাত্রাকে কোনদিন মেনে নিতে পারেননি! নজরুল-সাহিত্যের সত্যিকারের জোর ও পেতিপত্তি এইখানে।

তথাকথিত গণতন্ত্রের পীঠস্থান আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায কালা আদমির ওপর শ্বেতকায় প্রভুদের অত্যাচারের তাণ্ডবনৃত্য দেখে নজরুলের শিল্পীমন ক্রন্দন করে উঠেছে। তিনি তাঁর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ কবিতা ও গানের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ক্ষোভে, অভিমানে, অন্তর্জ্বালায় ভগবানের কাছে বলছেন—

> শ্বেত, পীত, কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।
> আমরা যে কালো, তুমি ভালো জান, নহে তাহা অপরাধ।
> তুমি বল নাই, শুধু শ্বেতদ্বীপে
> জোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে,
> সাদা র'বে সবাকার টুঁটি টিপে, এ নহে তব বিধান;
> সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।
> ভগবান! ভগবান!

(ফরিয়াদ: সর্বহারা)

আজকের পোষাকী ধর্মের বাড়াবাড়ি দেখে কবির মনে জেগেছে বিক্ষোভ। দেশব্যাপী ধর্মের নামে হানাহানি ও আত্মঘাতী ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব চলেছে, ধর্ম যে আজ 'টিকির গিঁঠে দাড়ির ঝোপে' স্থান পেয়েছে তাকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি, কেননা তাঁর ভেতর কোন গোঁড়ামি ছিল না; না ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে, না ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে—

: তব মস্‌জিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী ;
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী !

(মানুষ : সাম্যবাদী)

মোল্লা-পুরুতের দাপট সমাজকে নিয়ে চলেছে মধ্যযুগীয় গোঁড়ামির এক ভয়াবহ হানাহানির কুটিল পথে, তাই আজ 'মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার।' সাম্প্রদায়িকতা আজ আমাদের সমাজে ধর্মের চেয়ে উঁচু আসন পেয়েছে—এর জন্যে দায়ী কতকটা তখনকার ইংরেজ সরকার এবং পুরোমাত্রায় দায়ী উভয় সমাজের ভণ্ড তপস্বীদল ;

: যাহারা গুণ্ডা, ভণ্ড তারাই ধর্মের আবরণে
স্বার্থের লোভে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে অজ্ঞান জনগণে !
... ...
ধর্ম জাতির নাম লয়ে এরা বিষাক্ত করে দেশ,
এরা বিষাক্ত সাপ, ইহাদেরে মেরে কর সব শেষ।

(গোঁড়ামি ধর্ম নয় : শেষ সওগাত)

এরা মানুষের জীবনকে মানবতাকে বড় করে না দেখে মানুষের সরল বিশ্বাসকে ভাঙিয়ে কেতাবকে দেখে বড় করে। কাবা, মথুরা, বৃন্দাবন আমাদের কাছে একমাত্র পবিত্র স্থান—মানব-হৃদয়ের পবিত্রতা আমাদের কাছে কোন মূল্যই বহন করে আনে না। জায়গীরদারী সমাজের ধর্ম মন্দির-মসজিদ-গির্জার সান-বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে চলে বলে ঈশ্বরকে আমরা আকাশ-পাতাল, বন-জঙ্গলে খুঁজি কিন্তু নরের মধ্যেই যে নারায়ণ আছেন সেকথা আমরা বিস্মৃত হই। নজরুল বলেছেন, 'তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম সকল যুগাবতার।' এই যে মানবের মধ্যে দেবত্ব 'deification of the human spirit', একেই নজরুল প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছেন, তাকেই তিনি আমাদের চোখে প্রতিভাত করতে চেয়েছেন। তাই পাপী-তাপী, নারী-পুরুষ, কুলি-মজুর, চোরডাকাত কাউকেই ঘৃণা করেননি। বরং সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই যে মানুষকে করে তোলে অমানুষ, মানুষকে প্রয়োজনীয় আহার না দিয়ে তার থেকে শোষণ ক'রে নিজেরা উদরপূর্তি করে আর অপরকে চুরি-ডাকাতি করতে প্রলুব্ধ করে একথাই জোরের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছেন—

: কে তোমায় বলে ডাকাত, বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে?
চারিদিকে বাজে ডাকাতী ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে।
চোর-ডাকাতের কারছে বিচার কোন্ সে ধর্মরাজ?
জিজ্ঞাসা কর, বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ?
বিচারক! তব ধর্মদণ্ড ধর,
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড়।
যারা যত বড় ডাকাত দস্যু, জোচ্চোর দাগাবাজ,
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ।
... .
কে ব'ল তোমায় ডাকাত, বন্ধু, কে বলে করিছ চুরি?
চুরি করিযাছে টাকা ঘটিবাটি, হৃদয়ে হাননি ছুরি।
ইহাদের মত অমানুষ নহ, হ'তে পার তস্কর,
মানুষ দেখিলে বাল্মীকি হও তোমরা রত্নাকর!

(চোরডাকাত: সর্বহারা)

সমাজের দোষে এক মুহূর্তের দুর্বলতায় নারী পতিতায় পরিণত হয়। সমাজ তাদের বাধ্য করেছে ঘৃণিত ব্যবসা আরম্ভ করতে, তাদের ভাল হবার জন্যে সমাজ একটি পথও খোলা রাখেনি বরং তাদের ঘৃণা করতেই আমাদের শিখিয়েছে। কিন্তু 'পঙ্ক থেকেই পদ্ম জাগে।' এদের মধ্যে থেকেই দ্রোণ, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, কর্ণ, সত্যকাম প্রভৃতি ঋষির জন্ম হয়েছে। তাই নজরুল তাদের ঘৃণা করেননি। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—পুরুষ যদি কোন দোষ করে তার জন্যে সমাজ শাস্তির ব্যবস্থা করে না, নারী যখন ক্ষণিক দুর্বলতায় একটু বেসামাল হয়ে পড়ে সমাজের তখন টনক নড়ে ওঠে, কিন্তু কেন? নারীর অন্তর-নিহিত রুদ্ধবেদনার কি কোন মূল্য নেই? তাদের ভাল হবার পথ কি খোলা নেই? এদের পুত্র-কন্যাদের ওপর সমাজের নিন্দা কেন বর্ষিত হয়? নারীর এই হীনতা ও দুর্গতির বিরুদ্ধে নজরুল তাই ক্ষুব্ধ হৃদয়ে চ্যালেঞ্জ দিলেন—

: শোনো মানুষের বাণী
জন্মের পর মানবজাতির থাকে না ক' কোনো গ্লানি!
পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?
শত পাপ করি হয়নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব দেবতার।

অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা মেরী হতে পারে দেবী
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমল সত্য সেবি ?
তব সন্তানে জারজ বলিয়া কোন্ গোঁড়া পাড়ে গালি !
তাহাদের আমি এই দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি খালি—

দেবতা গো জিজ্ঞাসি—

দেড়শত কোটি সন্তান এই বিশ্বের অধিবাসী—
কয়জন পিতামাতা ইহাদের হ'য়ে নিষ্কাম ব্রতী
পুত্রকন্যা কামনা করিল ? কয়জন সৎ-সতী ?
ক'জন করিল তপস্যা ভাই সন্তান-লাভ তরে ?
কার পাপে কোটি দুধের বাচ্ছা আঁতুড়ে জন্মে মরে ?
সেরেফ পশুর ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী যত,
সেই কামনার সন্তান মোরা ! তবুও গর্ব কত !

শুন ধর্মের চাঁই—

জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই !
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয় !

(বারাঙ্গনা, সাম্যবাদী : সর্বহারা)

তাঁর সাহিত্যে আপামর মানব সাধারণের আবির্ভাবের মূলে একদিকে যেমন রয়েছে তাঁর সামগ্রিক জীবনবোধ, অন্যদিকে তেমনি আছে মানবের জীবন-মহিমার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি—

: মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান।

পল রিশার বলেছিলেন—'To hate a man is to betray humanity.' নজরুলের কাছেও 'একের অসম্মান নিখিল মানবজাতির লজ্জা—সকলের অপমান।' তাই হিন্দু-মুসলমানের বিভেদনীতিকে তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দেননি। কবি সাম্প্রদায়িক অশান্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন যে পুরোহিতবাদ বা বাহ্যক্রিয়া-কলাপ দ্বারাই মানুষে মানুষে প্রভেদ জন্মায়। 'হিন্দুমুসলমান' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন,—

"একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিলো আমার হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন, দেখ, যে ল্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ল্যাজকে কাটবে কে? হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে উঠলে আমার বারেবারে গুরুদেবের ঐ কথাটাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন উদয় হয় মনে, যে, এ ল্যাজ গজাল কি করে? এর আদি উদ্ভব কোথায়···আমার মনে হয় টিকিতে আর দাড়িতে।···অবতার পয়গম্বর কেউ বলেন নি আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রিশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি, আলোর মত সকলের জন্য।" (রুদ্রমঙ্গল)

কিন্তু পুরুতশ্রেণী এ সত্যকে কদর্য করে মানুষের মধ্যে জাতিভেদ এনেছে, পরস্পরের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থের বনিয়াদ সুদৃঢ় করেছে। 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন,—

"হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি। তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে—'বাবাগো, মাগো!'—মাতৃপরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া একস্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে! দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চির-কলঙ্কিত হইয়া রহিল! ভূতে-পাওয়ার মত ইহাদের মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদের মস্জিদে পাইয়াছে। ইহাদের বহু দুঃখ-ভোগ করিতে হইবে।···মানুষের পশুবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্মান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষ না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল।"

(রুদ্র-মঙ্গল)

দেশে প্রকৃত শিক্ষার অভাব আমাদের মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। আমরা নিজেদের ভুলেছি, পরানুকরণের উল্লাসে মত্ত হয়ে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বর্জন করেছি। আজকের শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি নিন্দা করেছেন; কেননা, সেখানে মানুষ তৈরী হয় না, তৈরী হয় ছাঁচে-ঢালা যান্ত্রিক পশু। কেমনতরো শিক্ষার প্রবর্তন কল্যাণকর হবে সমাজের পক্ষে সে বিষয়ে তিনি নীরব নন। তিনি বলেছেন,—

"আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল, বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি, অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'হনুকরণে' পরিণত হইয়া পড়িযাছে। পরের সমস্ত ভালো-মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ায় আত্মা নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহাৎ খর্বই করা হয়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মাঝেই বিশ্বকে পাইতে হইবে, সীমার মাঝে অসীমের সুর বাজাইতে হইবে।...জাতীয় বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ভাবী দেশসেবকেব চরিত্র ও জীবন গঠিত হইবে, বিদেশের বিজাতির বিষাক্ত বাষ্প লাগিযা তাহাদের মঞ্জরিত জীবন-পুষ্প শুকাইযা যাইবে না, বলপ্রযোগে তাহাদিগকে মিথ্যা স্বজাতি-স্বদেশ-অনাস্থা শিখাইয়া আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী অলস অকেজো করিয়া তোলা হইবে না,—ইহা কি কম সুখের কথা। তাহারা শিখিবে দেশের ভায়ের কাহিনী, জাতির বীরত্ব, ভ্রাতার পৌরুষ, স্বধর্মের সত্য—দেশের কাছ হইতে,—তাহারা শিখিবে বীরের আত্মোৎসর্গ, কর্মীর ত্যাগ ও কর্ম, সাহস, দেশের নির্ভীকের উদাহবণে উদ্বুদ্ধ হইয়া,—ইহা কি কম আনন্দের কথা!" (সত্য-শিক্ষা : যুগবাণী)

"আমরা চাই, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদেব জীবন-শক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলেদের দেহমন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা।" (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয : যুগবাণী)

এই শিক্ষার প্রসার দরকাব অবিলম্বে। তাহলে গণজাগরণের সাফল্য হবে পরিপূর্ণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের শোষণ, ব্যভিচারীর প্রতাপ, কুসংস্কার ইত্যাদির অবসান হবে।

দিনের পর দিন সমাজ ও রাষ্ট্রের মিথ্যা রূপ যতই নজরুলের সামনে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, সাম্যবাদের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলার জন্যে তিনি তত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। এই সমাজ গড়ে তোলার জন্যে তিনি বিদ্রোহ বিপ্লব এনেছেন। যতদিন না তাঁর কাঙ্খিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয ততদিন তাঁর বিদ্রোহ শান্ত হবে না। তিনি বিশ্বকে দৃঢকণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন—

: মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

(বিদ্রোহী : অগ্নি-বীণা)

'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল' থামার আগে যিনি থামতে চাননি, 'অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ' হস্তচ্যুত হবার আগে যিনি শান্ত হতে চাননি, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে আকস্মিকভাবে তাঁকেই থেমে যেতে হল। তবে রইলো 'suffering humanity'র প্রতীক হিসেবে তাঁর সাহিত্য যার মধ্যে থেকে দলিত মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে বিপ্লবপ্রস্তুতির প্রেরণা পাবে।

শেলী বায়রণ নজরুল

আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার !
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম-কানুন শৃঙ্খল !
আমি মানি নাকো কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো,
আমি ভীম ভাসমান মাইন।
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড়
অকাল-বৈশাখীর !
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত
বিশ্ব-বিধাত্রীর !

বাংলা-সাহিত্যে নিয়ম-না-মানা দুর্দান্ত যৌবনের প্রতীক হলেন কবি নজরুল। এই হোল তাঁর স্বরূপ। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি মানেননি কোন বিধিনিষেধ বা আচার-আচরণের নির্দেশ। তাই সাহিত্যজীবনেও প্রচার করেছেন জাগ্রত বিপ্লবের বাণী, যে-বিপ্লব চেয়েছে বর্তমান বিশ্ববিধানকে ভেঙে নতুন সমাজ ও নতুন জীবনাদর্শ প্রবর্তন করতে। কক্ষচ্যুত উল্কাপিণ্ডের মত জীবন-ব্যাপী অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য নিয়ে অবিরাম ঘুরেছেন আর লিখেছেন। বাংলা-সাহিত্যে তিনি ছাড়া এরূপ বোহিমিয়ান জীবনযাপন, আপন খেয়াল-খুশীতে মশগুল এবং সাহিত্যে উন্মত্ত যৌবনের রুদ্র-হুঙ্কার আর কেউ কখনো করেন নি। তবে ইংরেজী সাহিত্যে নজরুলের দোসর মেলে দু'জনের—তাঁরা শেলী আর বায়রণ। এঁদেরই সঙ্গে নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের একাত্মীয়তা খুঁজে বের করা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

শেলী, বায়রণ ও নজরুলের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করলেই প্রথম চোখে পড়ে তাঁদের শিশুসুলভ সরলতা, স্বাভাবিক সারল্য, পৃথিবীর প্রতি অবিচলিত ভালবাসা, অনুভূতির উদ্দামতা। তাঁরা কোনদিন শৈশব কাটিয়ে

পূর্ণবয়স্ক হতে পারেন নি, এঁদের জীবন যেন জীবনব্যাপী ছেলেমানুষী। নজরুল ছেলেবেলায় অসম্ভব ধরণের দুরন্ত ছিলেন; সর্বদা খেলা আর 'লেটো' দলে গান লেখা, গান গাওয়া—পড়াশুনোয় ছিলেন অষ্টরম্ভা। বাল্যকালেই তাঁর চরিত্রের একদিকে ঔদাসীন্য আর অন্যদিকে চাঞ্চল্য দেখে প্রতিবেশীরা তাঁকে ডাকত 'তারা-ক্ষ্যাপা'। যৌবনেও নজরুলের মধ্যে দেখেছি এই ধরণের ক্ষ্যাপামি। শেলীর সারাজীবন বিভ্রম আর খেয়ালের মধ্য দিয়ে কেটেছে। শেলীর মৃত্যুটাও তো একটা খামখেয়ালের বশবর্তী হয়ে জীবনদান করা। কারুর পরামর্শ না নিয়ে একটি ছোট্ট নৌকার ওপর এক বন্ধুকে নিয়ে ঝড়-তুফান অগ্রাহ্য ক'রে দূর সমুদ্রে বেড়াতে বেরুলেন। এই যাত্রাপথে নৌকাডুবি হয়ে সলিল-সমাধি লাভ করলেন। পোষাক-পরিচ্ছদেও নজরুলের মত তাঁর অদ্ভুত খেয়াল; তিনি প্রায়ই নানা রঙের পোষাক তৈরী ক'রে পরতেন। শেলীর বোন হেলেন তাঁর অদ্ভুত প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন,—

> ছেলেবেলা থেকেই শেলীর আমোদ খেলা সবই ছিল দুঃসাহসিকের আমোদ-খেলা। তাঁর প্রকৃতি ছিল এমন যে সে শাসন মানতে চাইতো না, আইনের বাঁধন কেটে টানা গণ্ডী ছাড়িয়ে উধাও হয়ে ছুটতো দিক-বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে, ভয়-ডর অগ্রাহ্য করে। শেষে তাঁর প্রকৃতি এমন দুরন্ত হয়ে উঠেছিল যে স্কুলে যেতে ভালোই লাগত না, পড়াশুনায় মন তার বসতেই চাইতো না।"

আর বায়রণও ছিলেন অশান্ত প্রকৃতির। সেই ছোটবেলা থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বল্গাহীন হরিণের ন্যায় ছুটেছেন। বায়রণ-চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে হ্যামিল্টন টমসন বলেছেন, "His character, with all its impulsiveness and want of order, was not the character of a badman, but of a good man who had been spoiled by capricious training and unfortunate circumstances; and the great catastrophe of his life was caused, its seems probable, by a defect of self-control rather than by any more serious and culpable cause." সত্যিই একটা খেয়ালের মধ্যে পড়ে সারাজীবন হৃতসর্বস্ব হয়েছেন—শিশুর মত আত্মসংযমের অভাবেই তাঁর জীবনের এই নিদারুণ শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে।

শেলী, বায়রণ, নজরুলের সমগ্র জীবনকে যেমন একটি শিশু গোপনে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে তেমনি তাঁদের রচিত সাহিত্যেও রয়েছে এর সুস্পষ্ট ছাপ। শিশুর খেয়ালীপনা, যৌবনের উদ্দামতা, বিচিত্র অনুভূতির প্রাবল্য তাঁদের কবিতাকে যেমন একাধারে সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যের আসনে উন্নীত করেছে, তেমনি অপরদিকে এই সব উদ্দামতা কখনো কখনো তাঁদের কবিতাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। শিশুর মত ভাবের আতিশয্য তাঁদের জীবনকে যেমন অসম করে তুলেছিল, নানা দুঃখকষ্টে জড়িয়ে ফেলেছিল, তেমনি তাব প্রচণ্ড বেগে নিজেরা অভিভূত না হয়ে যখন তাঁরা সেই গতিব লাগামকে সংযত ক'রে কবিতার মধ্যে ধরে রাখতে পেরেছিলেন, তখন তাঁদের কবিতা অপরূপ সৌন্দয এবং শক্তিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। আর যখন দুদম ভাবের বন্যায় তাঁরা নিজেরাই বেসামাল হয়ে গেছেন তখন তাঁদের কবিতা বিচিত্র ছন্দে ও বর্ণবিন্যাসে উদ্ভাসিত হযে উঠলেও কবিতা হিসেবে ততটা প্রতিষ্ঠা-লাভ কবতে পারেনি। তবে এ দের মধ্যে শেলী নিজেকে লেখার বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী সংযত করেছেন কিন্তু বাযবণ ও নজরুল অতটা পারেনি। তাই শেলীর তুলনায় নজরুলের কবিতা সবসময় সর্বাঙ্গসুন্দব হতে পারেনি।

নজরুল মুসলমান ঘবে জন্মে পরবর্তী জীবনে কালীর উপাসক হযেছিলেন, হিন্দুধর্মের নানা পুরাণতন্ত্র মনোযোগসহকারে পাঠ কবেছিলেন। এর জন্যে মৌলবীবা তাঁকে 'কাফের' বলতেন আর রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ জন্মতঃ মুসলমান বলে তাঁকে কম নাকালে ফেলেননি। ধর্মান্ধ হিন্দু মুসলমানেদেব ফতোয়া ও চক্রান্তকে ছিন্ন কবে নজরুল দিগ্বিজয়ের সিংহাসনে উপবেশন কবেছেন। শেলী বাযরণও তাব সমসাময়িকদের কাছ থেকে কম অপদস্থ হন নি। তাদের ওপর 'বিদ্রোহী', 'সমাজদ্রোহী', 'নাস্তিক' প্রভৃতি কলঙ্ক আরোপ কবে তাঁদের নির্বাসন দিয়েছিলেন। বিদেশে গিযে তাঁদেব শেষ জীবন কাটাতে হযেছে। তাঁদের যাঁরা নির্বাসন দিলেন তারাই কালের কাছে নির্বাসিত হলেন। আর শেলী বায়রণ সকল দেশেই তাঁর দেশ পেযে গেলেন।

(সমগ্র ইউরোপের চিত্ত যখন সামাজিক মোহের গণ্ডী, বাজনৈতিক শাসনের গণ্ডী, চিন্তার গণ্ডী, অনুভবের গণ্ডীর মাঝে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে) যখন চারিদিক হতে কারাগৃহের রুদ্ধতা বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে হৃদয়ের স্পন্দন, প্রাণের স্পন্দনকে নিশ্চল করে দেবার জন্যে ব্যগ্র, (যখন

চারদিকের আকাশ-বাতাস ভরে সীমার নিষ্ঠুরতাকে দলন ক'রে স্বাধীন হবার একটা অস্পষ্ট রুদ্ধ আবেগ দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগ প্রেরণা নিয়ে শেলী-বায়রণের আবির্ভাব।) আর নজরুলের আবির্ভাবও এমন একটি সন্ধিক্ষণে। যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন শোষণ ভারতবাসীর মধ্যে নৈরাশ্য ও ভয়বিহ্বলতার সৃষ্টি করেছে, সেই ক্রন্দনের মুহূর্তে অগ্নিবীণার দীপক রাগিনীর তান তুলে নজরুলের আবির্ভাব। বাংলাদেশের অন্তরের বাণী তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে, জাতীয় জীবনের ক্ষুব্ধ আবেগ সেদিন পথ পেয়েছে তাঁরই কবিতার ভেতর। আমাদের চেতনায় দিয়েছেন বিদেশী শাসনের নির্মমতা ও বেদনার উত্তপ্ত জ্বালা। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে তিনি জোরালো কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁর কবিতা জাতির মৃতদেহে নবজীবনের আশা ও উৎসাহ সঞ্চার করেছে। মহাকবি গ্যেটের সমালোচনায় মনীষী এমার্সন বলেছিলেন, "Goethe was internal life of the nineteenth century." নজরুলের মধ্যেও তেমনি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের জাতীয় আকুতির জীবন্ত আলেখ্য ফুটে উঠেছে।

মানুষের গড়া এবং বিধাতার গড়া বিধিবিধানকে এই তিনজনের কারুরই মনঃপূত ছিল না। কাজেই মানবজাতির জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে, স্বাধীনতা সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, এঁদের মতামতের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। সমাজরক্ষার নামে, ধর্মের নামে, মানুষের বস্তুধর্মী উন্নতির নামে যে সকল কু-রীতি ও বিকৃত অনুশাসন প্রচলিত আছে সেগুলির প্রবল বিরোধিতা এঁরা করেছেন। মানুষের ওপর স্তূপীকৃত অনাচার অবিচার ইত্যাদি বহুর নিঃশব্দ প্রতিবাদ ও আকুতির মূর্ত প্রতীক হয়ে তাঁদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

শেলী-বায়রণের সময়কার ইংলণ্ড ইউরোপের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। আর্থিক অসাম্যের বৈসাদৃশ্য সেযুগে এমনভাবে দেউলিয়াত্বের চরমে পৌঁছে পৃথিবীকে দুই শিবিরে বিভক্ত করে ফেলেনি। ভদ্রবেশী বর্বরতা আইনের আশ্রয়ে লুণ্ঠন করে দরিদ্রের রুধির পান ক'রে এমন স্ফীত হয়ে ওঠেনি। মানুষের জীবনীশক্তি এমনি করে শোষণমূলক শাসনব্যবস্থার চাপে পড়ে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েনি। তাঁরা পরাধীনতার অভিশাপ অনুভব করেন নি। শেলী সচ্ছল পরিবারে জন্মেছেন, বায়রণের জীবনকাল কেটেছে অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যে। এসব কারণ সত্ত্বেও শেলী-বায়রণের পক্ষে নিপীড়িতের পক্ষ সমর্থন করা এবং

পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করা বিস্ময়কর। আর নজরুল জন্মেছেন পরাধীন দেশের এক দরিদ্র পরিবারে। স্বভাবতই তাঁর মানস শাণিত হয়েছে দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা। আর শেলী বায়রণ সে যুগের দেশের প্রচলিত প্রথাসমূহের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। পোষাকী ধর্মের বাড়াবাড়ি তাঁদের মনে জাগিয়েছিল প্রবল বিক্ষোভ। কাজেই ধর্মের নামে অধর্মের যে বন্যা বইছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা।

(No one can read history without seeing that it was very difficult in those days, to be both a democrat and a christian. The church had identified itself, in the Revolution, with the aristocrats. It had chosen to side with established evil rather than the reform which disturbed peace. It had its reward. No one familiar with the respectable worldliness of the recognised religion of England during the first of our country can wonder that many of the most vivid and religious minds of the day revolted from Christianity. Shelley, with characteristic vehemence revolted to the very extreme.

......Byron, too, had the frank antinomianism, the hatred of Christianity".—Prometheus Unbound—A lyrical drama edited by Vida D. Seudder. M. A.)

ধর্মের ও শক্তির ভেকধারী যারা জনসাধারণের অন্ধ কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে মাহাত্ম্যের প্রসাদ ভোগ করে সেই নীতিবিদ ও পুরোহিতশ্রেণীকে লক্ষ্য করে শেলী বলেছেন—

:—Kings first leagued against the rights of men,
And priests, first traded with name of God—
Kings, priests, and statesmen blast the puman flower
Even in its tender bud ; their influence darts
Like subtle poison through the bloodless veins
Of desolate society.

: Indignantly I summed
The massacres and miseries which his
(the Incarnate's) name
Had sanctioned in my countrys—

: O that the free would stamp the impious name.
Of "King" into the dust ;
O that the wise from their bright minds would kindle
Such lamps within the dome of this dim world,
That the pale name of Priest might shrink and dwindle
Into the hell from which it first was hurled…

: Commerce has set mark of selfishness,
The sight of its all-enslaving power,
Upon shining ore, and called it gold.

ইটনে থাকতে থাকতে এই প্রচলিত ধর্মের প্রতিবাদ ক'রে "Necessity of Atheism" নামক একটি পুস্তিকা লেখেন। এই পুস্তিকা পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং তাঁকে এর জন্যে ক্ষমা চাইতে বলা হয়। বিপ্লবী শেলী সে প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। বাধ্য হ'য়ে তাঁকে ইটন ছাড়তে হয়। বায়রণও ব'লেছেন—

: Jehova's vessels hold
The godless eathen's wine !
(The vision of Belshazzar)

নাগশিশু নজরুল রাজশক্তি ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের অত্যাচার একাধিক কবিতায় লিখেছেন—

: পূজারী, কাহারে দাও অঞ্জলি ?
মুক্ত ভারতী ভারতে কই ?
আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,
সত্য বলিলে বন্দী হই,

অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
বলিতে পারি না অত্যাচার,
যথা বন্দিনী সীতা সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার,
বাণীর মুক্ত শতদল যথা
আখ্যা লভিল বিদ্রোহী,
পূজারী, সেখানে এসেছ কি তুমি
বাণী-পূজা-উপচার বহি?

(দ্বীপান্তরের বন্দিনী ঃ ফণি-মনসা)

ঃ নামাজ রোজার শুধু ভড়ং
ইয়া উয়া পরে সেজেছ সং,
ত্যাগ নাই তোর একছিদাম।
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কর জড়,
ত্যাগের বেলাতে জড়সড়!
তোর নামাজের কি আছে দাম?

(শহিদী ঈদ ঃ ভাঙার গান)

ঃ মোহের যার নাইক অন্ত
পূজারী সেই মোহান্ত,
মা বোনে সর্বস্বান্ত কর্‌ছে বেদী-মূলে।
তোদেরে পূজার প্রসাদ ব'লে খাওয়ায় পাপ-পুঁজ সে গু'লে।
তোরা তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস পাপ ব্যাভিচার রাশিরাশি।
জাগো বঙ্গবাসী॥

পুণ্যের ব্যবসাদারী
চালায় সব এই ব্যাপারী,
জমাচ্ছে হাঁড়ি হাঁড়ি টাকার কাঁড়ি ঘরে।
হায় ছাই মেখে যে ভিখারী শিব বেড়ান ভিক্ষা ক'রে—
ওরে তাঁর পূজারী দিনের দিনে ফুলে হচ্ছে খোদার খাসী।
জাগো বঙ্গবাসী॥

এইসব ধর্ম-ঘাগী
দেবতায় করছে দাগী
মুখে-কয় সর্বত্যাগী ভোগ-নরকে ব'সে।
সে যে পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী দেব-দেউলে প'শে।
আর ভক্ত তোরা পূজিস তারেই, যোগাস্ খোরাক সেবা-দাসী!
জাগো বঙ্গবাসী॥
(মোহান্তের মোহ-অন্তের গান : ভাঙার গান)

: কোথা চেঙ্গিস্, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙ্গে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার।
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!
হায়রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়!
(মানুষ, সাম্যবাদ : সর্বহারা)

তিনজন কবিই ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন। নজরুলের সময় ভারত পরাধীন ছিল সুতরাং তাঁর সাম্রাজ্যবাদী শাসনযন্ত্রের নির্মম নিষ্পেষণে মানুষের তিলে তিলে মৃত্যুবরণের দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়েছে। শেলী বায়রণ স্বাধীন দেশের মানুষ, তবু সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন শোষণে পীড়িত ও লাঞ্ছিত মানবগোষ্ঠীর দুঃখের কাহিনী তাঁদের এমনভাবে বিচলিত করে তুলেছিল যে তাঁরাও এর বিপক্ষে অন্তরের ঘৃণা ঋজুভাবে অভিব্যক্ত করেছেন। নেপোলিওনের পররাজ্য গ্রাস করার দৃষ্টান্তে মর্মাহত হয়েছিলেন শেলী। ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড বিস্ফোরক শক্তি একদা শেলী বায়রণের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তার সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী তাঁদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। সেই ফরাসী দেশের সম্রাটের স্বৈরাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে শেলী বলেছিলেন—

: I hated thee, fallen tyrant!
…thou shouldest dance and revel on the grave
Of Liberty. Thou mightst have built thy throne
Where it had stood even now : thou didst prefer

A frail and bloody pomp, which time has swept
In fragments towards oblivion.

(Feelings of a Republican on the fall of Bonaparte)

বাল্যকাল থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার ওপর তাঁর গভীর অশ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন বালক ছিলেন তখন রাজা এবং রাজকর্মচারীদের খুব গাল দিয়ে কড়া কড়া প্রবন্ধ লিখেছিলেন। খেয়ালী কবি সেই প্রবন্ধগুলিকে ছোট ছোট শিশির মধ্যে পুরে মোম দিয়ে বন্ধ করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিয়েছিলেন, এই প্রবন্ধগুলো কত দূর দেশে যাবে, কত জাহাজের লোকের হাতে গিয়ে পড়বে, কত জেলে কুড়িয়ে পাবে। তখন দেখবে এই অন্যায় রাষ্ট্রশাসন আর কতদিন টেকে। শেলী পরাধীনতার জ্বালা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—

O slavery ! thou frost of the world's prime,
Killing its flowers and leaving its thorns bare

(Hellas)

বায়রণের কথার ভঙ্গিমার মধ্যে এক তপঃশক্তি বিচ্ছুরিত হয়েছে। নাটিংহাম সহরে এক আইন অমান্যকারী জনতাকে শাসক সম্প্রদায় কঠোরভাবে দমন করে, কয়েকজনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। সরকারের চণ্ডনীতির প্রতিবাদে বায়রণ ১৮১২, ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় তীব্রভাবে সমালোচনা করেছিলেন। নেপোলিওনের রাজ্যগ্রাসকে তিনি নিন্দা করেছেন।

Pierced by the shaft of banded nation's through
Ambitious life and labours all were vain ;
He wears the shatter'd links of the world's broken
chain.

(Childe Harold's Pilgrimage, Canto 3.)

তাঁর রাজনৈতিক মতামত সমগ্র ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বাধীনতার জন্যে তাঁর অগ্নিক্ষরা বাণী মানুষের মনে অনলের মতন প্রজ্বলিত হয়েছিল। যেমন—

. Eternal spirit of the chainless Mind !
Brightest in dangeous, Liberty ! Thou art

For there thy haditation is the heart—
The heart which love of thee alone can bind ;
And whom thy sons of fetters all consign'd—
To fetters, and the damp vault's dayless gloom,
Their country conquers with their martyrdom,
And Freedom's fame finds on every wind !

(Sonnet of Chilon)

যেখানেই স্বাধীন হবার জন্যে মানুষ বিদ্রোহ করেছে সেখানেই বায়রণ তাদের পশ্চাতে রয়েছেন। ইটালীর ঐক্যবদ্ধতায়, স্পেনের স্বাধীনতায় তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। শেষজীবনে বায়রণ গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বিপ্লবীদের সাহায্যার্থে তিনি একটি সমিতিও গঠন করেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে দশ হাজার পাউণ্ড দান করেন। সেখানেই ১৮২৪, ১৯শে এপ্রিলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমরাঙ্গনেই নজরুল প্রত্যক্ষ করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্বরূপ। সৈনিক-জীবনেই সম্পদশোষণকারী পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখেছিলেন শোষকের নগ্ন বীভৎস মূর্তি, তাই যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেই তাঁর লেখনী তিনি রাঙিয়ে নিলেন রক্তে। তিনি কেবল নিজের দেশের স্বাধীনতার কথা বললেন না, চাইলেন সারা দুনিয়ার অত্যাচারজর্জর নরনারীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, তাই তাঁর আবেদন শেলী-বায়রণের মত দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করেছে। তাঁর বহু কবিতা পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে—

: লক্ষ্য যাদের উৎপীড়ন আর অত্যাচার
নর-নারায়ণে হানে পদাঘাত
জেনেছে সত্য হত্যা সার !
অত্যাচার ! অত্যাচার !!
... ...

নরসুত তুমি, দাসত্বের এ ঘৃণ্য চিহ্ন
মুছিয়া দাও !
ভাঙিয়া দাও, এ-কারা এ-বেড়ী ভাঙিয়া দাও !

(জাগরণী : ভাঙার গান)

ঃ ওগো আমি চির-বন্দী আজ,
মুক্তি নাই, মুক্তি নাই,
মম মুক্তি নত-শির আজ নত-লাজ!
আজ আমি অশ্রুহারা পাষাণ-প্রাণের কূলে কাঁদি—
কখন্ জাগাবে এসে সাথী মোর ঘূর্ণী-হাওয়া রক্ত অশ্ব
উচ্ছৃঙ্খল আঁধি।

বন্ধু! আজ সকলের কাছে ক্ষমা চাই—
শত্রুপুরী-মুক্ত আমি পাষাণ-পুরে আজ বন্দী ভাই!

(মুক্ত পিঞ্জর ঃ বিষের বাঁশী)

ঃ আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষাত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব
সৃষ্টির মহানন্দে…

(বিদ্রোহী ঃ অগ্নি-বীণা)

তিনি চিরদিনই স্বাধীনতার পূজারী। বাল্যকালেই যাঁর মন বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, যৌবনে যিনি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কবিতা লিখে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, যাঁর একাধিক বই রাজরোষে বাজেয়াপ্ত হয়েছে, তিনি কোনদিনই নিজেকে ছাড়া অপর কাউকে কুর্নিশ করেননি। নিজেকে যিনি সম্মান করেন, অপরের অসম্মানে ব্যথিত হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তাই যেখানে মানুষ লোকভয়ে, রাজভয়ে মৃত্যু-ভয়ে অভিভূত হয়ে মনুষ্যত্বের মর্যাদা পরিহার করেছে, অপরের পদপ্রান্তে নিজের শির লুণ্ঠিত, করেছে সেখানে সেই কাপুরুষতার লজ্জাকে কবি নিজের লজ্জারূপে অনুভব করে বহ্ন্যুৎসবের মতো জ্বলে উঠেছেন।

রাজতন্ত্র আর পুরোহিততন্ত্র—এই দুই তন্ত্র থেকে মুক্তি লাভের জন্যে শেলী-বায়রণ-নজরুল জীবন দিয়ে, তাঁদের কাব্য দিয়ে মানুষকে আহ্বান জানিয়ে গেছেন। শেলী বলেছেন,—

"মানুষ এই দুই তন্ত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে একেবারে জর্জর হয়ে গেল; একদিক থেকে বাইরে তাকে দাসত্বে বদ্ধ করেছে রাজশক্তি, আর একদিকে ধর্মতন্ত্র তার আত্মাকে সঙ্কীর্ণ করেছে।"

এই দাসত্বের বন্ধন আর মোহের বন্ধন তিনি সইতে পারেন নি। "Revolt of Islam"এ এই কথাই ঘোষিত হয়েছে। আর Prometheus Unbound"এ সেকথা সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। বায়রণ বলেছেন—

: Yet Freedom ! Yet thy banner, torn, but flying.
Streams like the thunder-storm against the wind.

(Childe Harold's Pilgrimage Canto 4, 874—875)

ভেনিস, রোম প্রভৃতি দেশের অতীত গৌরবের সঙ্গে বর্তমান অবস্থার যে তুলনা "Childe Harold's Pilgrimage"এর চতুর্থ সর্গে করেছেন তাতে বায়রণের দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে স্বাধীনতার জন্যে তাঁর বুকফাটা ক্রন্দন শোনা যায়। H. H. Henson বলেছেন,—

"Byron's passion for liberty was deep and genuine. It was more than the political cant which inspired the rounded periods and purple perorations of the whig orators. It is disclosed in the boy; it is paramount in the man."

নজরুল ডাক দিয়েছেন একাধিক কবিতায়।—

ঃ সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কিরে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়?—
শিকলগুলো বিকল ক'রে পায়ের তলায় মাড়ায়,—
বজ্র-হাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়?
নাজাত্-পথের আজাদ মানব নেই কিরে কেউ বাঁচা,
ভাঙ্তে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষের খাঁচা?
ঝুটার পায়ে শির লুটাবে, এতই ভীরু সাঁচা?

(সেবক : বিষের বাঁশী)

: এস বিদ্রোহী তরুণ তাপস আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর,
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলী-ঝলক ন্যায় অসির।

(আত্মশক্তি : বিষের বাঁশী)

তিনজন কবিই যৌবনের জয়গান গেয়েছেন। তারুণ্যই জীবনের পরিচয় প্রকাশ করে। বায়রণ বলেছেন—

; If thou regret'st thy youth, why live ?
The land of honourable death
Is here :—up to the field and grave
Away thy breath !
Seek out—less often sought than found
—A soldier's grave, for thee the best :
Then look around, and choose thy ground,
And take thy rest,

শেলী বলেছেন—

; Be thou, Spirit fierce,
My spirit ! Be thou me, impetuous one !
Drive my dead thoughts over the universe
Like withered leaves to quicken a new birth !

(Ode to the West Wind)

নজরুল অসংখ্য কবিতা ও গানে যৌবনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাদৃশ্যের জন্যে একটু উদাহরণ নিয়ে দিলুম—

: এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ ?
কে রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ ॥

... ...

যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন—
মানেনি কখনো, আজো মানিবে না বৃদ্ধত্বের এই শাসন।
আমরা সৃজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান,
সম্ভ্রমে-নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি মোদের দান।

যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বের দিয়াছি কবর মোরা তরুণ—
ওরা দিক গালি, মোরা হাসি' খালি বলিব "ইন্না···রাজেউন!"

(যৌবন-জল-তরঙ্গ : সন্ধ্যা)

প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার উপর তিনজনই ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। বায়রণ সমাজনীতির অন্তর্নিহিত ভণ্ডামী ও শূন্যগর্ভতা আদর্শবাদের ছদ্মাবরণের অন্তরালে স্বার্থলোলুপতাকে জ্বালাময় ভাষায় কটূক্তি করেছেন। রেভারেণ্ড বীচারকে তিনি লিখেছিলেন—

. Yet why should I mingle in Fashion's full herd ?
Why crouch to her leaders, or cling to her rules ?
Why bend to the proud, or applaud the absurd ?
Why search for delight in the friendship of fools ?

... ...

Deccit is a stranger as yet to my soul :
I still amunpractised to varnish the truth ;
Then why should I live in a hateful control
Why waste upon folly the days of my youth ?

তাঁর "Don Juan," "Childe Harold's Pilgrimage" নিজের বিষাদময় জীবনের আত্মকাহিনীতে দম্ভময় অসার সমাজের প্রতি তীব্র বিদ্রূপবাণীতে ভরপুর। শেলীও তাঁর কাব্যে সমাজব্যবস্থার ওপর তীব্র কশাঘাত হেনেছেন। সমাজশক্তির বিরুদ্ধে নানা কথা বলেছেন, নতুন সমাজগঠনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর মন্ত্র ছিল,—

"সমাজের শাসন-নিগড ভাঙো, বাঁধা আইনের শিকল কাটো, মনে-প্রাণে স্বাধীন হও।"

শেলীর চিত্ত যখন মিস হিশনারের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠে তখন হিশনার সমাজ-ব্যবস্থার দোহাই দিয়েছিলেন। এতে মুক্তিপিপাসু শেলী রাগান্বিত হয়ে লিখলেন,—

"Who made you her governor? Believe me such

an assumption is as unimportant as it is immoral. Neither the laws of nature, nor of England have made children private property."

'Peter Bell the Third' কবিতায় তিনি ইংলণ্ডের নাগরিক জীবনকে তীব্র শ্লেষের কশাঘাত হেনেছেন। নজরুল হিন্দু-মুসলমান প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে চালিয়েছেন তাঁর তীক্ষ্ণধার খড়্গ—

: জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, কর্‌লি তোরা এক জাতিকে একশ' খান!
এখন দেখিস ভারত জোড়া
প'চে আছিস্ বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া॥

(জাতের বজ্জাতি : বিষের বাঁশী)

: বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো ব'সে
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চ'ষে।
হান্‌ফি ওহাবী লা-মজ্‌হারীর তখনও মেটেনি গোল,
এমন সময় আজাজিল এসে হাঁকিল "তল্‌পী তোল!"
মোরা ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি বাহিরের দিকে তত
গুণতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগলের মত!

(খালেদ : জিঞ্জির)

সমাজের গোঁড়ামি, ধর্মের গোঁড়ামির দিক দিয়ে এঁরা মানুষকে বিচার করেননি—মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছেন। তাই এই তিনজন কবিই মানবপ্রেমিক। বায়রণ মানবদ্বেষী হ'য়েও মানবপ্রেমিক, কেন না মানুষের অসারত্বকে তিনি আঘাত করেছেন শুধু মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করবার জন্যে। তিনি বলতেন, সামাজিক রীতি ও শিষ্টাচার নর-নারীর কৃত গোপনীয় পাপ সকলকে যে বাহ্যিক আবরণে আবৃত ক'রে রাখে তা

উন্মোচন করে বিশ্ববাসীকে তাদের অবস্থা দেখাবার উদ্দেশ্যেই তিনি কেবল পাপের চিত্র অঙ্কিত করে থাকেন।

ভণ্ডামী, প্রতারণা, লোভ, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচারণ তখনকার বিলিতী সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল। মানবতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, বন্ধুত্ব, সত্যপরায়ণতা, মহনুভবতার চিহ্ন একটুও ছিল না। 'কাজেই বায়রণের এই পথ ধরা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

নিরন্ন ও গরীব দুঃখীদের জন্যে তিনজন কবির হৃদয় সর্বদা কাঁদত। স্বার্থোদ্ধত অবিচার যেখানে লোভে অন্ধ হয়ে লক্ষমুখ দিয়ে অক্ষমের বক্ষরক্ত শোষণ করছে সেখানে সেই অবিচারের বিরুদ্ধে তিনজন কবিই দাঁড়িয়েছেন। শেলী একবার এক অসহায় কাতর ভিখারীকে নিজের জামা-জুতো-টুপি দিয়ে খালি পায়ে আলগা গায়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী এসে উপস্থিত হন। শীতে অসহায় কাতর সর্বহারাদের বেদনা তাঁকে সব সময় বিচলিত করে তুলেছে। তিনি "Summer and Winter" কবিতায় বলেছেন—

. It was a winter such as when birds die
In the deep forests and the fishes lie
Stiffened in the translucent ice, which makes
Even the mud and slime of the warm lakes
A wrinkled clod as hard as brick and when,
Among their children, comfortable men
Gather about great fires, and yet feel cold
Alas, then, for the homeless beggar old!

বায়রণও অবহেলিত অবজ্ঞাত মানুষের জন্যে বেদনা অনুভব করেছেন। নজরুলের 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা,' 'প্রলয়-শিখা' প্রভৃতি কাব্যে নিরন্ন-নিঃগৃহীতদের, চাষীমজুরদের সকরুণ জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়ে অবজ্ঞাত মানুষের মধ্যে ঘুম-ভাঙানির সুর ধ্বনিত হয়েছে। শোষিত ও সর্বহারা মানুষ একদিন জাগবে, বোবা মুখে তাদের ফুটবে মরণজয়ীর বাণী, সেদিন তাদের চলার বেগে ধ্বসে পড়বে ধনিকের গজমোতিমিনার। এই বিশ্বাসের বাণী তিনজন কবিই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অগ্নিঝঙ্কারে বর্ণনা করেছেন।

জীবনকে নিত্য নতুন ক'রে দেখার শক্তি তিনজন কবিরই ছিল বলে জীবনের প্রতি টান তাঁদের কোনদিনই আল্‌গা হয়নি। এই টান, এই অনুভব, এই শক্তি ছিল বলেই তাঁদের কবিতায় এমন একটা স্বচ্ছন্দতা, এমন একটা সহজ লীলার পরিচয় পাওয়া যায় যা পড়ে মনে হয় যে কোনখানে কোনো অপচেষ্টার জবরদস্তি নেই; যেমন অনুভব করেছেন তেমনি বলে গেছেন। তাই তাঁদের কবিতা পড়ার সময় আমাদের মনে হয় না যে কোনো রচনা পড়ছি, মনে হয় ভাবকে যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, এই তিনজন কবিই ছিলেন আশাবাদী। তাঁরা সকলেই বিশ্বাস করতেন, সব কৃত্রিমতার আবরণ ঘুচে গিয়ে এই পৃথিবীতে প্রসন্ন প্রত্যূষে একদিন সূর্যোদয় হবে—শুধু স্বার্থের প্রয়োজনে নয়, মানুষ বড় হবে তার অন্তর-মাধুর্যে। শেলী তাঁর ভাবীকালের ভাবীযুগের স্বপ্ন এঁকেছেন—

: The loathsome mask has fallen, the man remains
Sceptreless, free, uncircumscribed, but man
Equal, unclassed, tribeless and nationless
Exempt from awe, worship, degree, the king
Over himself ; just, gentle, wise ; but man.

নজরুলের ভাবীসমাজ হবে অক্ষয় যৌবনের দেশ, অবাধ মুক্তির ক্ষেত্র।—

: নাই সেথা যশঃ তৃষ্ণার লোভ, নাই বিরোধের ক্লেদ,
নাই সেথা মোর হিংসার ভয়, নাই সেথা কোনো ভেদ,
নাই অহিংসা হিংসা সেখানে কেবল পরম সাম,
রাজনীতি নাই, কোনো ভীতি নাই "অভেদম্‌" তার নাম।

(অভেদম্‌ : নতুন চাঁদ)

বায়রণের সমাজ হবে—"Binding all things beauty."

হৃদয়ের অনুভবের তীব্রতা, জীবনের ব্যথাকে এমন তীব্রভাবে অনুভব খুব কম লেখকই করেছেন। তাই তিনজনেই দেশের সম-সাময়িকতা দেখে খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন—এই ব্যথার মাঝেই আবার তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে। লাঞ্ছিত মানবগোষ্ঠীর দুঃখ-বেদনার কাহিনী নজরুলের হাতে চিত্রিত হয়ে অগ্নি বর্ষণ করেছে। বায়রণের মধ্যেও এই ক্ষাত্র্যতেজ

পুরোমাত্রায় ছিল। অভিমান করে বা আহত হয়ে চুপ করে থাকা বায়রণের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাই নজরুল-বায়রণের প্রকৃতি হোল, যেখানে যা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন সেখানে 'ভেঙ্গে-চুরে' দিগ্বিদিকে প্রলয় জাগিয়ে 'ঝড়ের মত শান্তি' খুঁজেছেন। তাঁরা যেখানে ব্যথা পেয়েছেন ঘা দিয়েছেন উচ্চকণ্ঠে, —চতুষ্পার্শ্বের লোককে চমকিত করেছেন, স্বকীয় শক্তিদম্ভে উচ্ছ্বসিত আস্ফালনে ছুটেছেন। শেলীর মধ্যে আবেগের উদ্বেলতা ও প্রবলতা এতটা প্রখর ছিল না। তিনি সবই অনুভব করেছেন প্রাণ ও মন দিয়ে; বাধাও কম পান নি, সমাজ-ব্যবহারগত নীতির সম্পূর্ণ উন্মূলন চেয়েছেন তবু তুবড়ির মত জ্বলে ওঠেন নি। আপনার অন্তরে ব্যথা গুটিযে দুরন্ত দহনে জ্বলেছেন। তাই তাঁব প্রকৃতি কতকটা ছাই-চাপা আগুনের মত। শেলীর কবিতায় আমাদের বিষাদনম্র করে তোলে, গভীর আধ্যাত্মিকতার একটি সুর পাই আর নজরুল-বায়রণের কবিতা বেদনার মধ্যে সচকিত করে তোলে, অন্যায় অত্যাচারকে প্রতিরোধ করার জন্যে হৃদয়ে বলসঞ্চার করে। শেলীর কাব্যে ক্রোধের এতটুকু চিহ্ন নেই। পাপকে, অন্যায়কে, উৎপীড়নকে তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করতেন, তাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু পাপীকে, উৎপীড়নকারীকে তিনি করুণার চক্ষে, অজ্ঞান বলে সহানুভূতির চক্ষে দেখতেন। বায়রণ-নজরুলের মত শেলীরও হৃদয়ে ঘোর অতৃপ্তির দাহ ছিল কিন্তু তাঁর হৃদযের সেই জ্বালা কখনও তিনি বহির্জগতে তাঁদের মত উত্তপ্ত ভাষায ছড়াতে পারেন নি। শেলী বুঝেছিলেন—

> To thirst and find no fill—to wail and wander
> With short unsteady steps—to pause and ponder—
> To feel the blood run through the veins and tingle.
> Where busy thought and blind sensation mingle;
> To nurse the image of unfelt caresses
> Till dim imagination just possesses
> The half-created shadow, then all the night
> Sick······

এইরূপ ব্যর্থতার আঘাতে জ্বলে উঠে চারিদিকে আগুন জ্বালাতে বায়রণ ও নজরুল সঙ্কুচিত হননি; কিন্তু সেই আগুনের স্পর্শ দিয়ে কাকেও কষ্ট দিতে

শেলীর প্রাণ কেঁদে উঠত। তিনি Spirit of Universal Love দ্বারা জগতের সর্ব অমঙ্গল ও পাপ দূর করবার কল্পনা করেছিলেন। তাঁর অন্তর বড় আশা করেছিল যে এই দিয়ে পৃথিবী সত্য স্বাধীনতা ও আনন্দের আবাসে পরিণত হবে। তিনি বুঝেছিলেন যে সকলকে কল্যাণের সমভাগী করা, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ ঢেলে দেওয়া, ভীষণ অত্যাচারের জন্য অশ্রুপাত, আত্মতৃপ্তি এবং কারুর ওপর কোন অত্যাচার করতে না হলে যেসব চিত্ত-বৃত্তির প্রয়োজন সে সব বৃত্তি লাভ করা, আনন্দে জীবন যাপন কিংবা দুর্দশাগ্রস্তের জন্য করুণা ও সহানুভূতি অনুভব করা একমাত্র প্রেম থাকলেই সম্ভব হয় (Revolt of Islam vii. 12)। অর্থাৎ যত অত্যাচার, যত দুঃখ-দৈন্য, যত কিছু অভাব ও অশান্তি প্রভৃতির মূলে মানুষে সত্যপ্রেমের অভাব,—তা শেলী মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। প্রেমের যে আদর্শ শেলীর চিত্তকে মুগ্ধ করেছিল সেটা চিরন্তন মানবযৌবনের একটা সুন্দর স্বপ্ন কিন্তু জগতের বাস্তব সীমায় সে স্বপ্ন স্বপ্নই থাকবে—একথা যখন শেলীর অন্তর বুঝতে পারল তখন থেকেই শেলীর হৃদয়ে বিষাদ ঘনিয়ে উঠতে আরম্ভ করল। স্বপ্ন টুটে গেল কিন্তু তার মোহাবেশ তাঁর জীবনের প্রতি তন্ত্রীতে জড়িয়ে রইল। প্রেমের এই গভীরতা শেলীর ছিল বলে তিনি নীরবে জ্বালাময় বিদ্রোহ দমন করতে শিখেছিলেন –"to sit and curb the soul's mute rage which preys upon itself alone."

শেলীর বিশ্বাস ছিল যে দুঃখ সহনের অমিত শক্তি ও সংযত ধৈর্য, আঘাত সহ্য করার কঠিন তপস্যা শত্রুর মনকে স্পর্শ করবে—এইভাবে শাসক, শোষক, ঘাতক সবার পরাভব ঘটবে। নীলকণ্ঠের মত বিষ ধারণ করে মানুষকে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার মন্ত্রে দীক্ষা দিতে চেয়েছেন। শেলী বলেছেন—

: And if then the tyrants dare
Let them ride among you there
Slash and stab and maim and hew
What they like, that let them do.
With folded arms and steady eyes,
And little fear and less surprise
Look upon them as they slay
Till their rage has died away.

Then they will return with shame
To the place from which they came,
And blood thus shed will speak
In hot blushes on their cheek.

তাঁর কাব্যে তাই প্রমিথিয়ুস যখন স্বর্গ থেকে আগুন এনে মানুষের অশেষ উপকার করায় দেবরাজের বিরাগভাজন হন তখন দেবরাজ তাঁর ওপর নানারূপ নির্যাতন করেছিলেন। প্রমিথিয়ুস দেবরাজের নির্যাতন অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে তাঁর হৃদয় পরিবর্তন করেছিলেন। প্রমিথিয়ুসের উক্তির মধ্যে শেলীর এই মনোভাবের সমর্থন পাওয়া যায়—

. ...let not aught
Of that which may be evil, pass again
My lips, or those resembling me.
(Prometheus Unbound)

কিন্তু নজরুল প্রেমের দ্বারা বা আপোষের দ্বারা শত্রুর হৃদয় পরিবর্তন বা অসীম সহ্যশক্তির দ্বারা তাকে পরাভূত করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি শত্রুকে শত্রুরূপে দেখেছেন; সেখানে কোন করুণা বা কোন দয়া-মায়া দেখাননি—সেখানে ক্ষমা করা দুর্বলতা, ভীরুতার নামান্তর। তাই তিনি নিখাদ নির্ঘোষ কণ্ঠে গর্জে উঠেছেন—

অত্যাচারী যে দুঃশাসন
চাই খুন তার চাই শাসন
হাঁটু গেড়ে তার বুকে বসি'
ঘাড় ভেঙে তার খুন শোষি।
আয় ভীম আয় হিংস্র বীর
কর্ আ-কণ্ঠ পান রুধির।
ওরে এ যে সেই দুঃশাসন
দিল শত বীরে নির্বাসন,
কচি শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত
করেছে রে এই ক্রূর স্যাঙাত।

মা বোনেদের হয়েছে লাজ
দিনের আলোকে এই পিশাচ।
বুক ফেটে চোখে জল আসে
তারে ক্ষমা করা ?   ভীরুতা সে।
হিংসাশী মোরা মাংসাশী,
ভণ্ডামী ভালবাসাবাসি !
শত্রুরে পেলে নিকটে ভাই
কাঁচা কলিজাটা চিবিয়ে খাই।
মারি লাথি তার মড়া মুখে
তাতা-থৈ নাচি ভীম সুখে।
   ...   ...
চাই না ধর্ম, চাই না কাম,
চাই না মোক্ষ, সব হারাম
আমাদের কাছে ; শুধু হালাল
দুশমন খুন্ লাল-সে-লাল ॥

(দুঃশাসনের রক্ত-পান : ভাঙার গান)

বায়রণের সুরও হোল এই রকম। নজরুল ও বায়রণ বিপ্লবী হয়েও রক্ত-ক্ষয়ী জনক্ষয়ী শক্তিমানের শোষণের মোক্ষম চক্র-যুদ্ধকে ঘৃণা করেছেন। আর শেলীর তো কথাই নেই। তিনি প্রেমের দ্বারা হিংসা জয় করার স্বপ্ন দেখতেন। অতএব তিনিও যে যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন তা সহজেই অনুমেয়।

শেলীর সঙ্গে নজরুলের একদিক দিয়ে যেমন পার্থক্য তেমনি আর একদিক দিয়ে তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। শেলী শুধু বিদ্রোহের কবি নন, জীবনকে বিভিন্ন দিক হতে বিচিত্র ভাবে দেখেছেন ; তাঁর কবি-চিত্ত পশ্চিম বাতাসে ড্যাফোডিল পুষ্পের সঙ্গে যেমন নেচেছে, উন্মাদ ফেনিল সিন্ধুর তরঙ্গের সাথে তেমনি দুলেছে ; তাঁর কাব্যের মধ্যে ভীষণ ও মধুরের একত্র সমাবেশ হয়েছে—হাসি ও অশ্রুজল মিশে গেছে। নজরুলও রক্ত গরম করার মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে কান্না, আনন্দ হাসি-বেদনার চিরন্তন গান গেয়েছেন। একদিকে যেমন নিপীড়নজর্জর মানুষকে সংগ্রামের প্রত্যক্ষ শঙ্খধ্বনি শুনিয়েছেন, প্রলয়োল্লাসে মত্ত হয়ে সকলকে আহ্বান করেছেন রুদ্রকে সুস্বাগত জানাতে, তেমন অপরদিকে

'গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি'র মায়ায় ধরা দিয়েছেন, শারদ প্রভাতে শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে আনন্দের পরশ পেয়েছেন। যিনি খ্যাতি পেয়েছেন বিদ্রোহীরূপে, তিনিই আবার কাব্য-লক্ষ্মীর সত্যিকার প্রসাদ পেয়েছেন প্রেমের কবিতা ও গান লিখে। শেলী সম্পর্কে সুক্ষ্মদর্শী সমালোচকেরা মত প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর বীরত্ব মহিমান্বিত কবিতাগুলি মহাকালের দরবারে আদরিত হবে না, কেননা, তার মধ্যে প্রকৃত শেলী নেই, স্থান পাবে তাঁর করুণ ও প্রেমের প্রসিদ্ধ mythগুলি যেখানে শেলীর প্রাণের নিগূঢ়তম রহস্যটি ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। তেমনি নজরুলের হৈহুল্লোড়পূর্ণ কবিতা টিকবে না; কেননা সেগুলির অনেকগুলিতে কবিত্ব নেই, গভীরতা নেই, টিক্‌বে কবির প্রেমিক হৃদয়ের উৎসারিত কতকগুলি সুখ-দুঃখের গান, যেখানে চিরকালীন পাঠকের মানসিক বোদ্ধিক উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। এইখানে শেলী-নজরুলের সঙ্গে বায়রণের তফাৎ। তিনি প্রেমের গান রচনা করতে পারেন নি—যদিও হাসি-বিদ্রূপের ফাঁকে ফাঁকে করুণ রসের আদর্শ, প্রেমের সৌন্দর্য ও হৃদয়াবেগের আলোচনা করেছেন কিন্তু পরক্ষণেই তাতে satire মনোবৃত্তি ফুটে উঠেছে। সংসারের নির্লিপ্ততা, সমাজের উপেক্ষা, মানুষের উপহাস, সকলকে অনাদর ও অবজ্ঞা বায়রণকে ক'রে তুলেছিল মানবদ্বেষী। তিনি সর্বদা দুটি কথা মনে রেখেছেন। একটি হোল—

· I have not loved the world, nor the world me
I have not flatter'd its rank breath, nor bow'd
To its idolatries a patient knee,
Nor coin'd my cheek to smiles, nor cried aloud
In worship of an echo , ••

দ্বিতীয় কথাটি হোল—

. Prepare for rhyme—I'll publish, right or wrong.
Fools are my theme, let satire be my song.
(English Bards and Scotch Reviewers)

এই অভিমানের জন্যে তিনি lyrical ballad রচনা করতে পারেননি—করলেও তাঁর মনের ক্ষোভ অজানতেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। তাঁর জীবনের

গতি যখন পরিবর্তিত হচ্ছে, উত্তেজক প্রকৃতির স্বীয় দৌর্বল্য যখন বুঝতে সবেমাত্র আরম্ভ করেছেন তখনি মৃত্যু এসে তার শীতল কর প্রসারিত করল—বায়রণ-জীবনের ট্র্যাজেডি এইখানেই লুকিয়ে রইল।

শেলী "Sensitive Planet"এ প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দের যে মৃত্যু নেই একথাই বলেছেন—

: For love, and beauty, and delight,
There is no death, nor change ;

নজরুলের 'অ-নামিকা', 'চির জনমের প্রিয়', 'সে যে আমি', 'আর কতদিন' ইত্যাদি কবিতায় এই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। শেলী যে শুধু একটি ব্যক্তির সহিত প্রেমের একাত্মতা অনুভব করতেন তাই নয়, সমগ্র বিশ্বজগতে তিনি প্রেমের এই অপরূপ সৌন্দর্য অনুভব করেছিলেন !—

: The fountains mingle with the river
And the rivers with the ocean
The winds of heaven mix for ever
With a sweet emotion ;
Nothing in the world is single
All things by law divine
In one another's being mingle
Why not I with thine ?

(Love's Philosophy)

শেলীর প্রেমের এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি নজরুলের প্রেমের কবিতাগুলি পড়লে এর খানিকটা আভাষ পাওয়া যাবে। প্রেমের পূজা করতে গিয়ে কবি নজরুল জলে স্থলে সর্বত্র মোহিনী প্রিয়ার প্রকাশ দেখতে পাচ্ছেন। যেমন—

: সে যে চাতকই জানে তার মেঘ এত কি,
যাচে ঘন ঘন বরিষণ কেন কেতকী,
চাঁদে চকোরই চেনে আর চেনে কুমুদী,
জানে প্রাণ কেন প্রিয়ে প্রিয়তম চুমু দি'।

(দোলন-চাঁপা)

: তরু, লতা, পশু, পাখী, সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে, আমি রমি বিশ্ব কামনাতে।
বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি,
সকলের মাঝে আমি—সকলের প্রেমে মোর গতি।

(অ-নামিকা : সিন্ধু-হিন্দোল)

প্রেমের ধর্মই মানুষকে তথা বিশ্বজগৎকে ধারণ করে আছে। শেলী বলেছেন—

: All things are re-created and the flame
Of consentaneous love inspires all life
The fertile bosom of the Earth gives suck
To myriads, who still grow beneath her care
Rewarding her with their pure perfectness.
The balmy breathings of the wind inhale
Her virtues, and diffuse them all abroad,

: One sound beneath, around, above,
Was moving, 'twas the soul of love.. .

নজরুল বলেছেন—

: একের লীলা এ, দু'জন নাই
তাঁহারি সৃষ্টি সবাই ভাই,
কত নামে ডাকি—সর্বনাম এক তিনি,
তাঁরে চিনি নাক, নিজেরে তাই নাহি চিনি।
আলো ও বৃষ্টি তাঁহার দান
সব ঘরে ঝরে এক সমান
সকলের মাঠে শস্য দেয় ফুল ফোটায়,
সকল মানুষ তাঁর ক্ষমা করুণা পায়!
... ...
একেকে মানিলে রহে না দুই,
এস সবে একেকে ছুঁই,

এক সে স্রষ্টা সব-কিছুর সব জাতির।
আসিছে তাহারি চন্দ্রালোক এক বাতির!

(নতুন চাঁদ: নতুন চাঁদ)

অনেকেই বলেন শেলী নাস্তিক, তিনি ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না। তাঁর প্রেম আলাদা বস্তু, কেননা তিনি প্রচলিত ধর্মতন্ত্র পুরোহিত-তন্ত্রকে অমান্য করেছেন, খৃষ্টান মতে ধর্মদ্বেষী ছিলেন। যখন শেলী জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে, বিহগের কলগানে, পত্রের মর্মরে, ফুলের সৌরভে, উজ্জ্বল সূর্যালোকে—সব কিছুর মধ্যে এক সর্বব্যাপী সত্তার প্রকাশ দেখে বলে উঠেন—

: Look on yonder earth
The golden harvests spring ; the unfailing sun
Sheds light and life ; the fruits, the flowers, the trees,
Arise in due succession ; all things speak
Peace, harmony and love. (Queen Mab)

তখন আমাদের কী মনে হয়? শেলীর কথাতেই আবাব বলি—

I know
That Love makes all things equal : I have heard
By mine own heart this joyous truth averred :
The spirit of the worm beneath the sod
In love and worship, blends itself with God.

(Epipsychidion)

অতএব তাঁর মধ্যে যে একটি গভীর ধর্মতৃষ্ণা ছিল, একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছিল তা আর সন্দেহ করা চলে না। শেলীর এই প্রেমতত্ত্বকেই (Principle of Love) গান্ধীজী বলতেন শেলীর ঈশ্বর। শেলীও নিজে প্রেমাস্পদ মূর্তিকে সম্বোধন করে বলছেন, 'O embodied Ray of the Great Brightness!' শেলীর Pantheismও হোল এই। নজরুলের কাব্যেও এই Pantheism রয়েছে। কাজী আব্দুল ওদুদ বলেছেন—

"অন্তরের গোপনতম প্রদেশে তিনি তাত্ত্বিক আর সেই তাত্ত্বিকতা তাঁর যেন জন্মগত। তাঁর এই প্রিয়তত্ত্বের নাম দেওয়া যেতে পারে লীলাবাদ—ইংরেজিতে যা সাধারণতঃ Pantheism নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন, সব কিছুই ভগবানের লীলা।……এই হিন্দু-মুসলমানের মাথা ভাঙাভাঙির দিনেও নজরুল যে অবলীলাক্রমে শ্যামাসঙ্গীত ও বৃন্দাবন-গাথা রচনা করে চলেছেন, তৌহীদেরও (একেশ্বর তত্ত্ব) শক্তিশালী ব্যাখ্যা দিতে পারছেন, তার রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর এই মূল বিশ্বাসের ভিতরে"।

শেলী-নজরুলের মত বায়রণও ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর প্রিয় গ্রন্থ ছিল বাইবেল।

: I speak not of men's creeds—they rest between
Man and his maker……

(Childe Harold's Pilgrimage, Canto 4)

: Of that which is of all Creator and defence.

(Do Canto 3)

: If life eternal may await the lyre,
That only Heaven to which Earth's children
may aspire :

(Do Canto 2)

শেলী-নজরুলের সঙ্গে বায়রণের আর একদিক দিয়ে তফাৎ হচ্ছে নারী-দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। শেলী ও নজরুল নারীর বন্দনা গান গেয়েছেন। নারীপ্রেম থেকেই নজরুলের বিদ্রোহীভাব জন্মেছে। নারী পুরুষের সহধর্মিণী যেমন তেমনি সমঅংশী। পুরুষের যেমন অধিকার ও দাবী রয়েছে তেমনি নারীরও রয়েছে। নজরুল গেয়ে উঠলেন—

: সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণকর।
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
… … … …

কোন কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী ;
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়লক্ষ্মী নারী।

(নারী, সাম্যবাদী : সর্বহারা)

শেলী প্রমিথিয়ুসের উক্তির মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করেছেন রমণী সম্পর্কে তাঁর দরদের কথা—

: Asia, thou light of life,
Shadow of beauty unbeheld ! and ye,
Fair sister nymphs who made long years of pain
Sweet to remember, through your love and care ;
And we will search with looks and words of love,
For hidden thought, each lovelier than the last—

(Prometheus Unbound)

বায়রণ বললেন—

. But woman is made to command and deceive us.

তাঁর কাছে নারী রূপজ কামজ মোহেই দেখা দিয়েছে—তার অন্য কোন গুণ নজরে পড়েনি। তাই "Don Juan"-এ দেখি ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যে যে-কোন নারী অবলীলাক্রমে তার সতীত্ব বিসর্জন দিতে পারে। নারীকে তিনি অঙ্কিত করেছেন মোহময়ী ছলনাময়ী ভোগবিলাসিনীরূপে—বায়রণ-চরিত্রের এটিই প্রধান দুর্বলতা—

: I love the fair face of the maid in her youth,
Her caresses shall tell me, her music shall soothe.

(Childe Harold's Pilgrimage)

: Woman ! experience might have told me
That all must love thee who behold thee ;
Surely experience might have taught
Thy firmst promises are naught ;
But, placed in all thy charms before me,
All I forget, but to abhore thee.

... ...

Woman that fair and fond deceiver,
How prompt are striplings to believe her

... ...

How quick we credit every oath,
And hear her plight the willing troth!
Fondly we hope 't will last for aye,
When, lo ! she changes in a day.
This record will for ever stand,
"Woman, thy vows are traced in sand,"

(To Woman : Hours of Idleness)

The approach of home to husbands and to sires,
After long travelling by land or water,
Most naturally some small doubt inspires—
A female family's a serious matter ,
(None trusts the sex more, or so much admires—
But they hate flattery, so I never flatter ;)
Wives in their husbands' absences grow subtler,
And daughters sometimes run off with the butler.

(Don Juan)

অবশ্য Satire রচনায় বায়রণ ছিলেন অজেয় শিল্পী—সমসাময়িকদের মধ্যে মানব জীবন সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা কৌতূহলী। ব্যঙ্গ-কৌতুকের মধ্যে social whip বর্ষণ করার ক্ষমতা তাঁর মত আর কারোর নাই। শেলী satire রচনা করতে গিয়ে নিজের প্রেমিক হৃদয়ের চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন; কেননা তাঁর অধিগত জিনিসটি ছিল কমনীয়তা। নজরুল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ রচনায় কিছুটা শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর 'প্যাক্ট', '[illegible] বা', 'সর্দা বিল', 'সাহেব ও মোসাহেব', 'প্রাথমিক শিক্ষা বিল', 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস', 'দে গরুর গা ধুইয়ে' ইত্যাদি কবিতায় গলিত সমাজের দুর্বলতা, মনুষ্যত্বের অপমান অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। প্রকৃতি নিয়ে রচনায় বায়রণের অত নিপুণতা ছিল না। এদিক দিয়ে শেলী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলী শিল্পী। শেলীর বহিঃপ্রকৃতির অধ্যাত্মসম্পদে বায়রণ প্রভাবিত

হয়েছেন। তাঁর 'Childe Harold's Pilgrimage' ও 'Manfred'-এ এরূপ প্রকৃতির চমৎকার বর্ণনা আছে কিন্তু প্রকৃতি উপাসনার এই কোমল সুর বায়রণ-কাব্যের গভীরতম সুর নয়। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, লঘু চপল মনোবৃত্তির আধিক্যহেতু তাঁর এ সুর কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। তাই তাঁর এ প্রচেষ্টার মধ্যে কৃত্রিমতা রয়েছে বলে মনে হয়। অথচ নজরুলের রচনায় মধুর রসের একটি ক্ষীণধারা প্রথম হতেই প্রবহমান। এই মধুর রসের ক্ষীণধারা সঙ্গীত রচনায় চরম পরিণতি লাভ করেছে।

একথা না বললেও চলে শেলীব সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য থাকলেও রচনাশৈলী ও ভাবগভীরতার দিক দিয়ে নজরুলের কবিতা শেলীর সমকক্ষ নয়। বরং রবীন্দ্রনাথ ওয়াল্ট হুইটম্যান সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তা নিষ্ঠুর হলেও নজরুল প্রসঙ্গে সার্থকতরভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। তিনি লিখেছিলেন,—

"প্রকাণ্ড একটা খনি, ওর মধ্যে নানান কিছু নির্বিচারে মিশোল আছে, এরকম সর্বগ্রাসী বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন—আদিমকালের বসুন্ধরার সেটা ছিল—তার কারণ তাব মধ্যে আগুন ছিল প্রচণ্ড—এই আগুনে নানা মূল্যের জিনিস গ'লে মিশে যায়। হুইটম্যানের চিত্তে সেই আগুন যা-তা কাণ্ড ক'রে বসেছে। জাগতিক সৃষ্টিতে যে রকম নির্বাচন নেই, সংঘটন আছে, এ সেই রকম। ছন্দোবন্ধ সব লণ্ডভণ্ড—মাঝে মাঝে এক একটা সুসংলগ্ন রূপ ফুট উঠে আবার যায় মিলিয়ে। যেখানে কোনো যাচাই নেই, সেখানে সকলের সব স্থানই স্বস্থান। এক দৌড়ে সাহিত্যকে লঙ্ঘন ক'রে গিয়েছে, এই জন্যে সাহিত্যে এর জুড়ি নেই—মুখরতা এর অপরিমেয়—তার মধ্যে সাহিত্য অসাহিত্য দুই সঞ্চরণ করেছে আদিম যুগের মহাকায় জন্তুদের মতো। এই অরণ্যে ভ্রমণ করতে হলে মরিয়া হওয়া দরকার!"

তবে পৃথিবীর দুঃখ-বেদনাকে জনতার সংগ্রামকে বরাবরই তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন—বইয়ের পাতা খুললে অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। এই জন্যেই এঁরা তিনজনই

পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
তাঁদের বাঁশির সুরে সাড়া জাগিবে তখনি॥

বাংলা-সাহিত্যে নজরুল

কবি নজরুল ইসলাম বাংলা-কাব্যের সেই যুগের প্রতিভূ যখন বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিরা এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন। সে-সমস্যাটা আর কিছুই নয়, কী করে রবীন্দ্রপ্রভাব এড়িয়ে কবিতা লেখা যায়, আর বাস্তবোত্থিত সমস্যাকে কাব্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা।

প্রাক রাবীন্দ্রিক কাব্যাদর্শে আগেই তামাদির নোটিশ জারি হয়ে গেছে। কবিগুরুর প্রভাব বাংলা দেশের সার্বিক শিল্প সাধনার ওপর যে কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং বাঙলার কাব্য-সাধনা যদি দীর্ঘকাল তাঁরই প্রভাবচ্ছায়ায় লালিত হয়ে থাকে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল স্বাধীনভাবে কিছু নূতন সৃষ্টি করতে গেলেই তাতে অনিবার্যভাবে কায়াহীন রবীন্দ্রনাথ এসে পড়ছেন। স্ব-নির্ভর হবার স্বার্থে সেই মহৎ আশ্রয় থেকে মুক্ত হবার প্রয়োজন দেখা দিল। বিশেষ করে যখন কয়েকজন কবি যেমন করুণানিধান, কিরণধন, কুমুদরঞ্জন, যতীন বাগচী, কালিদাস রায়, সত্যেন দত্ত প্রভৃতি নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে শেষে রবীন্দ্র-চুম্বকের সংলগ্ন হয়ে রবীন্দ্র-কাব্যের অগভীর রীতি-নীতির অনুকরণকারী হয়ে পড়লেন তখনি তরুণ উদ্যোগাদের সমস্যাটা রীতিমত ভাবিয়ে তুললে। রবীন্দ্রনাথ যে-পথে নামেন নি সেই পথে নেমে বাংলা কাব্যের উপকরণ খুঁজতে হবে—সে-পথ ক্ষুদ্র হোক ক্ষতি নেই কিন্তু বৈশিষ্ট্যযুক্ত হোক। তবেই রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতা লেখা চলতে পারে নইলে কবিতা হবে রবীন্দ্র প্রভাবের অক্ষম অনুকরণ। পথ নবীন কবিদের সামনে খোলাই ছিল—প্রথম মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী আঘাতে একদিকে দুনিয়াব্যাপী আর্থিক মন্দার আগুনে মধ্যবিত্তের আদ্যিকালের সাজানো বাগান পুড়তে আরম্ভ করল, পুরোণো ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার রঙীন গোলাপী স্বপ্ন-সৌধ পথের ধূলোয় তাসের খেলাঘরের মতো ভেঙে পড়তে লাগল, অন্যদিকে মহাযুদ্ধ আমাদের যুক্ত করে দিল বিশ্বজীবনের সঙ্গে আর আত্মীয় সম্পর্ক পাতিয়ে

দিয়েছিলেন ১৯১২তে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের সঙ্গে। রাশিয়ায় মেহনতী মানুষের অধিকারের লড়াই জয়যুক্ত হয়েছে, সামন্ততান্ত্রিক দুনিয়ায় মালিকানার কায়েমি স্বার্থে চিড় ধরেছে। ভারতবর্ষে এই শুভসংবাদ প্রত্যেকের কানে পৌঁচেছে ঃ তখন ভারতবর্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে, কুখ্যাত রাউলাট আইন জারি হয়েছে, ইংরেজ শাসক অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে। তাই বিদেশী শাসন থেকে ভারতের মুক্তি, বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার রক্ত শোষণ থেকে নিজেদের মুক্তি ভারতের জন-হৃদয়কে তখন উদ্বেল করে তুলেছে। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। সাহিত্যে তখনও কেউই আসেননি—সাহিত্য চিরকাল মানুষের সংগ্রামে প্রেরণা ও উদ্দীপনা যুগিয়েছে। ইতিপূর্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একযোগে এগিয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয় দশকের আন্দোলনে তিনি এগিয়ে আসেন নি—তিনি যে বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন মনে মনে এঁকেছিলেন সে-স্বপ্ন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে ভেঙে গিয়ে ভারত আবার কূপ-মণ্ডুকতায় পরিণত হবে—এই চিন্তায় তাঁর বিশাল উদার মহৎ মন শিউরে উঠল। আন্দোলনে নামতে প্রাণ থেকে যখন তিনি তাগিদ পেলেন না তখন তিনি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী স্থাপনের মধ্য দিয়ে নিজের কাঙ্খিত স্বপ্নকে মূর্ত করে তোলার কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। বাঙালী তখন উন্মুখ হয়ে রয়েছে সাহিত্যিকের কাছ থেকে নির্দেশ পাবার জন্যে—স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আন্দোলনকে সার্থক করে তুলবার জন্যে বহু প্রাণমাতানো গান ও কবিতা পেয়েছিল বলে তাঁর কাছে সেদিন আশা করাটা আমাদের অন্যায় ছিল না। এই আলো-আঁধারে জড়ানো এক বিচিত্র নবারুণের দ্যুতিকে তখন তরুণ কবিরা না পারছেন স্বাগত জানিয়ে দুঃসাহসিক পথে এগুতে, না পারছেন সেই পুরোণো অনড় নির্জীব অচলায়তনের বদ্ধ কারায় ফিরে গিয়ে নবজীবনের অভিসারকে ভুলতে। মন তখন দোলকের মত এপাশ-ওপাশ দুলছে।

অবস্থাটা যখন এই রকম চলছে তখনি নজরুল ইসলাম পুরোণো জীবনের সবকটা অর্গলবদ্ধ জানালা খুলে বাইরের নতুন হাওয়াকে ঘরের মধ্যে ঝড়ের মতো এনে ফেললেন। বাঙালী-প্রাণের বহুদিনের সঞ্চিত জড়তা, সংস্কার ও গ্লানি ঝড়ের মুখে খড়-কুটোর মত উড়ে গেল। অনেক কালের পরাধীনতার

শৃঙ্খল-ভাঙার সংকল্প তাঁর কবিতায় ঘোষিত হল। তরুণ কবিদের মনোজগতে নতুন গ্রন্থের প্রথম পাতা তিনি খুলে দিতেই রবীন্দ্র-কাব্যের প্রভাব যাঁরা এড়াতে চাইছিলেন, সত্যেন দত্তের কাব্যরীতির অন্তঃসারশূন্য উদ্দেশ্যহীন ছন্দের কসরৎ যাঁদের একঘেঁয়ে লাগছিল নজরুল ইসলামের কবিতা যেন তাঁদের চোখের সামনে নতুন দিনের রঙীন আলোর আশার প্রদীপ জ্বেলে দিল।

নজরুলের সাহচর্য ছাড়া মুক্ত বেপরোয়া যৌবনের প্রাণখোলা ভাষা সেদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি—রবীন্দ্রনাথের যৌবন বের্গসেঁর গতিবাদের সঙ্গে আত্মার ক্রমবিকাশবাদের সংমিশ্রণে তত্ত্বমূলক, সত্যেন দত্তে বন্ধনহীন যৌবনের উত্তাল উদ্দামতা ছিল না, মোহিতলালের যতটুকু ছিল তাও মানসিক গাম্ভীর্যে উদ্দেশ্যমূলক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মধ্যে যৌবন ছিল সৌখীন বিতৃষ্ণাবাদের অবিশ্বাসের বেড়া দিয়ে ঘেরা। নির্বাধ উদ্দেশ্যহীন বেহিসেবী জীবন-কল্লোলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নজরুলের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর অব্যবহিত আঘাতের শক্তিতে তৎকালীন যুবক ও কিশোর কবি তাঁর থেকেই নতুন-কাব্যের ইঙ্গিত পাবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তাই আজও রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁকেই উজ্জ্বলতম সেতু বলে নির্দেশ করতে আমাদের একমুহূর্ত দেরী হয় না।

নজরুলের কাছ থেকে শুধু এটুকুই কি আমরা পেয়েছিলুম? না, পেয়েছিলুম এই আশ্বাস যে, উচ্ছ্বাস, আবেগ-কল্পনার জগৎ থেকে সাংসারিক সমতলে কবিতা নেমেও সে জাতিভ্রষ্ট হয় না। জীবনের রূঢ় বাস্তব কবিতার মধ্যে আসতেই কাব্য-বিচারে সমাজ সচেতনতার মানদণ্ড প্রয়োগ করা আরম্ভ হল। কবিতা যে জীবন-সংগ্রামের হাতিয়ার হতে পারে সে-ধারণা বাংলাদেশে বদ্ধমূল হল তাঁর কাব্য-পাঠের মধ্য দিয়েই, আর তিনিই দেখিয়ে দিলেন কবিতা এবং জীবনকে, সংগ্রাম এবং আদর্শকে কি ভাবে একাত্ম করে তুলতে হয়। যখন তাঁর কবিতা অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করল তখন তাঁর নতুনতর কাব্যাদর্শকে সচেতন কাব্যরসিকের মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। পেয়েছিলুম এযাবৎ একটিমাত্র উদাহরণ, যিনি আধুনিক যুব-মনের নানা অস্বাস্থ্যকর আচারের বন্ধন মাকড়সার জালের মত ছিন্ন করে পচা সমাজ-ব্যবস্থা উৎখাত করতে, পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে অতিশয় দৃপ্ত ও অধীর ছন্দে নওজোয়ানদের আহ্বান করার ফলে বিদেশী সরকার তাঁকে এক বছরের

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে, তাঁর একাধিক বইয়ের প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ করে দিয়েছে—বাংলা-সাহিত্যে এ পর্যন্ত এর উদাহরণ অপ্রতুল।

আর কি কিছুই পাইনি? আরো কিছু পেয়েছিলুম। প্রথমতঃ, বক্তৃতাধর্মী যুক্তি-তর্কের ফাঁকে, গদ্যধর্মী কথার মাঝে হঠাৎ এক-একটি লুব্ধ করা, মুগ্ধ করা আলোময় উজ্জ্বল পংক্তি, যেমন—

: রং করা ঐ চামড়ার মত আবরণ খুলে নাও।

(কুলিমজুর—সাম্যবাদী : সর্বহারা)

: আমার ক্ষুধার অন্নে পেয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ—

(ফরিয়াদ : সর্বহারা)

: আঁখির ঝিনুকে সঞ্চিত থাক যত অশ্রুর ব্যথা।

(জাকাত লইতে এসেছে ডাকাত চাঁদ : সর্বহারা)

: রোদের উনুন না নিবিলে চাঁদের সুধা গল্‌ত না।

: গগন-লোকে আকাশ-বধূর সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলত না।

(সান্ত্বনা : চিত্তনামা)

তাঁর সাহিত্যে খুব বেশী নেই বলেই তাদের মনোহারিত্ব যেন আরও বেশি। দ্বিতীয়, একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী—অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন থেকে ভিন্ন এ অর্থে বলছি। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম লোকোত্তরণ, অবিরল অতীন্দ্রিয়রাজ্যের রহস্যোদ্‌ঘাটনের পরে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদ ও মোহিতলালের নির্ভয় দেহারতিতে তরুণ কবিরা যেমন উৎসাহিত হয়েছিলেন, তেমনি অপরদিকে নজরুলের তীক্ষ্ণ বিদ্রোহবাদে তাঁদের মন দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হল, বুর্জোয়া সমাজে যারা হরিজন তাদের দুঃখ বেদনার করুণ কাহিনী তাঁদের কর্ণগোচর হল—দেশের তরুণ-তরুণীদের মনে জেগে উঠল মুক্তির প্রাণকল্লোল। এতদিন যাঁরা বাংলা সাহিত্যের নির্জীব স্নায়ুশীলায় সৃষ্টির আনন্দময় আভিজাত্যে আবাল্য অভ্যস্ত ছিলেন এবার সেইখানে দেখা দিল প্রেমের ললিতগীতির পরিবর্তে নিপীড়িতের আর্তনাদ, দৌর্বল্যের স্থানে বীরত্বপূর্ণ অভিযান—

: আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি আমি এমনি শক্তিমান।
মম চরণের তলে মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান!

(অভিশাপ : বিষের বাঁশী)

স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন তাঁর বাণী—

: মোরা ভাই বাউল চারণ
মানি না শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি
হাসি জোর জয়ের হাসি,
অ-বিনাশী নাইক মোদের ডর রে।
গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
মরা প্রাণ উট্‌কে' দেখাই
ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে।
খুঁড়ব কবর, তুড়্‌ব শ্মশান
মড়ার হাড়ে নাচাব প্রাণ
আন্‌ব বিধান নিদান কালের বর রে।

(যুগান্তরের গান : বিষের বাঁশী)

বাধাবন্ধহারা যৌবনের এই বিদ্রোহের সুর মনোরম বটে, কিন্তু এর থেকে কোন গতিশীল চিন্তার সূত্রপাত তাঁর কবিতার মধ্যে হয়নি। তাই তাঁর ভাব ও ভাষার পুনরুক্তি বহুস্থানেই ঘটেছে—চিন্তার পরিণতি আসেনি। বিদ্রোহভাব নিয়ে তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলি কবিতা লিখেছেন, সেগুলি যেন একজন প্রতিভাবান বালক-কবির লেখা—কুড়ি আর চল্লিশের মধ্যে কোনরকম প্রভেদ বোঝা যায় না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে সারা জীবনে ক্ষণিক যৌবনকে শাশ্বত করে রাখা এও কম কৃতিত্বের কথা নয়। বয়সের যে কোঠায় চুল পাকে, চামড়ায় লোল পড়ে, সেই কোঠাতেও কাঁচা-বয়সের কচি-মনকে জীইয়ে রাখা বাংলার কুড়িতে বুড়ী হবার দেশে তিনি আশ্চর্যরকমের ব্যতিক্রম। তৃতীয়, তাঁর কাব্যের মাধ্যমেই সাম্যবাদ স্বীকৃতি ও ব্যাপকতা লাভ করে। সত্যেন দত্ত যদিও বলেছিলেন, 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সকলি সমান রাঙা' কিন্তু নজরুলের মত সরব ও স্পষ্ট ঘোষণা তাঁর কাব্যে নেই। চতুর্থ, তিনি এযুগের প্রথম মুসলমান কবি—যিনি অতীতকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন নতুন আলোকে, যাঁর রচনায় সারা বাংলাদেশ সাড়া দিয়েছে এবং কলরবমুখর খ্যাতির অঙ্গনে যিনি একজন বড়

কবি বলে প্রচারিত হয়েছেন, স্বয়ং কবিগুরুর সস্নেহ আশীর্বাদ পেয়েছেন। এর ফলে বাঙালী মুসলমান-সমাজে মাতৃভাষায় সাহিত্য-রচনার উৎসাহ এবং তাতে গৌরব বোধ জেগেছে। পঞ্চম, বাংলা কবিতায় তাঁর আরবী-পারসী শব্দ-প্রয়োগ কবিতাকে শ্রুতি-মাধুর্য ও গতিমুখর করে তুলেছে। যদিও অকপটে স্বীকার করছি যে, তাঁর শব্দ-প্রয়োগ সব সময় সুপ্রয়োগ হয়নি। ভাবের অনুসরণে তাঁর শব্দচয়নের নিপুণতার উদাহরণ বিরল বলেই যেন আরও ভাল লাগে। যেমন—

ঃ নীল সিয়া আস্‌মান, লালে লাল দুনিয়া।—
"আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।"
কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা কোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে!
....
হল্‌কুমে হানে তেগ ও কে ব'সে ছাতিতে?
আফ্‌তাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে!
আস্‌মান ভরে গেল গোধূলিতে দুপুরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে!
... ...
ফিরে এলো আজ সেই মোহর্‌রম মাহিনা,—
ত্যাগ চাই,—মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।

(মোহররম ঃ অগ্নি-বীণা)

সত্যেন দত্ত মোহিতলাল ইতিপূর্বে আরবী-ফারসী শব্দের প্রচলন বাংলা-কাব্যে করেছিলেন। কিন্তু সেটা নির্জলা কৃত্রিমতা বলেই মনে হয়েছে, কেননা মুসলমানের ঐতিহ্য (tradition) তাঁদের কবিচিত্তকে গৌরবময়ী প্রেরণা ও উদ্দীপনা দান করেনি। তা করেছে নজরুল ইসলামকে—যিনি 'শাত্-ইল আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবাণী', 'মোহর্‌রম', 'কামাল-পাশা', 'জগলুল পাশা', 'মরু-ভাস্কর' ও ইসলামী গান লিখেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে মুসলিম সমাজজীবনের রীতিনীতি হালচাল আমরা প্রথম জেনেছি! 'প্রথম জেনেছি' কথাটা বলা হয়ত ভুল হল ঐতিহাসিক দিক

দিয়ে। কেননা ইতিপূর্বে কাজী ইমদাদুল হকের "আবদুল্লাহ" উপন্যাসে মুসলিম সমাজ-জীবনকে পেয়েছিলুম। বয়সের প্রবীণতায় ঐতিহাসিক ক্রোড়পত্রে হক সাহেব প্রথমজন হিসেবে অবশ্যই কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন, কিন্তু তাঁর সে-উপন্যাস বহুল পঠিত হয়নি কারণ হক্‌সাহেব হিন্দু-মুসলমান মিলিত বাংলা-সাহিত্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারেন নি। সমসাময়িক মুসলিমদের উপর তাঁর প্রভাব পড়েছিল, কিন্তু হিন্দু সমাজের উপর তাঁর প্রভাব একদমই পড়েনি। নজরুলই প্রথম মুসলিম সাহিত্যিক যিনি তাঁর সম-সাময়িক মুসলিম বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মত এক যুগ সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সঙ্গে বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরও বাংলা-কবিতা যে লেখা যায় তা দেখিয়ে দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম জন্মদাতা হিসেবে সম্মানার্হ হয়েছেন। কাজেই তিনি জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের মনোহরণ করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর গল্প-উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণে ও ঘটনা সংস্থাপনে ত্রুটি থাকা সত্বেও মুসলিম সমাজের ক্রিয়া-কলাপের প্রতি আমাদের সকলের কৌতূহল সঞ্চার করেছে। ষষ্ঠ, বাংলা ভাষায় নজরুলের দান। বাংলা ভাষার ছান্দসিকতা ও সূক্ষ্ম কারুকার্যতার দরুণ করুণ পেলবতাকে তিনি শাণিত অস্ত্র করে তোলেন, সে-প্রকাশ যেন দহন সূর্যরশ্মির মতো অনাবৃত। বাংলা ভাষার প্রেমে তিনি যেমন তার নর্মসহচরী হয়েছেন তেমনি তাকে হুকুম তামিল করাতে ভয় পাননি। "যুগবাণী", "রুদ্রমঙ্গল", "দুর্দিনের যাত্রী", বইয়ের বিষয়বস্তু অনেকাংশে আজকের দিনে বাতিল হয়ে গেলেও তার সংগ্রামিক ভাষা আজও আমাদের অনুকরণযোগ্য, কারণ স্বাধীনতার পরও যেখানে শাসকের নামে চলেছে অবাধ শোষণ, সেখানে বতমান সমাজব্যবস্থাকে উৎখাত করতে হলে ভদ্র বিনিময়ে নিবেদন পেশ করলে কেউ গ্রাহ্য করবে না, ভাষায় আনতে হবে তাঁর মত রৌদ্রদীপ্ত পৌরুষের ঝলক। সব শেষের দামী কথা হল, বাংলা কাব্যের উপর নজরুলের প্রভাব পড়েছে রূপের দিক থেকে যতটা নয় ভাবের দিক থেকে তার চেয়েও বেশী। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস, মহীউদ্দীন প্রভৃতি তার প্রমাণ।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর দানের ঝুলি এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। যেখানে তাঁর প্রতিভা কাব্যলক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য লাভ করেছে সেই গানের কথা বলা হয়নি এখনও—অবশ্য গানকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে কারুর যদি

আপত্তি না থাকে। গান যে শুধু সুরের বাহন নয় তা যে কবিতাও এবং ভালো কবিতা তা সকলের আগে আমাদের বোঝা দরকার। গানের উদার-উন্মুক্ত চত্বরে গীতিরচয়িতা হিসেবে তাঁকে শুধু পাইনি, পেয়েছি তার সঙ্গে একজন সুরস্রষ্টাকেও। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা গানে আমরা যতদূর এগিয়ে এসেছি তার অগ্রগমনে নজরুলের একটা বড় দান রয়েছে। সুতরাং বাংলার সঙ্গীতকে যদি জানতে হয় তবে তাঁকে বাদ দিলে সে জানা সম্পূর্ণ হবে না।

প্রথম, বাংলা গানে গায়করা চান নিজেদের খুসীমত সুর সংযোগ। নজরুলের পূর্বে গায়কের এই স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়নি, রবীন্দ্রনাথও অধিকার দেননি। নজরুলই তাঁর গান গায়কের হাতে তুলে দিলেন ইচ্ছামত সুর দিয়ে গাইতে। গায়কী অহমিকা আধুনিক বাংলা গান থেকে তিনিই প্রথম দূর করে দিলেন। দ্বিতীয়, কবিগুরুর স্বদেশী গান বাংলা গানে একটা জাগরণ এনেছিল সন্দেহ নেই, তবু সে-জাগরণের সঙ্গে সামাজিক চেতনা তেমন করে জাগ্রত হয়নি যতটা জাগ্রত হয়েছে নজরুলের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে। স্বদেশী আন্দোলনের পর যখন দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন এল তখন প্রয়োজন হল নতুন কবির, যিনি গান গেয়ে দেশের লোকের মধ্যে চাঞ্চল্য আন্‌বেন। তখন নজরুলের দেশাত্মবোধক গানগুলি এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করেছে। জাতীয়-সঙ্গীতে Marching সুর তিনিই প্রথম নিয়ে এলেন। এই দশকের চারণকবি একমাত্র তাঁকেই বলা যেতে পারে। তৃতীয়, গানে নজরুলের এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ দান হোল তাঁর গজল। উর্দু-পারসিক গজলের সুরকে তিনিই বাংলার সুরের মোড়কে জড়িয়ে দেন। একদিকে সুরের সরল স্বাভাবিক গতি অপরদিকে হৃদয়াবেগ ও অনুভূতির স্পর্শে কাব্যসুষমা মিলিত হয়ে এমন এক উদার স্নিগ্ধতার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে যে পথের মানুষ রিক্সাওয়ালা থেকে অভিজাত মহলের মহিলাদের কণ্ঠে তাঁর গজল গান শোনা গেছে। চতুর্থ, প্রেমের গানে রবীন্দ্রনাথ দেহজাত প্রেমকে আমল দেন নি। তাঁর গান এমন এক পর্যায়ে উন্নীত যেখানে প্রেম ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। নজরুল সাধারণ মানুষের সামাজিক, প্রেম, বিরহ, বেদনাকে এমনভাবে আবেগসঞ্জাত করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ সংসারের অত নীচে নাম্‌তে পারেন নি। পঞ্চম, রবীন্দ্রনাথের ভগবৎভক্তিমূলক ব্রাহ্মসঙ্গীতের মত নজরুলও ইসলামী গান রচনা করেছেন। কবিগুরুর ব্রাহ্মসঙ্গীত ব্রাহ্ম-সমাজকে প্রভাবিত করতে তেমন পারেনি কিন্তু

নজরুলের ইসলামী সঙ্গীত শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের মধ্যে জাগরণ এনেছে। আধুনিক বাংলার ইসলামিক সমাজ কবির এই গানের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। ষষ্ঠ, রামপ্রসাদের পর শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন নজরুল। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী হৃদয়ের প্রবলতমধারা হোল এই শাক্ত। শক্তিপূজাই বাঙালী-সমাজের একটি গৌরবজনক বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ বাংলার এই শাক্তরূপ গ্রহণ করেননি। ফলে শাক্ত বাংলার সঙ্গে তাঁর একটি ব্যবধান গড়ে উঠেছে। কাজেই তাঁর দৃষ্টির মধ্যে যতটুকু বাঙালী ছিল ততটুকুতে সম্পূর্ণ বাঙালী চরিত্র ধরা পড়েনি। তিনি যেন একটি চলমান পৃথিবী—সমগ্র পৃথিবীর ভাবনাই তিনি ভেবেছেন। একটা ক্ষুদ্র দেশের জন্য সম্পূর্ণ মন-প্রাণ দিয়ে ভাবার অবসর তাঁর কোথায়! তিনি বাঙালী নন, বিশ্বনাগরিক। কিন্তু নজরুল বাংলাদেশের বাঙালী কবি, তাঁর মধ্যে শাক্তবৈষ্ণব, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনাই তাঁকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। তাঁর বীররসের কবিতা রচনায় কোন পরিণতি পাওয়া যায়নি; বন্ধনহীন জীবন-কল্লোলেই সেখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করেছে, কিন্তু তাঁর এই শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামী গান রচনায় তাঁর মধ্যে একটি নিষ্ঠাবান সাধকের সুর আত্মনিবেদনাকারে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছে। তিনি মুসলমান হয়েও শ্যামাসঙ্গীত রচনায় যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা অভূতপূর্ব, কেননা ইসলামে মূর্তিপূজা নিষেধের বাধাকে অপসারিত করে শ্যামাসঙ্গীতের সাথে ইসলামী গান রচনা করে মুসলিম সমাজের হৃদয় জয় করা যে কত বড় প্রাণশক্তির পরিচয় প্রদান করে তা আজকের দিনে ভেবে অবাক হতে হয়। একধর্মে মূর্তিপূজাই প্রধান, অন্যধর্মে মূর্তিপূজা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ—এই দুই বিপরীতকে তিনি একটি বৃন্তে বেঁধে দিয়েছেন। হিন্দু সংস্কৃতি ও ইসলামিক ঐতিহ্যে শুধু জ্ঞানের জন্যে এটি সম্ভব হয়নি—সম্ভব হয়েছে তাঁর সর্বসংস্কারমুক্ত প্রেমিক মনের জন্যে। জ্ঞানী হওয়ার আগে কবিকে প্রেমিক হওয়া প্রয়োজন, কেননা প্রেমহীন জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। বাংলা গানে নজরুল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছেন প্রেমের এই রাখীবন্ধন দিয়ে। সপ্তম, একটি গানের মধ্যেই একাধিক রাগ-রাগিনীর সংযোগ ঘটিয়েছেন এবং একটি রাগকে ভেঙে বহু রাগিনীর সৃষ্টি করেছেন। তিনি যে রাগমিশ্রণের ধারা অবলম্বন করেছেন তা আমাদের ঐতিহ্যবিরুদ্ধ হয়নি। তাই তাঁর গান উচ্চাঙ্গ আসরে বসে গাইলেও একেবারে বেমানান হবে না। দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদের পর তিনিই আমাদের বাংলা

গানের কারুণ্যের একঘেঁয়েমি ঘুচিয়ে দিয়ে গায়ন-পদ্ধতিতে নমনীয়তার সঙ্গে দৃঢ়তার একটা সহজ ও সুন্দর সমন্বয় নিয়ে এলেন। শিল্পী ও সুরস্রষ্টা একত্র মিলিত হতে পেরেছেন তাঁর রচনায়, এইখানেই তাঁর সার্থকতা। অষ্টম, মার্গসঙ্গীতের ভূয়ো আভিজাত্যকে তিনি দূরে সরিয়ে দিয়ে বাংলার লোকসঙ্গীত—যার মধ্যে বাংলার প্রাণধারা প্রবহমান তাকে তিনি স্থান দিয়েছেন আমাদের অভিজাত গানের মহলে। এখানেও তাঁর নিজস্ব রীতি অনেকখানি রয়েছে এবং মাঝে মাঝে রাগসঙ্গীতের স্পর্শও তিনি এনেছেন নিপুণভাবে। নবম, সুরবৈচিত্র্য ছাড়াও তিনি নিজস্ব কতকগুলো সুর সৃষ্টি করেছেন, যেমন 'বনকুন্তলা', 'সন্ধ্যামালতী', 'দোলন-চম্পা' প্রভৃতি। আরব-মিশর-পারস্য-তুরস্ক দেশের গানের সুর বাংলা গানে ফুটিয়েছেন। আমাদের সাঙ্গীতিক রুচির যথেষ্ট উন্নয়ন করেছিলেন প্রাচীন-রীতিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করেও সঙ্গীতের একটি বিরাট সংস্কার-সাধন করেছিলেন—এটিই হোল বাংলা গানে তাঁর দান সম্পর্কে শেষ কথা এবং সারকথা।

কথার শেষে মনে করিয়ে দিই যে সংস্কৃতিপরায়ণ মনের সূক্ষ্ম উপলব্ধি দিয়ে তাঁর কবিতা বা গানের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উপভোগ করার দরকার হয় না, যাতে সকলের ভাল লাগে, বক্তব্য বিষয়কে অস্পষ্ট না করে সোজাসুজি মানুষের মন ছুঁতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি তাঁর সাহিত্যকে নিতান্ত সহজবোধ্য করেই রচনা করেছেন। সেইজন্য সকল শ্রেণীর সকল স্তরের মানুষের মধ্যে নজরুল এত জনপ্রিয়। এজন্যে স্বাভাবিক কারণে ২৫শে বৈশাখের মত ১১ই জ্যৈষ্ঠও জাতীয় উৎসবের দিন হিসেবে পরিণত হতে চলেছে।

আলোচনাটা এখানেই শেষ করতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু নজরুল সাহিত্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

কৃত্রিম উপায়ে কেউ কোন সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না; সাহিত্য বেঁচে থাকে নিজস্ব শক্তিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে। নজরুলের সব লেখা কালের শাশ্বত লোকে উত্তীর্ণ হবে না। তাঁর সাহিত্যে সোনার চাইতে খাদের ভাগই বেশী। তবে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা ঘুমন্ত জাতকে জাগ্রত করেছেন সাহিত্যের সামাজিক মূল্য নিরূপণে তাঁর এ দান কম নয়। সেদিনকার বাস্তব প্রয়োজনকে জীবনের উপলমথিত বেদনাকে সকলের শীর্ষে খুলে ধরেছিলেন বলে

কবিতার বিশুদ্ধরূপের মধ্যে নিজেকে সমন্বয় দিতে পারেন নি। তার চেয়ে বলা ভাল যাঁরা মাথা খাটিয়ে কবিতা লেখেন তাঁদের দলের না হয়ে স্বভাবকবি হওয়ার জন্যে প্রেমের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ হয়নি তাঁর মধ্যে। কবিতাকে উৎকৃষ্ট করতে হলে 'truth of substance'-এর সঙ্গে 'high poetic seriousness' আনতে হলে অধ্যয়ন প্রয়োজন, প্রেমের সঙ্গে ধ্যান করা প্রয়োজন। ম্যাথু আর্ণল্ড বলেছেন, "For supreme poetical success more is required than the powerful application of ideas to life ; it must be an application under the conditions fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty. জ্ঞানের অগভীরতার জন্য নজরুল উৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষণ ধরতে পারেন নি তাঁর প্রেমিকের দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও। ফলে তাঁর কাব্য-সৃষ্টি সন্ধ্যাকাশের বর্ণচ্ছটার মতই ক্ষণস্বপ্নের ইন্দ্রজালে নয়নমনোহর সুন্দর আতসবাজির মতই পুড়েছে—চিরন্তন হরিত-নীলিমার অমৃতকুম্ভে স্নান করে ওঠেনি। কিপলিংএর মত কোলাহলকেই তিনি গানে বেঁধেছেন, জীবনের গভীরতম সত্য তাঁর গভীরতম চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি।

যা তাঁর হাত দিয়ে পাওয়া যায় নি তার জন্যে অহেতুক আক্ষেপ করে লাভ কী আছে! যা তিনি দিয়েছেন তার মধ্যে তাঁর অমরতার আসন রয়েছে কিনা সেটাই আমাদের সন্ধান করার কথা। অবশ্য এ সম্পর্কে রায়দানের চূড়ান্ত ক্ষমতা রয়েছে কালের আদালতের হাতে। তবে কবির সমকালের মানুষ হিসেবে তাঁর সম্পর্কে আমাদের আর্জি পেশ করতে দোষ কী। তাঁর সাহিত্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ভাবধারার মধ্যে এমন একটি আত্মসচেতন বৈশিষ্ট্য যোগ করে দিয়েছে যার সাহায্যে বাংলা-কাব্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগ সূচিত করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যের মনোসরণীতে ভূরিপরিমাণ বর্জনীয় অংশ উপেক্ষা করেও তাঁর এমন কতকগুলি কবিতা ও গান রয়েছে যেগুলি রসবেত্তাদের বহুকাল আনন্দবর্ধন করবে এবং সেগুলির জোরে তাঁদের মনোরাজ্যের অরূপ সিংহাসনে তিনি বসে থাকবেন শুধু ঐতিহাসিক কবিপুরুষ হিসেবে নয়, একজন সত্যিকারের কবি বলতে যা বোঝায় সেই নিগূঢ় অর্থে॥

পরিশিষ্ট

আমার সুন্দর।

নজরুল ইসলাম

আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোট গল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। "ধূমকেতু", "লাঙল", "গণবাণী"তে, তারপর এই "নবযুগে" তাঁর শক্তি-সুন্দর প্রকাশ এসেছিল, আর তা এল রুদ্র-তেজ, বিপ্লবের, বিদ্রোহের বাণী হয়ে। বলতে ভুলে গেছি, যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈনিকের সাজে দেশে ফিরে এলাম, তখন সর্বপ্রথম হকসাহেবের দৈনিকপত্র "নবযুগেই" কি লেখাই লিখলাম, আজ তা মনে নাই, কিন্তু পনের দিনের মধ্যেই কাগজের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

এই গান লিখি ও সুর দিই যখন, তখন অজস্র অর্থ, যশঃ-সম্মান, অভিনন্দন, ফুল, মালা—বাংলার ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা পেতে লাগলাম। তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ মাত্র। এই সম্মান পাওয়ার কারণ, সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই, জেলে গিয়ে চল্লিশদিন অনশন ব্রত পালন করি, রাজবন্দীদের উপর অত্যাচারের জন্য। এই অপরাধে আমাকে জেলের নানারকম শৃঙ্খল-বন্ধন ("লিঙ্ক-ফেটার্স", "বার-ফেটার্স", "ক্রস-ফেটার্স", প্রভৃতি)ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বসন্ত" নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদ মালা পেয়ে আমি জেলের সর্ব জ্বালা, যন্ত্রণা, অনশন-ক্লেশ ভুলে যাই। আমার মত নগণ্য তরুণ কবিতা-লেখককে কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। আমি কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি, তিনিও বলেন নি। আজ এই প্রথম মনে হল, তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার "সুন্দরের" আশীর্বাদ এসেছিল, জেলের যন্ত্রণা-ক্লেশ দূর করতে। তখন কিন্তু একথা মনে হয়নি।

তখনো একথা ভাবতে পারিনি, এ লেখা আমার নয়, এ লেখা আমারি সুন্দরের, আমারি আত্মা বিজড়িত আমার পরমাত্মীয়ের।

জেলে আমার সুন্দর শৃঙ্খলের কঠিন মালা পরিয়েছিলেন হাতে পায়ে, জেল থেকে বেরিয়ে এলেই আমার অন্তরতম সুন্দরকে সারা বাংলা দেশ দিয়েছিল ফুলের শৃঙ্খল, ভালোবাসার চন্দন, আত্মীয়তার আকুলতা। আট বৎসর ধরে বাংলাদেশের প্রায় প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায়, ছোট বড় গ্রামে ভ্রমণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গেয়ে, কখনো কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভালোবাসলাম। মনে হল এই আমার মা। তাঁর শ্যাম স্নিগ্ধ মমতায়, তাঁর গভীর স্নেহ-রসে, তাঁর উদার প্রশান্ত আকাশের কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা নীলে আমার দেহ-মন-প্রাণ শান্ত উদার আনন্দ-ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে উঠল। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ-সুন্দররূপে, আমার জননী জন্মভূমিরূপে।

আমি সেদিনের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও নেত্রীদের আহ্বানে বাংলাদেশ পরিক্রমণ করেছি, আমি তরুণদের সাথে মিশেছি—বন্ধু বলে, আত্মার আত্মীয় মনে করে। তারাও আমায় আলিঙ্গন করেছে বন্ধু বলে, ভাই বলে—কিন্তু কোনোদিন আমার নেতা হবার লোভ হয় নি, আজও সে লোভ হয় না। আমার কেবলই যেন মনে হত আমি মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছি। জাতি-ধর্ম-ভেদ আমার কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই। আমাকে কোনোদিন তাই কোনো হিন্দু ঘৃণা করেন নি। ব্রাহ্মণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। এই আমি প্রথম আমার যৌবন-সুন্দর, প্রেম সুন্দরকে দেখলাম।

তারপর আমার সুন্দর এলেন শোক-সুন্দর হয়ে। আমার পুত্র এল নিবিড় স্নেহ-সুন্দর হয়ে। বাইরে মোমের মত ছিল সে সুন্দর, মমতার মধু-মাধুরী, রসসুরাভ ভরা ছিল তার অন্তরে। সে আমাকে আত্মার মত জড়িয়ে ধরল। যেখানে যেতাম, সে আমার সাথে যেত। আমার সাথেই খেলত, মান অভিমান করতো। যে সুর শিখাতাম, সে সুর দু'বার শুনেই সে শিখে নিত। তখন তার তিন বছর আট মাস বয়স। একদিন রাত্রে বলল, "বাবা, চাঁদের মধ্যে কে একটি ছেলে আমাকে বাঁশী বাজিয়ে ডাকছে।"

হঠাৎ আমার দেহে মনে কি যেন বিষাদের, বিরহের বেদনার ঢেউ দুলে উঠলো। চোখের জলে বুকে ভেসে গেল। সেই রাত্রে তার প্রবল জ্বর এল। ভীষণ বসন্ত রোগে ভুগে হাসতে হাসতে আনন্দধামের শিশু আনন্দধামে চলে গেল।

আমার সুন্দর পৃথিবীর আলো যেন এক নিমেষে নিভে গেল। আমার আনন্দ, কবিতা, হাসি, গান যেন কোথায় পালিয়ে গেল, আমার বিরহ, আমার বেদনা সইতে না পেরে। এই আমার শোক-সুন্দর।

এই আমার প্রথম প্রশ্ন জাগল—কোন্ নিষ্ঠুর এই সৃষ্টি করে, কেন সে শিশু সুন্দরকে কেড়ে নেয়? এই শোকের মাঝে জেগে উঠল স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রগাঢ় অভিমান, সেই অভিমান ঘনীভূত হয়ে আমার সর্ব অস্তিত্বে দেখা দিল ভীষণ মৌন বিদ্রোহ হয়ে, বিপ্লব হয়ে। চারিদিকে কেবল ধ্বনি উঠতে লাগল, "সংহার কর! ধ্বংস কর! বিনাশ কর!" কিন্তু শক্তি কোথায় পাই? কোথায়, কোন্ পথে পাব সেই প্রলয়-সুন্দরের, সংহার-সুন্দরের দেখা? আমি বসে চিন্তা করতে লাগলাম। কোথা হতে একজন সাথী এসে বললেন—"ধ্যান কর, দেখতে পাবে।" আমি বললাম, "ধ্যান কি?" তিনি বললেন, "একমাত্র তাঁকে ডাকা ও তাঁর চিন্তা করা।" এই প্রথম এলেন আমার ধ্যান-সুন্দর! মাঝে মাঝে ভালো লাগত, মাঝে মাঝে লাগত না। মাঝে মাঝে ভ্রান্তি, মায়া আমাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাতে লাগল। তারা বলল, "আমরা তোমার প্রলয়-সুন্দরের প্রলয়-শক্তি; আমাদের সাথে পথ চল, তা'হলে স্রষ্টাকে দেখতে পাবে—তা'হলে আমাদের শক্তিতে সংহার করতে পারবে।" আমার যে সহজ সাবলীল আনন্দ-চঞ্চলতা, যৌবনের মদির উন্মাদনা, গান, কবিতা ও সুরের রসমাধুরী ছিল, এদের সাথে পথ চলে যেন সব শুকিয়ে গেল।

আমি আমার প্রলয়-সুন্দরকে প্রাণপণে ডাকতে লাগলাম "পথ দেখাও, তোমার পথ দেখাও।" কে যেন স্বপ্নে এসে বলল, "কোরাণ পড়, বেদান্ত পড়, ওতে যা লেখা আছে, তা পড়লে তোমার প্রলয়-সুন্দরকে—আমারও ঊর্ধ্বে তোমার পূর্ণতাকে দেখতে পাবে।" আমি নমস্কার করে বললাম, "তুমিই কি আমার কবিতায়, লেখায় বিদ্রোহ হয়ে বিপ্লব-বাণী হয়ে আমার কল্পনায়, আমার চেতনায় প্রকাশিত হয়েছিলে?" তিনি আমায় বললেন, "হাঁ, আমি তোমারই পূর্ব-চেতনা, প্রি-কন্‌শাসনেস।" ইংরাজীতে বললেন, বোধ হয় আমি যদি "পূর্ব-চেতনার" অর্থ না বুঝি তাই। আমি বললাম, "আবার তোমার

সাথে দেখা হবে?" তিনি বললেন, "আমি যে নিত্য তোমার মাঝে আছি; আমি যে তোমার বন্ধু!" তিনি চলে গেলেন। সুখ-স্বপ্ন ভেঙে গেল, কিন্তু শিরায় শিরায় অণু পরমাণুতে সেই স্বপ্নের আনন্দ-অমৃতের শিহরণ সর্ব অঙ্গে জড়িয়ে রইল প্রিয়ার পুষ্পমালার মত হয়ে।

গোপনে পড়তে লাগলাম, বেদান্ত, কোরাণ। আমার পৃথিবীর আকাশ যেন কোন বজ্রনাদে ও তড়িত লেখার তলোয়ারে বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি যেন আরো, আরো উর্ধ্বে যেতে লাগলাম। দূর হতে দেখতে পেলাম অপরূপ স্বর্ণ-সুন্দর জ্যোতিঃ। এই আমার স্বর্ণ-জ্যোতিঃ সুন্দরকে প্রথম দেখলাম।

সহসা যেন কোন্ করাল ভয়ঙ্কর শক্তি আমায় নীচের দিকে টানতে লাগল। বলতে লাগল, "তোমার মাতৃ-ঋণ—তোমার স্বদেশের ঋণ শোধ না হতে কোথায় যাবে উন্মাদ?" আমি বললাম, "সাবধান! আমার মাঝে আমার প্রলয়-সুন্দর আছেন।" সেই ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধ শক্তি প্রবলবেগে নিম্নপানে টানতে লাগল! বলল, "সেই প্রলয় সুন্দর তোমার মত অজ্ঞানোন্মাদ নন, তোমার সেই পৃথিবীর ঋণ, ভারতের ঋণ, বাংলার ঋণ মানবরূপী তোমার আত্মার আত্মীয়ের ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ না করে তুমি যেতে পারবে না।" আমি বললাম, "তুমিই কি কোরাণে লিখিত অভিশপ্তশক্তি শয়তান!" সে হেসে বললে, "হ্যাঁ, চিনতে পেরেছ দেখে আনন্দিত হলাম। কোরাণে কি পড় নাই, আমার ঋণ শোধ না করে তুমি স্রষ্টার কাছে যেতে পারবে না, তাঁকে দেখতে পাবে না, আমার বাধাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না।" অনুভব করতে লাগলাম, আমার প্রলয় সুন্দর আর যেন সাহায্য করছেন না। মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে এলাম। এই পৃথিবীর মাটির মায়া আমাকে মায়ের মত প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরলেন, চুম্বন করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন। আমি বিদ্রোহ করে এই বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে সেই ভয়ঙ্কর শক্তি পৃথিবীর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ভীষণ প্রহার করতে লাগলেন। আমার সহধর্মিণী অর্ধাঙ্গিনী শক্তিকে অর্ধ পঙ্গু করে, শয্যাশায়ী করে দিলেন। অর্থ কমিয়ে দিলেন, ভীষণ ঋণ দেনার রজ্জুবন্ধন করে প্রহার করতে লাগলেন।

আমার পৃথিবী এসে আমাকে ধরে আমার জ্বালা জুড়িয়ে দিলেন। এমন সময় এলেন আমার এক না-দেখা বন্ধু। তিনি তাঁর বন্ধু আমার এক বিদ্রোহী বন্ধুর মারফতে আমায় অপরূপ চৈতন্য দিলেন! আমি আবার এই প্রথম

ধরিত্রী-সুন্দর মাকে ভালোবাসলাম, জড়িয়ে ধরলাম। আমার সমস্ত জ্বালা যেন ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল। আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল। আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে, বাংলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম, দৈন্য, দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুরের পীড়নে তিনি জর্জরিতা হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৈত্য দানব রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত বিক্ষত। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বললাম, "আমি ব্রহ্ম চাই না, আল্লাহ চাই না, ভগবান চাই না। এই সব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি নিজে এসে দেখা দেবেন। আমার বিপুল কর্ম আছে, আমার অপার অসীম এই ধরিত্রী মাতার ঋণ আছে। আমার বন্দিনী মাকে অসুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে আবার পূর্ণশ্রী-সুন্দর আনন্দ-সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই, আমার শান্তি নেই।"

ভয়ঙ্কর শক্তি আনন্দে হেসে উঠল। আমি বললাম, "এ তোমার অভিনয়!" সে বলল, "এই আমি প্রথম তোমার কাছে সত্যি করে হাসলাম, অভিনয় করিনি।" চেয়ে দেখি, আমার পানে চেয়ে পৃথিবীর ফুল আনন্দে ঝরে পড়ল। আমি মাটি থেকে তাকে বুকে তুলে বললাম, "কেন তুমি ঝরলে?" ফুল বললে, "আমার মা-লতাকে জিজ্ঞাসা কর, আমার রূপ-রস-সুরভি-মধুকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি যে এই পৃথিবীর সুন্দর মানুষ, তোমার মাঝে আমার সুন্দর আছেন, সেই সুন্দরকে দেখে আমি আনন্দে ঝরে পড়লাম।" আমি ফুলকে চুম্বন করলাম, অধরে বক্ষে কপোলে রেখে আদর করলাম। ফুল বলল, "আমার সুন্দরকে পেয়েছি, আমার এই রূপ-রস-মধু সুরভি নিয়ে তোমার মাঝে নিত্য হয়ে থাকব।" এই আমি প্রথম পুষ্পিত সুন্দরকে দেখলাম। এইরূপে চাঁদের আলো, সকাল সন্ধ্যার অরুণ কিরণ, ঘনশ্যাম-সুন্দর বনানী, তরঙ্গ হিল্লোলিতা ঝর্ণা তটিনী, কুলহারা নীল-ঘন সাগর, দশদিক-বিহারী সমীরণ আমায় জড়িয়ে ধরল। আমার সাথে মধুর ভাষায় বন্ধুর মত সখার মত কথা কইল। আমায় "আমার সুন্দর" বলে ডাকল।

সহসা এল ঊর্ধ্ব গগনে বৈশাখী ঝড়, প্রগাঢ়-নীল কৃষ্ণ মেঘ-মালাকে জড়িয়ে। ঘন ঘন গম্ভীর ডমরু ধ্বনিতে, বহ্নি-বর্ণা দামিনী নাগিনীর ত্বরিত চঞ্চল সঞ্চারণে আমার বাহিরে অন্তরে যেন অপরূপ আনন্দ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। সহসা আমার কণ্ঠে গান হয়ে, সুর হয়ে আবির্ভূত হল—"এলরে প্রলয়ঙ্কর-সুন্দর

বৈশাখী ঝড় মেঘ-মালা জড়ায়ে!" আমি সজল ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলাম, "তুমি কে—কে?" মধুর সহজ কণ্ঠে উত্তর এল, "তোমার প্রলয়-সুন্দর বন্ধু।"

আমি তখন বললাম, "তুমি তো আমায় ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলে, আবার কি জন্য এলে?" সে আমার আত্মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি স্রষ্টাকে সংহার করে, তোমার মাকে সংহার করতে, মাতৃহত্যা করতে চেয়েছিলে, আত্মসংহার করতে চেয়েছিলে। তাই আমি তোমার ত্রিধারী তলোয়ার কেড়ে নিয়ে অভিমানে ফিরে গেছি। তোমার চৈতন্য ফিরে এসেছে, তোমার মাঝেই তোমার স্রষ্টাকে দেখতে পাবে আজ—সৃষ্টিতে, পৃথিবীতে, আকাশে, বাতাসে, রসভরা ফলে, সুরভিত ফুলে, স্নিগ্ধ মৃত্তিকায়, শীতল জলে, সুখদায়ী সমীরণে, তোমার সৃষ্টি-সুন্দরকে প্রকাশ-স্বরূপে দেখেছ। তোমার না-দেখা পরম প্রিয়তম, পরম বন্ধুকে পেতে, বিপুল অসহ তৃষ্ণা, স্বপ্ন, সাধ, কল্পনা, বাধা-না-মানা বেগসহ অসীমের পানে প্রবল প্রবাহ নিয়ে উজান গতিতে ঊর্ধ্বের পানে চলেছিলে, আজ সেই পরম পূর্ণতার, পরম শান্তির, পরম মুক্তির আনন্দ-বাণী নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি তোমার বন্ধু হয়ে। এই পৃথিবীতেই তাঁর সঙ্গে তোমার অপরূপ পূর্ণ মিলন হবে। তার আগে তোমাকে এই অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে হবে, সর্ব অসাম্য, ভেদকে দূর করতে হবে! মানুষ যে তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ; পৃথিবীতে তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তারপর হবে তোমার সুন্দরের সাথে পরম-বিলাস, পরম-বিহার।"

শুনে আমি অপরূপ আনন্দে মাভৈঃ ধ্বনি করে বললাম, "তবে দাও বন্ধু আমায় ত্রিধারী তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষাণ-শিঙ্গা, দাও [illegible]র দৈত্য সংহারী ত্রিশূল ডমরুধ্বনি। দাও আমায় ঝঞ্ঝার জটিল জটা, দাও আমায় বাংলার সুন্দরবনের বাঘাম্বর। দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, দাও আমার জটাজুটে শিশুশশীর স্নিগ্ধ হাসি। দাও আমায় তৃতীয় নয়ন, দাও সেই তৃতীয় নয়নে অসুর দানব সংহারের শক্তি। দাও আমার কণ্ঠে এই পৃথিবীর বিষ, কর আমায় বিষ-সুন্দর নীলকণ্ঠ। দাও আমায় দামিনী তড়িতের কণ্ঠমালা। দাও আমার চরণে নটরাজের বিষম তালের নৃত্যায়িত ছন্দ।"

বন্ধু হেসে বললেন, "সব পাবে, তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নেই! আর কিছুদিন দেরী আছে। তুমি অভিমান করে বিদ্রোহ করে নিজের কি ক্ষতি

করেছ, নিজে কি কখনো চেয়ে দেখেছ? তুমি অরণ্য-কণ্টক-কর্দমাক্ত পথে নিজের সর্বাঙ্গকে ক্ষত-বিক্ষত শক্তিহীন করে ফেলেছ। তোমার এইসব অপূর্ণতা পূর্ণ হোক, তখন তোমার প্রলয-সুন্দর তোমার সর্বদেহে আবির্ভূত হবেন। তোমার সুন্দরকে তুমি লতার মত জড়িয়ে ধরবে, তাঁর না-শোনা বাণী তোমার লেখায় ফুলের মত ঝরে পড়বে।" আমি বললাম, "তথাস্তু।" প্রলয়-সুন্দর বললেন, "সাধু! সাধু! তথাস্তু।"

(দৈনিক নবযুগ। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২)

রাজবন্দীর জবানবন্দী

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

একধারে—রাজার মুকুট ; আরধারে ধূমকেতুর শিখা।

একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড ; আর জন সত্য, হাতে ন্যায়-দণ্ড।

রাজার পক্ষে—রাজার নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজ-কর্মচারী।

আমার পক্ষে—সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অন্তকাল ধরে সত্য—জাগ্রত ভগবান।

আমার বিচারককে কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ মহা-বিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান। এঁর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারীর একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এঁর আইন—ন্যায়, ধর্ম। সে আইন কোনো বিজেতা মানব কোনো বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরি করে নাই। সে আইন বিশ্বমানবের সত্য উপলব্ধি হতে সৃষ্ট। সে আইন সার্বজনীন সত্যের, সে আইন সার্বভৌমিক ভগবানের। রাজার পক্ষে—পরমাণু পরিমাণ খণ্ড-সৃষ্টি ; আমার পক্ষে—আদি অন্তহীন অখণ্ডস্রষ্টা।

রাজার পেছনে—ক্ষুদ্র ; আমার পেছনে—রুদ্র। রাজার পক্ষের যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ ; আমার পক্ষের যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র।

আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজ-বিচারে রাজদ্রোহী হ'তে পারে, কিন্তু ন্যায়-বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হ'তে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্যস্বরূপ।

সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম্-প্রকাশের বীণা, যে বীণায় চির-সত্যের বাণী ধ্বনিত হ'য়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙ্গলেও ভাঙ্গতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙ্গবে কে? একথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছেন—চিরকাল ধ'রে আছে এবং চিরকাল ধ'রে থাকবে। যে আজ সত্যের বাণীকে রুদ্ধ করেছে, সত্যের বাণীকে মূক করতে চাচ্ছে, সে-ও তাঁরই এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রসৃষ্টি অণু। তাঁরই ইঙ্গিতে-আভাসে, ইচ্ছায় সে আজ আছে কাল হয়ত থাকবেনা। নির্বোধ মানুষেব অহঙ্কারের আর অন্ত নাই; সে যাহার সৃষ্টি, তাহাকেই সে বন্দী করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু অহঙ্কার একদিন চোখের জলে ডুব্‌বেই ডুব্‌বে।

যাক্, আমি বল্‌ছিলাম, আমি সত্যপ্রকাশের যন্ত্র। সে যন্ত্রকে অপর কোনো নির্মম শক্তি অবরুদ্ধ করলেও করতে পারে, ধ্বংস করলেও করতে পারে, কিন্তু সে যন্ত্র যিনি বাজান, সে বীণায যিনি রুদ্র বাণী ফোটান, তাঁকে অবরুদ্ধ করবে কে? সে বিধাতাকে বিনাশ করবে কে? আমি মর, কিন্তু আমার বিধাতা অমর। আমি মরব, রাজাও মরবে, কেননা আমার মতন অনেক রাজ-বিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনি অভিযোগ আনযনকারী বহু রাজাও মরেছে,—কিন্তু কোন কালে কোন কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি—তার বাণী মরেনি। সে আজও তেমনি করে নিজেকে প্রকাশ কবছে এবং চিরকাল ধরে করবে। আমার এই শাসন-নিরুদ্ধ বাণী আবাব অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশী কেড়ে নিলেই বাঁশীর সুরের মৃত্যু হবে না; কেননা আমি আর এক বাঁশী নিযে বা তৈরি করে তাতে সেই সুর ফুটাতে পারি। সুর আমার বাঁশীতে নয, সুর আমার মনে এবং আমাব বাঁশী সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশীতে নয়, সুরেরও নয; দোষ আমার, যে বাজায়; তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয, আমার বীণারও নয়; দোষ তাঁর—যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমি নই। প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণা-বাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দিবার মত রাজ-শক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই। তাঁকে বন্দী করবার মত পুলিস কারাগার আজো সৃষ্টি হয় নাই।

রাজার নিযুক্ত রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ

করেছে, তাঁর প্রাণকে অনুবাদ করেনি, তাঁর সত্যকে অনুবাদ করতে পারেনি। তার অনুবাদে রাজানুগত্য ফুটে উঠেছে, কেননা, তার উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করা, আর আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেননা, আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য-বারি, ভগবানের আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।

আমি জানি এবং দেখেছি—আজ এই আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় একা আমি দাঁড়িয়ে নেই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্য-সুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজ-নিযুক্ত বিচারক সত্য বিচারক হ'তে পারে না। এমনি বিচার প্রহসন ক'রে যেদিন খৃস্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হ'ল, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হ'ল, সেদিনও ভগবান এমনি নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পশ্চাতে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি, তার আর ভগবানের মধ্যে তখন সম্রাট দাঁড়িয়েছিলেন, সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হ'য়ে গেছল। নৈলে সে তার ঐ বিচারাসনে ভয়ে বিস্ময়ে থরথর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ত, নীল হয়ে যেত, তার বিচারাসন-সমেত সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

বিচারক জানে আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু তবু হয়ত সে শাস্তি দেবে। কেনন সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজ-ভৃত্য।

তবু জিজ্ঞাসা করছি,—এই যে বিচারাসন, এ কার? রাজার না ধর্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে, ভগবানকে? এই বিচারককে কে পুরস্কৃত করে?—রাজা, না—ভগবান?—অর্থ, না—আত্ম-প্রসাদ?

শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার—বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলা শেষের শেষ খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত-উষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে; তাকে ডাকৃছে মরণ, আমায় ডাকছে

জীবন ; তাই আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়-তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না। না, আবার বাজে কথা বললাম।

আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসিবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো—একি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়ত সত্য উদাসীন ছিল ব'লে! কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত আত্মা-মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায় শাসন-ক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি আজ রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না—এ আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয় হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আর্ত পীড়িত আত্মার যন্ত্রণা-চীৎকার! আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না! হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারা বাণীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।

আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংলণ্ডই ভারতের অধীন হত এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংলণ্ডের অধিবাসিবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মত অধীর হয়ে উঠত আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আ-.র মতই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়ে এই বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থে নীত হতেন তাহলে সে সময় এই বিচারক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমি তো তাই এবং তেমনি করেই বলছি।

আমি পরম আত্ম-বিশ্বাসী। আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি,—কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই,—আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারীর তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে—তার জন্য ঘরে বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লাভ লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই,

নিজের সাধনলব্ধ আত্ম-প্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার অহঙ্কার নয়, আত্ম-উপলব্ধির, আত্ম-বিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি। আমি অন্ধ-বিশ্বাসে, লাভের লোভে, বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না। অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না। তা হলে যে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ করে যাবে। আমার এই দেহ-মন্দির জাগ্রত দেবতার আসন বলেই তো লোকে এ মন্দিরকে পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ শূন্য মন্দিরের আর থাকবে কি? একে শুধাবে কে? তাই আমার কণ্ঠে কালভৈরবের প্রলয়-তূর্য বেজে উঠেছিল, আমার হাতে ধূমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল, সে সর্বনাশা নিশান-পুচ্ছে মন্দিরের দেবতা নট-নারায়ণরূপ ধ'রে ধ্বংস-নাচন নেচেছিলেন। এ ধ্বংস-নৃত্য নব সৃষ্টির পূর্বসূচনা। তাই আমি নির্মম নির্ভীক উন্নত শিরে সে নিশান ধরেছিলাম, তাঁর তূর্য বাজিয়েছিলাম। অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত-আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্য রক্ষার, ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব-প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যাম শ্মশানের মায়ানিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্য-বাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তিনি জানতেন, প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজবে, তাই আমি এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে ক'রে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। কারাগার মুক্ত হয়ে আমি আবার যখন আঘাত চিহ্নিত বুকে, লাঞ্ছনা-রক্ত ললাটে, তাঁর মরণবাঁচা চরণমূলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব, তখন তাঁর সকরুণ প্রসাদ চাওয়ার মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবনী আমায় শ্রান্ত, আমায় সঞ্জীবিত, অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সেদিন নতুন আদেশ মাথায় ক'রে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আমি আবার তাঁর তরবারি-ছায়াতলে গিয়ে দণ্ডায়মান হব। সেই আজো-না-আসা রক্ত ঊষার আশা, আনন্দ, আমার কারাবাসকে—অমৃতের পুত্র আমি, হাসি গানের কলোচ্ছ্বাসে স্বর্গ ক'রে তুলবে। চিরশিশু-প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশ-মণি দিয়ে নির্যাতিত লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন। আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই;

কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি মশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। অতএব, মাভৈঃ! ভয় নাই।

কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার-শান্ত কোল এ অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে। পরাধীনা অনাথিনী জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কিনা জানি না, যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব।

আবার বলছি, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমি অমৃতস্য পুত্রঃ। আমি জানি—

ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয়;
সেই সত্য আমার ভাগ্য বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।

কাজী নজরুল ইসলাম
প্রেসিডেন্সি-জেল; কলিকাতা
৭ই জানুয়ারী, ১৯২৩
রবিবার—দুপুর।

কবির দুটি চিঠি

[বেগম শামসুন নাহার মাহমুদকে লিখিত]

কাল রাত্তিরে ফিরেছি কলকাতা হ'তে। মনে করেছিলাম কলকাতা গিয়েই তোমার চিঠির উত্তর দেবো। কিন্তু কলকাতার কোলাহলের মধ্যে এমনি বিস্মৃত হয়েছিলাম নিজেকে যে কিছুতেই উত্তর দেবার অবসর ক'রে নিতে পারিনি। তা'ছাড়া ভাই তুমি এত কথা জানতে চেয়েছ, শুনতে চেয়েছ যে, কলকাতার হট্টগোলের মধ্যে সে বলা যেন কিছুতেই আসত না। আমার বাণী হট্টগোলকে এখন রীতিমত ভয় করে, মূক হয়ে যায় ভীরু বাণী আমার ঐ কোলাহলের অনবকাশের মাঝে। কী যে করেছ তোমরা সকলে—এসে যেন মনে হচ্ছে যেন কোথায় কোন নিকটতম আত্মীয়কে আমি ছেড়ে এসেছি। মনে সদা-সর্বদাই একটা বেদনার উদ্বেগ লেগেই রয়েছে।

অদ্ভুত রহস্যভরা এই মানুষের মন। রক্তের সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই যার, সেই কখন পথের সম্বন্ধকে সকল হৃদয় দিয়ে অসঙ্কোচে স্বীকার ক'রে নেয়। ঘরের সম্বন্ধটা রক্ত-মাংসের দেহের, কিন্তু পথের সম্বন্ধটা হৃদয়ের—অন্তরতম জনার। তাই ঘরের যারা, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি, মেনে চলি; কিন্তু বাইরের আপনার জনকে ভালবাসি, তাকে না-মানার দুঃখ দিই। ঘরের টান কর্তব্যের, বাইরের টান প্রীতির—মাধুর্যের। সকল মানুষেব মনে সকল কালে এই বাধন-হারা মানুষটি ঘরের আঙ্গিনা পেরিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছে। যে নীড়ে জন্মেছে এই পলাতক, সেই নীড়কে সে অস্বীকার করেছে সর্বপ্রথম, উড়তে শিখেই। আকাশ-আলো-কানন-ফুল—এমনি-সব না-চেনা জনেরা হয়ে ওঠে তার অন্তরতম। বিশেষ করে গানের পাখী যারা তারা চিরকাল নিরুদ্দেশ দেশের পথিক। কোকিল বাসা বাঁধে না, "বউ কথা কও"-এর বাসার উদ্দেশ আজও মিলল না; "উহু উহু চোখ গেল" পাখীর নীড়ের সন্ধান কেউ পেল না! ওদের আসা-যাওয়া একটা রহস্যের মত। ওরা যেন স্বর্গের পাখী, ওদের যেন

পা নেই। ধূলার পৃথিবীতে ওরা যেন বসবে না, ওরা যেন ভেসে আসা গান। তাই ওরা অজানা ব্যথার আনন্দে পাগল হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে দেশে বিদেশে,—বসন্ত-আসা বনে, ফুল-ফোটা কাননে, গন্ধ-উদাস মনে! ওরা যেন স্বর্গের প্রতিধ্বনি—টুক্‌রা আনন্দের উল্কাপিণ্ড! সমাজ এদের নিন্দা করেছে, নীতিবাগীশ বায়স তার কুৎসিত দেহ ততোধিক তার কুৎসিত কণ্ঠ নিয়ে এর ঘোর প্রতিবাদ করেছে, এদের শিশুদের ঠুকরে "নিকালো হিঁয়াসে" বলে তাড়িয়েছে, তবু আনন্দ দিয়েছে গান দিয়েছে এই ঘর-না-জানা পতিতের দলই! নীড় বাঁধা সামাজিক পাখীগুলো দিতে পারলে না আনন্দ, আনতে পারলে না স্বর্গের আভাস, সুরলোকের গান।......এতটা বললাম কেন, জান? তোমাদের পেয়েছি, এই আনন্দটাই আমায় এই কথা কওয়াচ্ছে, গান গাওয়াচ্ছে। বাইরের পাওয়া নয়, অন্তরের পাওয়া। গানের পাখী গান গায় খাবার পেয়ে নয়, ফুল আলো পেয়ে সে গান গেয়ে ওঠে। মুকুল-আসা কুসুম-ফোটা বসন্তই পাখীকে গান গাওয়ায়—ফল-পাকা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে নয়। তখনও পাখী হয়ত গায় কিন্তু ফুল যে সে ফুটতে দেখেছিল, গন্ধ যে তার পেয়েছিল, গায় সে সেই আনন্দে, ফল পাকার লোলুপতায় নয়। ফুল ফুটলে পায় গান কিন্তু ফল পাকলে পায় ক্ষিদে।

আমি পরিচয় করার অনন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি মানুষের মাঝে। কিন্তু ফুলফোটা মন মেলে না ভাই; মেলে শুধু ফলপাকার ক্ষুধাতুর মন। তোমাদের মধ্যে সেই ফুলফুটানো বসন্ত, গান জাগানো আলো দেখেছি ব'লেই আমার এত আনন্দ, এত প্রকাশের ব্যাকুলতা। তোমাদের সাথে পরিচয় আমার কোন প্রকার স্বার্থের নয় কোনো দাবীর নয়। ঢিল মেরে ফল পাড়ার অভ্যাস আমার ছেলেবেলায় ছিল—যখন ছিলাম ডাকাত, এখন আর নেই। ফুল যদি কোথাও ফোটে, আলো যদি কোথাও হাসে, সেখানে আমার গান-গাওয়ায় পায়, গান গাই। সেই আলো, সেই ফুল পেয়েছিলাম এবার চট্টলায়, তাই গেয়েছি গান। ওর মাঝে শিশিরের করুণা যেটুকু, বর্ষণের কান্না যেটুকু, সেটুকু আমার—আর কারুর নয়। থাক, কাজের কথাগুলো ব'লে নিই আগে।

আমায় এখনো ধরেনি, তার প্রমাণ এই চিঠি। তবে আমি ধরা দেওয়ার দিকে হয়ত এগোচ্ছি, ধরা পড়া আর ধরা দেওয়া এক নয়, তা বোধ হয় বোঝ। ধরা দিতে চাচ্ছি—নিজেই এগিয়ে চলেছি শত্রুর শিবিরের দিকে। ...এর

রহস্য হয়ত বলতে পারি। এখন বলব না। অত বিপুল যে সমুদ্র, তারও জোয়ার-ভাটা আসে অহোরাত্রি। এই জোয়ার-ভাটা সমুদ্রেই খেলে, আর তার কাছাকাছি নদীতে; বাঁধা-বাঁধা ডোবায় পুকুরে জোয়ার-ভাটা খেলেনা। মানুষের মন সমুদ্রের চেয়েও বিপুলতর, খেলবে না তাতে জোয়ার-ভাটা! যদি না খেলে, তবে তা মানুষের মন নয়। ঐ শান-বাঁধানো ঘাটভরা পুকুরগুলোতে কাপড় কাচা চলে, ইচ্ছে হলে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরাও চলে, চলে না ওতে জাহাজ, দোলেনা ওতে তরঙ্গ দোল, খেলেনা ওতে জোয়ার-ভাটা।...আমি একবার অন্তরের পানে ফিরে চল্‌তে চাই, যেখানে আমার গোপন সৃষ্টিকুঞ্জ,—যেখানে আমার অনন্ত দিনের বধূ আমার জন্যে ব'সে ব'সে মালা গাঁথছে। যেমন সিন্ধু চলে ভাটিয়ালী টানে, তেমনি করে ফিরে যেতে চাই, গান-শ্রান্ত, ওড়া-ক্লান্ত আমি। আবার অকাজের কথা এসে পড়লো। পুষ্পপাগল বলে কাজের কথা আসে না। গানের কথাই আসে।...তোমরা আমার উচিত আদর করতে পারনি লিখেছো—অতটা হিসেব-নিকেস করবার অবকাশ আমার নেই। আমি থাকি আমার মন নিয়ে আপনি বিভোর। মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে বলতেও যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ি। খেই হারিয়ে ফেলি কথার। আমার গোপনতম কে যেন একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে আদেশ করে।—আর অর্থ-সামর্থ্যের কথা। অর্থ দিয়ে মাড়োয়ারীকে, জমিদার মহাজনকে বা ভিখারীকে হয়তো খুশী করা যায়, কবিকে খুশী করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতাটা পড়েছো? ওতে এই কথাই আছে—কবি রাজদরবারে গিয়ে রাজাকে মুগ্ধ করে রাজপ্রদত্ত মণিমাণিক্যের বদলে চাইলে রাজার গলার মালাখানি। কবি লক্ষ্মী-পেঁচার আরাধনা কোনো কালে করেনি, সরস্বতীর শতদলেরই আরাধনা করেছে—তার নাম-গন্ধে বিভোর হয়ে শুধু গুন্ গুন্ করে গান করেছে আর করেছে। লক্ষ্মীর ঝাঁপির কড়ি দিয়ে কবিকে বন্দনা করলে কবি তাতে অখুশী হয়ে ওঠে। কবিকে খুশী করতে হয় অমূল্য ফুলের সওগাত দিয়ে। সে সওগাত দিয়েছো তোমরা আমায় অঞ্জলি পু'রে। কবি চায় না দান, কবি চায় অঞ্জলি—কবি চায় প্রীতি, কবি চায় পূজা, কবিত্ব আর দেবত্ব এখানে এক। কবি আর দেবতা সুন্দরের প্রকাশ। সুন্দরকে স্বীকার করতে হয় যা' সুন্দর তা' দিয়ে! রূপার দাম আছে বলেই তো হাট বাজারে মুদির কাছে ওজন হ'তে হ'তে ওর প্রাণান্ত ঘটলো; রূপের দাম নেই বলেই রূপ এত দুর্মূল্য, রূপ

এত সুন্দর, এত পূজার! রূপা কিনতে হয় রূপেয়া দিয়ে, রূপ কিনতে হয় হৃদয় দিয়ে। রূপের হাটের বেচা-কেনা বড় অদ্ভুত। যে যত অমনি—যে যত বিনাদামে কিনে নিতে পারে, সে তত বড় রূপ-রসিক সেখানে। কবিকে সম্মান দিতে পারনি বলে মনে যদি করেই থাক, তবে তা' মুছে ফেল। কোকিল-পাপিয়াকে বাড়ীতে ডেকে ঘটা করে খাওয়াতে পারনি বলে তারা তো অনুযোগ করেনি কোনদিন। সেকথা ভাবেওনি কোনদিন তারা। তারা তাই বলে তোমার বাতায়নেব পাশে গান গাওযা বন্ধ করেনি। তা'ছাড়া কবিকে হয়তো সম্মান করা যায না—কাব্যকে সম্মান করা যায়। "উপদেশ" আমি তোমায় দিই নি, যদি দিযে থাকি ভুলে যেও। উপদেশ দেওযার চাণক্য আমি নই; 'দয়েছি তোমাদের অনাগত বিপুল সম্ভাবনাকে মনের অঞ্জলি। তোমাদের অপ্রকাশ সুন্দরকে প্রকাশ-আলোতে আশাব আহ্বান জানিয়েছি শঙ্খধ্বনি করে। উপদেশের ঢিল ছুড়ে তোমাদের মনের পাখীকে উড়িয়ে দেওয়ার নির্মমতা আমার নেই, এ ধ্রুব জেন। আমি ফুল-ঝরা দিযে হাসাই, শাখার মার দিযে কাঁদাই নে।

তোমায় লিখ্তে বলেছি, আজো বলছি লিখ্তে। বললেই যে লেখা যায় তা' নয। কারুর বলা যদি আনন্দ দেয, তবে সেই আনন্দের বেগে সৃষ্টি হযতো সম্ভব হযে ওঠে। তোমরা আমায় বলছো লিখতে, সে বলায আমায় আনন্দ দিয়েছে। তাই সৃষ্টির বেদনাও জেগেছে অন্তরে। তোমাদের আলোর পরশে শিশির-ছোযায আমার মনের কুঁড়ি বিকচ হ'যে উঠেছে, তাই চট্টগ্রামে লিখেছি। নইলে তোমরা বললেই লেখা আসতো না। তোমার মনে সুন্দর যিনি, তিনি যদি খুশী হযে ওঠেন তাহলে সেই খুশীই তোমায লিখতে বসাবে। আমার বলা তোমার সেই মনের সুন্দরকে অঞ্জলি দেওযা। বলেছি, অঞ্জলি দিযেছি। তিনি খুশী হয়ে উঠেছেন কিনা, তুমি জান। তুমি আজো অনেকখানি বালিকা। তারুণ্যের যে উচ্ছ্বাস, যে আনন্দ, সেই বাধা তোমার জীবনে আসার এখনো অনেক দেরী। তাই সৃষ্টি তোমার আজো উপস্থিত হয়ে উঠলো না। তার জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য অর্জন করো। তরুর শাখায় আঘাত করলে সে ফুল দেবে না। যখন দেবে সে আপনি দেবে। আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী, কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে—কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবীতে। ঘরের প্রয়োজন

তাদের বন্দী করে রেখেছে। এত বিপুল বাহির যাদেরে চায়, তাদেরে ঘিরে রেখেছে যার হাত লম্বা আট হাত চওড়া দেওয়াল। বাহিরের আঘাত এ-দেওয়ালে বারে বারে প্রতিহত হয়ে ফিরল, এর বুঝি ভাঙন নেই অন্তর হতে মার না খেলে। তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি। তারা ভিতর হতে দ্বার চেপে ধরে বলছে—আমরা বন্দিনী। দ্বার খোলার দুঃসাহসিক আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগদেবতা।

দ্বার ভাঙার পরুষতা নারীদের প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের দ্বার ভিতর হ'তে বন্ধ, বাহির হতে নয়। তুমি যে কি হবে বলতে পারিনে। তার কারণ তোমায় চিনলেই তো চলবে না, তোমায় চালাবার দাবী নিয়ে জন্মেছেন যাঁরা, তাঁদের চিনিনি। আলোর মত শিশিরের মত আমি অন্তরের দলগুলি খুলে দিতে পারি হয়ত, দ্বারের অর্গল খুলি কি করে? আমি তোমাকে দেখেছি এবং দেখতে চাই লেখার মধ্য দিয়ে। সেই হ'ল সত্যিকারের দেখা। মানুষ দেখার কৌতূহল আমার নাই। স্রষ্টা দেখার সাধনা আমার, সুন্দরকে দেখার তপস্যা আমার।··· সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাকে যে দেখেছে সেই বড দেখা দেখেছে। এ দেখা আর্টিস্টের দেখা, ধেযানীব দেখা, তপস্বীর দেখা। আমার সাধনা অরূপের সাধনা। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে যে রাজকুমারী বান্দনী, সেই রূপকথার অরূপাকে মায়ানিদ্রা হতে জাগাবার দুঃসাহসী রাজকুমার আমি, আমি সোনার কাঠির সন্ধান জানি—যে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বন্দিনী উঠবে জেগে, রূপার কাঠির মায়া-নিদ্রা যাবে টুটে, আসবে তার আনন্দের মুক্তি। যে চোখের জল তলায় আটকে আছে, তাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যথা-হানা আমি। মানস সরোবরের জলধারাকে শঙ্খধ্বনি করে নিয়ে চলেছি কবি আমি ভগীরথের মত। আমার পনের আনা রয়েছে স্বপ্ন বিভোর; সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ, আমার এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সঙ্ঘ। নদীর জল চলেছে সমুদ্রের সাথে মিলতে, দু'ধারে গ্রাম সৃষ্টি করতে নয়। যেটুকু জল তার ব্যয় হচ্ছে দুধারের গ্রামবাসীদের জন্য তা তার একআনা। বাকী পনের আনা গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে। আমার পনের আনা চলেছে আর চলেছে সৃষ্টির দিন হ'তে—আমার সুন্দরের উদ্দেশ্যে। আমার যত বলা আমার সেই বিপুলতরকে নিয়ে—আমার সেই প্রিয়তম সেই সুন্দরতমকে নিয়ে।

তোমাকেও বলি, তোমার তপস্যা যেন তোমার সুন্দরকে নিয়েই থাকে মগ্ন,

তোমার চলা তোমার বলা যেন হয় তোমার সুন্দরের উদ্দেশে, তাহলে তোমায় প্রয়োজনের বাঁধ দিয়ে কেউ বাঁধতে পারবে না। তোমার অন্তরতমকে ধ্যান করো তোমার বলা দিয়ে। বাধা যেন তোমার ভিতর দিক থেকে জমা না হয়ে ওঠে। এক কাজ করতে পার? বল্‌তে পার কী তোমার সাধনা, কী তোমার ব্রত—এই কথা। তাহলে তোমার গতির উদ্দেশ পাব আর সেই রকম করে তোমার গড়ে উঠবার ইশারা দিতে পারবো।

বড় বড় কবির কাব্য পড়া এই জন্য দরকার যে তাতে কল্পনার জট খুলে যায়। চিন্তার বদ্ধধারা মুক্তি পায় ও মনের মাঝে প্রকাশ করতে না পারায় যে উদ্বেগ তা সহজ হয়ে ওঠে। মাটির মাঝে যে পত্রপুষ্পের সম্ভাবনা তা বর্ষণের অপেক্ষা রাখে বলে তার সৃষ্টির বেদনা মনের মধ্যে গুমরে মরে।

আমার কাছে দামী কথা শুনতে চেয়েছ। দামী কথার জুয়েলার আমি নই। আমি ফুলের বেসাতী করি। কবি বাণীর কমলা-বনের বনমালী। সে মালা গাঁথে, সে মণি-মাণিক্য বিক্রী করে না। কবি কথাকে দামী করতে পারে না, সুন্দর করতে "বউ কথা কও" যে কথা কয়, কোকিল যে কথা কয় তার দাম এক কানা কড়িও নয়। এরা দামী কথা বলতে জানে না। ওদের কথা—শুধু গান, তাই বুদ্ধিমান লোক তোতা পাখী পোষে, ওরা ওদেরে রোজ রাধা-কেষ্ট বুলি শোনায়। আমরা যা বলি, তার মানে নেই, দামও নেই। তোমায় বুদ্ধিমান লোকের দলের জানিনে বলেই এত বকে যাচ্ছি।

আমার জীবনের ছোটখাট কথা জানতে চেয়েছ। বড় মুস্কিল কথা ভাই। আমার জীবনের যে বেদনা, যে রং, তা আমার লেখায় পাবে। অবশ্য লেখার ঘটনাগুলো আমার জীবনের নয়, লেখার রহস্যটুকু আমার, ওর বেদনাটুকু আমার। ঐখানেই তো আমার সত্যিকার জীবনী লেখা রয়ে গেল। জীবনের ঘটনা দিয়ে কৌতুক অনুভব করতে পার। কিন্তু তা দিয়ে আমায় চিনতে পারবে না। সূর্যের কিরণ আসলে সাতটা রং—রামধনুতে যে রং প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সূর্য যখন ঘোরে তখন তাকে দেখি আমরা শুভ্র জ্যোতির্ময়রূপে। সূর্যের চলাটা প্রতারণা করে আমাদের চোখকে—তার বুকের রং দেখতে দেয় না সে। কিন্তু ইন্দ্রধনু যখন দেখি, ওতেই দেখতে পাই ওর গোপন প্রাণের রং—ইন্দ্রধনু যেন সূর্যের লেখা কাব্য। মানুষের জীবনই মানুষকে সবচেয়ে প্রতারণা করে। রাধা ভালবেসেছিল কৃষ্ণকে নয়—কৃষ্ণের বাঁশীকে। তোমরাও ঠিক

ভালবাসো আমাকে নয়—আমার সুরকে, আমার কাব্যকে। সে তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। আবার আমায় নিয়ে কেন টানাটানি ভাই? সূর্যের কিরূপ আলো দেয়, কিন্তু সূর্য নিজে দগ্ধে দিবানিশি, ওর কাছে যেতে যে চায়—সেও হয় দগ্ধভূত। আলো সওয়া যায়, শিখা সওয়া যায় না। আমি জ্বলছি শিখার মত, আপনার আনন্দে আপনি জ্বলছি—কাছে এসে তা দেয় দাহ, দূর হতে তা দেয় আলো। তোমাদের কাছে দিলাম যে-আমি, সেই-আমি আর চিঠির আমি কি এক? তোমরা কবিকে জানতে চাও, না নজরুল ইসলামকে জানতে চাও—তা আগে জানিও। তা হলে আমি এর পরের চিঠিতে একটু একটু করে জানাব তার কথা। চাঁদ জোছনা দেয়, কথা কয়না, চকোর-চকোরীর সাধ্য-সাধনাতেও নয়। বাঁশী কাঁদে, যখন গুণীর মুখে তার মুখে চুমোচুমি হয়। বাকী সময়টুকু সে এক কোণে নির্বাক নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকে। একই ঝড়ের বাঁশী। বীণা কত কাঁদে, কথা কয় গুণীর কোলে শুয়ে, বাকী সময়টুকু তার খোলের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে সে নিস্পন্দিত হয়ে থাকে। গানের পাখী তাকেই গানের কথাদি জিজ্ঞাসা কর। নীড়ের কথা জিজ্ঞাসা করো না। নিজেই বলতে পারবে না সে, কোথায় ছিল তার নীড়। জন্ম নিয়ে গান শিখে উড়ে যাবার পর নীড়টার মত অপ্রয়োজনীয় জিনিষ আর তার কাছে কিছুই নেই। নীড়ের পাখী তখন বনের পাখী হয়ে ওঠে। গুরুদেব বলেছেন, ফসল কেটে নেবার পর মাঠটার মত অপ্রয়োজনীয় জিনিষ আর নাই। তবু সেই অপ্রয়োজনের যদি প্রয়োজন অনুভব করে তোমাদের কৌতুক, জানিও।

চিঠি লিখছি আর গান গাইছি একটা নতুন শেখা গানের দু'টো চরণ :

“হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।
কোন্ অমরার বিরহিনীরে, চাহনি ফিরে?
কোন্ বিষাদের শিশির-নীরে এলে নাহিয়া।”

কবির আসা ঐ ঝরা শেফালির পথ বেয়ে আসা। কোন্ বিষাদের শিশির-জলে নেয়ে আসে সে, তা সে জানে না, তার নিজের কাছেই সে এমনি বিপুল রহস্য।

আমার লেখা কবিতাগুলো চেয়েছ। হাসি পাচ্ছে খুব কিন্তু। কী ছেলেমানুষ তোমরা? যে খোন্তা দিয়ে মাটি খোঁড়ে মালী, সেটারও যে দরকার

পড়ে ফুল বিলাসিনীর, এ আমার জানা ছিল না। যে পাতার কোলে ফুল ফোটে, সে পাতা কেউ চায় এ আমি জানতাম না। মালা গাঁথা হ'বার পরে ফুল-রাখা পদ্ম-পাতাটার কোনো দরকার থাকে, এও একটা খুব মজার কথা। না থাক, চেয়েছ—দেবো। তবে এ পল্লব শুকিয়ে উঠবে দুদিন পরে, থাকবে যা তা ফুলের গন্ধ। তাছাড়া অত কবিতাই বা লিখব কোত্থেকে, যে, খাতা ভর্তি করে দেবো। সমস্ত তো সব সময় আসেনা। শাখার রিক্ততাকে যে ধিক্কার দেয়, সে অসহিষ্ণু; ফুল ফোটার জন্য অপেক্ষা করতে জানে যে, সে-ই ফুল পায়। যে অসহিষ্ণু হয়ে চলে যায়, সে কোথাও পায়না ফুল। তার ডালা চির শূন্য রয়ে যায়। তোমাদের ছায়া-ডাকা পাখী-ডাকা দেশ, তোমাদের সিন্ধু-পর্বত গিরি-নদী-বন আমায় গান গাইয়েছিল। রূপের দেশ ছাড়িয়ে এসেছি এখন রূপেয়ার দেশে, এখানে কি গান জাগে? কমল বনের বীণাপাণি ঢুকেছেন এখানের মাড়োওয়ারী মহলে। ছাড়া যেদিন পাবেন, আসবেন তিনি আমার হৃদ-কমলে। সেদিনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই আমার।

আমার কবিতার উৎস-মুখের সন্ধান চেয়েছ। তার সন্ধান যতটুকু জানি নিজে, দেখিয়ে দেব।

আর কিছু লেখার অবসর নেই আজ। মানস-কমলের গন্ধ পাচ্ছি যেন, কেমন যেন নেশা করছে—বোধহয় বীণাপাণি তাঁর চরণ রেখেছেন এসে আমার অন্তর শতদলে।

ইতি

—তোমার নুরুদা

(২)

(জেহাদ-সম্পাদককে লিখিত)

কলিকাতা

১১।১২।৪০

প্রীতিভাজনেষু,

আমার মন্ত্র—"ইয়াকানা' বুদু ওয়া ইয়াকানাস্তাইন।" কেবল এক আল্লাহর আমি দাস, অন্য কারুর দাসত্ব আমি স্বীকার করি না, একমাত্র তাঁরই কাছে শক্তি ভিক্ষা করি। আমি ফকির, আল্লাহর দরবারে আজ আমি পরম ভিক্ষু,

যদি তাঁর কাছে রহমত ও শক্তি ভিক্ষা পাই, ইন-শা-আল্লাহ্ শুধু ভারত কেন, সারা দুনিয়ায় সত্যের ডঙ্কা বেজে উঠবে—তৌহীদের পরম অদ্বৈতবাদের অমৃতবন্যা বয়ে যাবে। এই অদ্বৈতবাদেই সারা বিশ্বের মানব এসে মিলিত হবে। আমায় আপনারা ভাব-বিলাসী স্বপ্নচারী কবি মনে করতে পারেন, কিন্তু যুগে যুগে স্বপ্নচারীরাই উর্ধ্বতম জগৎ থেকে আল্লাহর আরশ-কুর্সী, লওহ্-কলম থেকে শক্তি, সাহস, বাণী, অমৃত, শক্তি আনয়ন করেছে। এই সত্যস্রষ্টা স্বপ্নপথের পথিকরাই দারিদ্র্য-দুঃখ-শোক-ব্যাধি-উৎপীড়ন জর্জরিত মানবকে আনন্দের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে গেছেন—ইমাম হয়ে—অগ্রপথিক হয়ে। আপনাদের মধ্যে যে মহাশক্তি আজ প্রকাশের জন্য ব্যাকুল আবেগে সকল বন্ধ দুয়ার ভাঙতে চাচ্ছে, আমি নকীব হয়ে সেই শক্তিকেই আবাহন করছি। ঐ শক্তিরই খাদেম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। কত কামাল আপনাদের মাঝে লুকিয়ে আছেন, তা আপনারা জানেন না, কিন্তু আল্লাহ্ আমায় তাঁদের স্বরূপ দেখিয়েছেন। সর্বশক্তিদাতা আল্লাহের কাছে মোনাজাত করুন যেন আমার প্রতীক্ষার অন্ধকার রাত্রি নবযুগের সুবহ্-সাদেকের অরুণালোকে আশু রঞ্জিত হয়ে ওঠে। এই প্রতীক্ষার শেষ মুহূর্ত আমরা কলরব করলেই শেষ হবেনা। কৃষক বীজ বপন করে জমিতে গাছ উদ্‌গত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে, জমিতে লাঠি মেরে গাছ উদ্‌গত করার চেষ্টা করেনা। তবে আপনাদের এই উৎসাহ ও আগ্রহ যদি ঈদ-মুবারকের শুভদিনের শেষ রাত্রির আনন্দ-কলরব হয়, তবে তাকে আমি অভিনন্দিত করি—আমার সালাম জানাই। আল্লাহ্ আপনাদের 'সেরাতল মুস্তাকিম' সুদৃঢ় সরল পথে পরিচালিত করুন। যে অনাগত মুজাহেদীনের জন্য আল্লাহর ফেরদৌস-আলা আজও শূন্য রয়েছে, তার পবিত্র বক্ষ পূর্ণ করার জন্য আল্লাহর আহ্বান নেমে আসুক আপনাদের অন্তরে—দেহে, আত্মায়। আল্লাহু আকবর!

আপনাদের ভাই

নজরুল ইসলাম

নজরুল সঙ্গীতের রেকর্ড তালিকা

(নজরুল রচিত গানের প্রথম পঙক্তি অনুসারে)।

হিন্দুস্থান

উমাপদ ভট্টাচার্য

এচ ৭	কুঁচবরণ কন্যারে মেঘবরণ কেশ
	মদির আঁখির সুধায় থাকি

বিনয় গোস্বামী

এচ ১১৭৯৭	হলুদ গাঁদার ফুল
	বিলিয়ে দেরে সকল পুঁজি

কুমার শচীন দেববর্মন

এচ ৮৫৭	কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া
	মেঘলা নিশি ভোরে
এচ ৯৯৬	চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে
	পদ্মার ঢেউ রে

সুপ্রভা সরকার

এচ ৮৬৭	কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা
	প্রথম মনের মুকুল
এচ ৯০১	শ্যামমুখ আর না হেরব
	নওল শ্যাম তনু

বিজনকুমার বসু

এচ ১০০৯ { যাও মেঘদূত
নিশি নিঝুম

গৌরী বসু

এচ ৯৪৭ { সখী বল কোন দেশে
বঁধু ফিরে এসো

সুশীল চট্টোপাধ্যায়

এচ ১০২০ { আমার কথা লুকিয়ে
তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী

কালীপদ সেন

এচ ৮৯০ { মহুয়া বনের ধারে
বনের ওপারে ঘন

এচ ৯৭১ { এস ঠাকুর মহুয়া বনে
ওরে গো রাখা রাখাল

কালীপদ সেন ও শান্তা বসু

এচ ৯৪৮ { কুসুর নদীর ধারে
ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে

রেণুকা দাসগুপ্তা

এচ ৯৫৮ { শুকসারী সম তনু মন মম
কোন রস যমুনারি কূলে

নিউ থিয়েটার্স রেকর্ডে 'দিকশূলে'র গান

এচ ১০৪৭ { ফুরাবে না মোর মালা গাথা
সরযূর গান

কলম্বিয়া

গিরিন চক্রবর্তী

জি. ই ৭৫০৬ — শিকল পরা ছল / কারার ঐ লৌহকপাট

তারা ভট্টাচার্য

জি. ই ৭৭৪৭ — মাতৃনামের হোমের শিখা / শ্যামানামের ভেলায় চড়ে

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

জি. ই ৭৮২৪ — আর অনুনয় করিবে না কেউ / আমি আছি বলে দুখ পাও

গৌরীকেদার ভট্টাচার্য প্রভৃতি

জি. ই ৭৮৩২ — আমরা শক্তি আমরা বল / চল্ চল্ চল্

জি. ই ৭১৫৬ — বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ / (অন্য কবির গান)

পান্নালাল ভট্টাচার্য

জি. ই ২৫০১৮ — আর লুকাবি কোথায় মা কালী / কালো মেয়ের পায়ের তলায়

সেনোলা

গীতা মিত্র

কিউ. এস ৪৬৫ — বেণুকা ও কে বাজায় মহুয়া বনে / দোলন চাঁপা ব... দালে

কমলা দেবী (হাজরা)

কিউ. এস ৪৭০ — পিরীতি কি কর হে শ্যাম / হলুদ বাঁটিতে হলুদ বরণ

দিলীপকুমার রায়

কিউ. এস ৪৮৬ — আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম হে মুরারী / (অন্য লেখকের গান)

নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

কিউ. এস ৪৮৭ — ছি ছি ছি কিশোর হরি / শ্যামা হারায়েছি বলে

কিউ. এস ৫১০ — ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ বাদল নূপুর বোলে / নূতন পাতার নূপুর দখিনা বায়ে

কিউ. এস ৫৩৭ — মুরলী শিখিব বলে এসেছি কদম্ব তলে / আমি কলহের তরে কলহ করেছি

বরদা গুহ

কিউ. এস ৫০২ — টারালা—টারালা—টারালা / আমি মুলতানী গাই

মণ্টু রাণী

কিউ. এস ৫১৫ — বল সই বসে কেন একা আনমনে / বাঁশী কে বাজায় বনে আমি চিনি আমি চিনি

নীলম খাতুন

কিউ. এস ৫২১ — মাগো আমায় শিখাইলে কেন আল্লার নাম / আল্লার নামের নায়ে চড়ে যাব মদিনায়

রথীন চট্টোপাধ্যায়

কিউ. এস ৫২৩ — আমি তব দ্বারে প্রেম ভিখারী / চৈতালী চাঁদনী রাতে

কৃষ্ণদাস ঘোষ

কিউ. এস ৬০৩	{	আমি বেলপাতা জবা দেব না মাগো দেব শুধু আঁখিজল আমি মা ব'লে যত ডেকেছি সে ডাক নূপুর হচ্ছে ও রাঙা পায়ে

শৈল দেবী

কিউ. এস ৫৩৪	{	মা তোর কালো রূপের মাঝে রসের সাগর লুকিয়ে আছে শ্যামা বলে ডেকেছিলাম শ্যাম হয়ে তুই কেন এলি
কিউ. এস ৫৯৩	{	ওরে ডেকে দে ও কালো শশীরে আর বাজায়োনা বাঁশীরে

মেগাফোন

কানন দেবী

জে. এন. জি ৫৩৮০	{	কথা কইবো না বউ (সাপুড়ে বাণীচিত্রের গান) আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ („)

কালো দেবী

জে. এন. জি ৫৫২১	{	সাজের মাথা খেয়ে লাল নটের ক্ষেতে

আব্বাসউদ্দীন আহমদ

জে. এন. জি ৫৭	{	তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে সৈয়দে মক্কী মদনী আল্ আরাবি
জে এন. জি ৪৫	{	বসিয়া নদী[illegible] এলোচুলে কে উদাসিনী আসে বসন্ত ফুলবনে
জে, এন. জি ...	{	পদ্মদীঘির ধারে ধারে নদীর নাম সই অঞ্জনা নামে তীরে খঞ্জনা

*দিতে এলে ফুল হে প্রিয়
*দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি
কৃষ্ণ প্রেমের ফুল ফুটেছে
ঘুম পাড়ানী
প্রেম আর ফুলে
চৌরঙ্গী, চৌরঙ্গী (বাংলা ও হিন্দি)
জয় বাণী বিদ্যা দায়িনী
আমার সোনার হিন্দুস্থান
আনমনে জল নিতে ভাসিল গাগরী
নাইয়া ধীরে চালাও তরণী
খাজনাদারের জুলুম
ফাল্গুন মাস
ফিরে ফিরে আসে যায় কে নিতি
আমার বিজন ঘরে হেসে
দুলবি কে আয় মেঘের দোলায়
*কেন আসিলে ভালোবাসিলে
*পাষাণের ভাঙালে ঘুম
জহরৎ পান্না
সারাদিন ছাত পিটি (বাংলা ও হিন্দি)
ওলো বৈশাখী ঝড়
ঘর ছাড়া ছেলে
লক্ষ্মীমা তুই—ওঠগো এবার
উদার ভারতে সকল মানবে
চাঁপার রঙের সাড়ী আমার
রুমুঝুমু রুমুঝুমু
জারক নেবু
তামাকু বিরহে
আজি গানে গানে ঢাকবো

থাক্ সুন্দর ভুল আমার
আজ ভারতের নব আগমনী
ঝরে যায় মোর আশা কুসুম
বাজিয়ে বাঁশী মনের বনে
ডগমগ যৌবন চলে গোয়ালিন্
নেহি ত্তাড়বে ফুলকী ডালি
পিয়া পাপিয়া পিউ বোলে
এস বসন্তের হে রাজা আমার
বুকে তোমায় নাইবা পেলাম
এ কুঞ্জে পথ ভুলে আজ
নার্গিস বাগ্ মে বাহার কো আগমে
দোল ফাল্গুনের দোল লেগেছে
কোন্ বন হ'তে ক'রেছ চুরি
পান্'সে জ্যোছনাতে কে চলে গো
বনে মোর ফুটেছে হেনা
আঁখি ঘুমঘুম
সখি বাঁধলো চুল
দুপুর বেলাতে একলা পথে
আজও ফোটেনি কুঞ্জে মম
পর পর চৈতালী সাঁঝে
মদির আবেশে কে চলে
এ কোথায় আসিলে হায়
ছাড় ছাড় আঁচল বঁধু যেতে দাও
রেশমী চুড়ির তালে
আজ প্রভাতে বাহির পথে
দুধে আলতায় রঙ যেন তার
ফিরে গেছে সই এসে নন্দকুমার
গুলবাগিচায় বুলবুলি আমি

বাজায়ে বাঁশের চুড়ি
ত্রিংশ কোটি তব সন্তান
দেখা হবে প্রিয় পর জনমে
ভালবেসে অবশেষে কেঁদে দিন গেল
পা তোড়বে সরকারী নেবুয়া
পল্লু ছোড়ো সজন ঘর জানা রে
পলাশ মঞ্জরী পরায়ে দেলো
কেন ফোটে কেন কুসুম ব'য়ে যায়
শেষ হ'লো মোর এ জীবনের
উচাটন মন ঘরে রয় না
কত কথা ছিল তোমায় বলিতে
উম্মত আমি গুনাহ্‌গার
ভুবনজয়ী তোরা কি আজ সেই মুসলমান
পথ চলিতে যদি চকিতে
সোনার মেয়ে
তোমার কুসুম বনে আমি
চোখের নেশার ভালোবাসা
মোর পুষ্প পাগল মাধবী কুঞ্জে
পথ ভোলা কোন রাখাল ছেলে
দোপাটি লো করবী
মোর হৃদি-ব্যথায় কেউ সাথী নেই
কত কথা ছিল বলিবার
বিদেশী অতিথি সিন্ধুপারে
কপোত-কপোতী উড়িয়া বেড়ায়
সাত ভাই চম্পা জাগোরে
মেঘের হিন্দোলা দেয় পুব হাওয়াতে
ফিরে যা সখি ফিরে যা ঘরে
অঝোর ধারায় বর্ষা ঝরে
মেরো না আমারে আর নয়ন-বাণে
চারু চপল পায় যায় যুবতী গোরী
যৌবন সিন্ধু টলমল টলমল
প্রিয়া যাই যাই ব'ল না
বাসন্তীরঙ সাড়ী পরো
যদি অবেলায় এলে প্রিয়
আঁখিবারি আঁখিতে থাক
আসিলে কে গো বিদেশী
আজি এ বাদল দিনে
শিউলি তলায় ভোর বেলায়
বেলা প'ড়ে এল জলকে যাই চল
এল ফুলের মহলে ভোমরা
নাচে সুনীল দরিয়া দিলদরিয়া
সেই পুরানো সুরে আবার
এস বঁধু ফিরে এসো
কোন্ দূরে ওকে যায় চলে যায়
রিমিঝিমি ঐ নামিল
মণি মঞ্জীর বাজে
মোর মাধবীশূন্য মাধবীকুঞ্জে
সাগর হ'তে চুরি ডাগর তোমার আঁখি
বনহরিণী রে তব বাঁকা আঁখির
হেলে দুলে নীর ভরনে ওকে যায়
কূল রাখ বা না রাখ তুমি সে জানো
চল্ সামলে পিছল পথে গৌরী
ডালে ডালে দোলনা আমার

টুইন

আব্বাসউদ্দীন আহমদ

এফ. টি ১২৬৩৩	মোহম্মদের নাম জপেছিলি তৌহিদেরি মুর্শিদ আমার
এফ. টি ১২১৯৪	ভেসে যায় হৃদয় আমার (অন্য লেখকের গান)
এফ. টি ৪৭১৫	খয়বর জয়ী আলি হায়দর নাম মোহম্মদ বোলরে মন নাম আহ্‌মদ বোল
এফ. ৩২১৭	খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে সাহারাতে ফুটলো রে ফুল
এফ. টি ১৩৫৯৬	আল্লাতে যার পূর্ণ ঈমান যে আল্লার কথা শোনে
এফ. টি ৪৯২৭	এ কোন্ মধুর শারাব দিলে খাতুনে জিন্নাত ফাতেমা জননী
এফ. টি ১৩৪৩৪	রোজ-হাসরে আল্লা আমার দিন গেল মোর
এফ. টি ৪৩২৮	ওগো মা ফাতেমা ফোরাতের পাণিতে নেমে
এফ, টি ১৩৬৪৭	আল্লা নামের বীজ বুনেছি আল্লাকে যে পাইতে চায়
এফ. টি ১৩৪৯৬	দুখের সাহারা পার হয়ে নাই হল মা বসন-ভূষণ
এফ. টি ১২৯৭১	খোদা এই গরীবের শোনো শোনো মোনাজাত কারও ভরসা করিস নে তুই

এফ. টি ৩৭৬৬ — গুণে গরিমায় আমাদের নারী / ধর্মের পথে শহীদ যাহারা

এফ. টি ৩৩৯৯ — সাধু জাগো মনে পরজীবনে / তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ

এফ. টি ৪৫৭১ — চলরে কবর জেয়ারাতে / দে জাকাত দে জাকাত

এফ. টি ৪২৯৩ — হে নামাজী আমার ঘরে / মোহম্মদের নামের ধেয়ান

এফ. টি ১২১০০ — আমার প্রিয় হজরত / ত্রাণ কর মওলা মদিনার

এফ. টি ৮২১৬ — ওরে ও দরিয়ার মাঝি মোরে নিয়ে যাওরে মদিনায় / শোন শোন ইয়া এলাহী আমার মোনাজাত

এফ. টি ২৫৯৫ — বহিছে সাহারায় শোকের লু হাওয়া / মোহররমের চাঁদ এল ঐ

এফ. টি ৩৯৮০ — ত্রিভুবনের প্রিয় মোহম্মদ এলো রে দুনিয়ায় / বহে শোকের পাথার

এফ. টি ৪০৭৫ — উঠুক তুফান পাপ দরিয়ায় / মোহম্মদ মোর নয়নমণি

এফ. টি ২২৮৮ — ভুলিতে পারিনে তাই আসিয়াছি পথ ভুলে / বিরহের গুলবাগে ভুল করে আজ ফুটল কি বকুল

এফ, টি ১২৩৫৫ — কে বলে আরবে নদী নাই / তৌহীদেরি বান ডেকেছে

এফ. টি ১২৭৩৭ — খোদা তোমার মেহেরবাণী / নীল আসমানের কোরান

এফ. টি ৩৩০১ — আর কি গো ফিরে আসিবে না প্রিয় / আঁকি গো ছবি মর্মের পাতে

এফ. টি ২৬৩৬	ঐ যে ভরা নদী বাঁকে পরাণ আমার কাঁদে গো।

কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

এফ. টি ১২১৩১	মালতি-মঞ্জরী ফুটিবে যবে যে পাষাণ হানি

হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এফ. টি ৮৪৭	কত আর এ মন্দির দ্বার এলে কি শ্যামল পিয়া

মাধবী দাশগুপ্তা

এফ. টি ৪৭৭৪	গানের সাথী আছে আমার জানি তোমার সাধনা নাই

রিগ্যাল

আব্বাসউদ্দীন আহমদ

আর. এল ১২২১	ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক হো ফিরে এল আজি মোর মাহে রমজান

হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস

কাজী নজরুল ইসলাম

এন. ২৭১৮৮	—রবিহারা (আবৃত্তি)
পি. ১১৫২০	—নারী (আবৃত্তি)

মৃণালকান্তি ঘোষ

এন. ২৭৫৮২	মোরে মায়ার ডোরে (অন্য লেখকের গান)

এন, ২৭৪৪৪ — দীনের হতে দীন দুঃখী
(অন্য লেখকের গান)

এন. ২৭৪০৩ — জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস
দেখে যারে রুদ্রাণী মা

এন. ৭৪২১ — বল্ রে জবা বল্
মহাকালের কোলে

আব্বাসউদ্দীন আহমদ

এন. ১৭৪৪৩ — গাঙ্গে জোয়ার এল ফিরে তুমি এলে কৈ
বন্ধু আজো মনে পড়ে আম কুড়ান খেলা

এন. ১৭২৫৪ — লাইলী তোমাব এসেছে ফিরিয়া
লাইলী ভাঙিয়ো না ধ্যান

এন. ৭১০৯ — আল্লাহ্ আমার প্রভু আমার নাহি ভয়
শহিদী ঈদ গাহে দেখ আজ জমায়েত ভারী

এন. ৯৮৬৫ — বেণুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর
ভুলে যেয়ো না সেদিন যদি পড়ে মনে

এন. ৪১১১ — ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ

এন. ৭০৬৮ — দিকে পুনঃ ়লিয়া উঠিছে দীনি ইসলামী লাল মশাল
কোথায় তখ্ত্ তাউস্ কোথায় সে বাদশাহী

এন. ৭৪৪৮ — এলো আবার ঈদ ফি়র এলো আবার ঈদ
যাবার বেলায় সালাম শহ ও পাক্ রমজান

আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও মৃণালকান্তি ঘোষ

এন. ১৭০৭৮ — হিন্দু ও মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই
ভারতের দুই নয়ন-তারা হিন্দু-মুসলমান

আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও কে. মল্লিক

এন. ৯৮৯৯ — সেই রবিয়ল আউয়লেরি / নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া

এন. ৭৪২৪ — মোদের নবি কমলিওয়ালা / মরু সাহারা আজি মাতোয়ারা

মোহম্মদ কাসেম

এন. ৭০২৭ — খুশী লয়ে খুশরোজের আয় খেয়ালী খোসনম'র / আয় মরু পারের হাওয়া নিয়ে

এন. ৭১০১ — ঈতুজ্জোহার চাঁদ হাসে ঐ / এলো শোকের সেই মোহরম

এন. ৭১১৮ — মোহম্মদ মোস্তাফা সল্লে-আলা / যাবি কে মদিনায় আয় ত্বরা

এন. ৭০০৫ — বাজলো কিরে ভোরের সানাই / বক্ষে আমার কাবার ছবি

এন. ৯৭১১ — মোহম্মদের নাম জপি / সুদূর মক্কা-মদিনার পথে

সকিনা বেগম

এন. ৯৮০৬ — এল শবেরাত / ভক্তিভরে পড রে তোরা

জগন্ময় মিত্র

এন ৩১০৪৯ — প্রথম প্রদীপ জ্বালো / জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা

ইলা ঘোষ

এন. ২৭১৮০ — মোমতাজ! মোমতাজ! তোমার তাজমহল / নূরজাহান! নূরজাহান! সিন্ধু নদীতে ভেসে এলো

রওশাণ আরা বেগম

এন. ৭৬৭৮ { আমারি ধ্যানের ছবি / কোরবাণী দে তোরা

হরিমতী

এন. ৯৭২৯ { কে নিবি মালিকা / হেলে দুলে নেচে চলে

ইন্দুবালা

পি. ১১৬৮২ { যাও যাও তুমি ফিরে / কেন আনো ফুলডোর

পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়

এন. ১৭০৫০ { তুমি আর একটি দিন থাকো / যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায়

মিস মতকগ্গেলো

এন. ৯৭৭৭ { মম মায়াময় স্বপনে / উতল হলো শান্ত আকাশ

রঞ্জিত রায়

এন. ৭২৯৬ { আমার খোকার মাসী / মটকু ·াইতি বাঁটকুল রায়

কমল দাশগুপ্ত

এন. ২৭৪৭১ { তুমি হাতখানি ·বে / (অন্য লেখকের গান)

যুথিকা রায়

এন. ২৭৩৩০ { বলেছিলে তুমি ·ীর্থে আসিবে / (অন্য লেখকের গান)

এন. ২৭৪৮১ { বঁধু আমি ছিনু বুঝি বৃন্দাবনে / (অন্য লেখকের গান)

যুথিকা রায় ও কমল দাশগুপ্ত

এন. ২৭১৬৩ { প্রিয় আসিবে রে
মোরা কুসুম হয়ে কাঁদি }

সত্য চৌধুরী

এন. ২৭৩৯৫ { এবার নবীন মন্ত্রে হবে
যাসনে মা ফিরে }

এন. ২৭৩৯৪ { আগুন জ্বালাতে
(অন্য লেখকের গান }

এন. ২৭৩৪০ { প্রিয়া হবে এসো রাণী
একাদশীর চাঁদ }

সন্তোষ সেনগুপ্ত

এন. ২৭৪৩৭ { কেন আজ ফুলডোর
কেউ ভোলে না কেউ ভোলে }

এন. ২৭৩২৩ { আমায় নহে গো, ভালবাসো মোব গান
(অন্য লেখকের গান) }

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

এন. ২৭৩৯২ { ভুল ক'রে যদি ভালবেসে থাকি
(অন্য লেখকের গান) }

এন. ৮২৮১৩ { আমি চিরতরে দূরে চলে যাব
তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি }

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

এন. ২৭৩৭৮ { শাওন আসিল ফিরে
নীলাম্বরী শাড়ী পরি }

এন. ২৭৪৩৯ { ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি
সন্ধ্যা-মালতী যবে ফুলবনে }

আমার মা যে গোলাপসুন্দরী
খোদার রহম চাহ যদি
আল্লার নামের দরখতে
দাদা বলতো কিসের ভাবনা
দে গরুর গা ধুইয়ে
ফিরি ক'রে ফিরি আমি
তোমা বিনা মাধব
নিশিরাতে রিমঝিম
ওব নিশীথ-সমাধি
ফাগুন ফুরাবে যবে
ভবনে আসিল অতিথি
নূতন করে গড়বো ঠাকুর
আমি রব না ঘরে
ঈদল ফেতার
সালাম লহ রোজা
আমি গিরিধারী মন্দিরে
জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ
ব্রজবনের ময়ূর
বিবহের নিশি কিছুতে আ'র ফুরাতে না চায
ফিবিযা এস এস হে ফিরে
বকুল চাঁপার বনে কে মোর
পরদেশী আযা হুঁ দরিয়াকে পার
পুঁথির বিধান যাক্ পুড়ে
তোরা সত্যি
ভুলি কেমনে
এতো জল ও কাজল চোখে
বাগিচায় বুলবুলি তুই
আমাবে চোখ ইসারায়
সোজা পথে চল রে ভাই
আয় মুক্তকেশী আয
বাঙাজবার বায়না ধরে
করিও ক্ষমা হে খোদা
ও ভাই হাজি
হে ব্রজকুমার শোন
ব্রজের দুলাল ব্রজে
বনে চলে বনমালী
আঁধাব রাতে কে একেলা
ছাড ছাড আঁচল বঁধু
ব্যথার আগুনে হৃদয় আমার
বাদল বায়ে মোর নিভিয়ে গেছে বাতি
এ ঘোর শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে
পথ চলিতে যদি চকিতে
আমার ভাঙা নায়ের বৈঠা ঠেলে
ভরিযা পরাণ শুনিতেছি গান
খোলো খোলো বাহুব মালা
ভালবাসার ছলে আমাব
কত কথা ছিল বলিবার (২)
যেন ফিরে না যায
কে বিদেশী মন উদাসী
গহিন রাতে কে এলে
এ আঁখি জল মোছ প্রিয়া
মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
কেন দিলে কাটা যদি
কেন কাঁদে পরাণ
তিমির বিদারী অলকবিহারী
আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল

সখী বলো বঁধুয়ারে
কেন দিলে
জাতের নামে বজ্জাতি
আশক ও মা শুক চল মিলকর হম
উমত ঝুমত লচকে কমর
না ছোড়ো গারি হুঁপি
নহে নহে প্রিয়
কেমনে রাখি আঁখিবারি
ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়
মুসাফির মোছ আঁখি জল
করুণ কেন অরুণ আঁখি
কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া
আমি কি সুখে লো
এ বাসি বাসরে
তোমায় কোলে তুলে বন্ধু
কে এল মোর ব্যথার গানে
পেয়ে কেন নাহি পাই
না মিটিতে সাধ মোর
কেন করুণ সুরে হৃদয়
পরদেশী বঁধু ঘুম ভাঙাও
পথে পথে কে বাজিয়ে
রাখালরাজ কি সাজ
কেন হেরিলাম
না মিটিতে মনসাধ
এসো মুরলীধারী
চলো মন আনন্দধাম
সখী জাগো রজনী পোহায়
কে দুয়ারে এল মোর
প্রিয় তুমি কোথায়
তুমি দুঃখেরি বেশে
কেন এলে অবেলায়
পরদেশী বঁধুয়া
বসিয়া বিজনে
রুমু রুম ঝুম ঝুমু ঝুমু বাজে নূপুর
হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে
ডেকে ডেকে
এসো মা ভারতলক্ষ্মী
দুঃখ-সাগর-মন্থন
দোলে নিতি নবরূপের
হে বিধাতা
আয় গোপিনী খেলবি হোরী
আজি নন্দদুলালের সাথে
গগনে সঘন
বিলাতি ঘোড়ার বাচ্চা
বাঙলার ঘরে হিন্দি
আমি চিরতরে দূরে
তুমি সুন্দর তাই চেয়ে
এলো ঐ শ্রীচণ্ডী
নৃত্যময়ী নৃত্যকালী
চীন ও ভারত
সঙ্ঘ-স্মরণ-তীর্থ
কেন মনোবনে মালতী বল্লরী
কে সে সুন্দর
ভীরু এ মনের কলি
আমার যখন পথ ফুরাবে
ও যে আমার কমলিওয়ালা
তুমি ভাঙিয়াছ
এলো রে চণ্ডী

ওরে মাঝি ভাই
বিদায় সন্ধ্যা আসিল
আসিলে এ ভাঙা ঘরে
ভাঙা মন জোড়া নাহি যায়
চিরদিন কাহারো সমান
আহমদের ঐ মীমের পরদা
চতুষ্পদের চতুরঙ্গ
চিকণকালো বেদের
তোমার বিনা তারের গীতি
আমি গগনে গহনে
এবারের পূজো—১ম ও ২য়
মনকাতাহিন ভারত
ঝর্ ঝর বারি ঝরে
কাছে তুমি থাক যখন
সন্ধ্যা গোধলি লগনে
তোমার গানের চেয়ে
বলেছিলে তুমি ভালবাস
তোর নামেরি কবচ দোলে
নিশিকাজল শ্যামা
শ্মশানকালীর রূপ দেখে
কারে দেখে ঘোমটা দিবি
ও বৌদি! তোর কি হয়েছে
নয়নভরা জল গো তোমার
সর্বমঙ্গলা মঙ্গলো
এলো শিবানী উমা
এসেছি দেয়ালী জ্বালাতে
মিনতি রাখ
এবার নবীন মন্ত্র হবে
যাসনে মা ফিরে

প্রজাপতি
এতো কথা কি গো কহিতে
ফুলফাগুনের এলো মরশুম
আমার সকলি হয়েছে হরি
নূপুর মধুর রুম ঝুম বোলে
দেখে যারে দুলহা সাজে
তব গানের ভাষায় সুরে
আমার কালো বাঞ্ছাকল্পতরু
আমার হৃদয় হবে
ধীরে বহো ভোরের হাওয়া
সন্ধ্যা নেমেছে আমার
ভেসে আসে সুদূর স্মৃতি
প্যানচেট—১ম ও ২য়
আমি গরবিনী মসলিম
যেতে নারি মদিনায়
ঝুলন ঝুলায়ে
ঝুলে কদম কেয়ার
মোর বেদনার কারাগার
শালীবাহন দি গ্রেট
কলির রাই কিশোরী
কোথায় গেলি মাগো
আমায় ফিরিয়ে দে মা
পরি জাফরাণী ঘাগড়ী
রেশমী রুমালে কবরী বাঁধি
তোমার কালো রূপে
ওরে নীল যমুনার জল
হে ভগবান
ব্যথিত প্রাণে দাও শান্তি
মোরা আর জনমে হংসমিথুন

চামচিকে উড়ে গেলো
কালী সেজে ফিরলি ঘরে
স্বপ্নে দেখি একটি নূতন ঘর
বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে
সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে
যদি আমি তোমারে হারাই
মহুয়া বনে লো
চুড়ীর তালে নুড়ীর
তমাল তমাল
বেলফুল এনে দাও
বেদনার সিন্ধুমন্থন
আমি প্রভাতী তারা
চল নামাজী চল
ঈদ মুবারক হো গাজী
শুনরে বে দরদো
সখী ভবতি হুঁ
একি অসীম পিপাসা
আমারে দিব না ভুলিতে
শোক দিয়েছ তুমি হে নাথ
মুক্তি আমায় দিলে
তোমার নামে এ কি নেশা
আমিনা দুলাল নাচে
দিও এই বর
আও জীবন-মরণ সাথী
আজ মধুর লগনে
স্বপন যখন ভাঙবে
ফুটলো যেদিন ফাল্গুনে
বেণুকার বনে কাঁদে
ভুলে যেয়ো সেদিন

বঁধু আমি ছিনু বুঝি
তুমি হাতখানি যবে রাখ
আমার সকল আকাশ
ওরে বনের ময়ূর
মোর ঘনশ্যাম এলে কি
অন্ধকারের এলোকেশ
জাগো কৃষ্ণকলি
নতুন করে
রমজানেরি চাঁদ
ফারদোসেরি সিরণি
আবার শ্রাবণ এলো ফিরে
ওকে হেলে দুলে চলে এলোচুলে
নতুন খেজুর রস
বেযাই বেয়ান
কোথায় গেলো পেচামুখী
নমাজ পর রোজা রাখ
সকাল হলো শোনরে আজান
নিঠুর কপট সন্ন্যাসী
নাটকে ঠমকে যায়
ভক্ত নরের কাছে
গিরিধারীলাল কৃষ্ণগোপাল
কবর জিয়ারাতে কে তুমি যাও
আমার হৃদয় শামদানে
দ্বারকার সাগরতীর হতে
নমঃ যাদব নমঃ মাধব
তুমি কি পাষাণ বিগ্রহ
হে কৃষ্ণ চাঁদ
আরো কতোদূর
জয় দুর্গতিনাশিনী শিবে

নিশীথ রাতে নীরবে
এসো প্রিয়তম এসো প্রাণে
পরো সখীর মধুর বধূবেশ
যুগল মূরতি দেখে
আমি আলোর শিখা
সাঁঝের পাখীরা ফিরিল কুলায়
মাগো আমি আর কি ভুলি
মাগো আমি মন্দমতি
ব্রজকুমার গিরিধারী
তোমারেই আমি চাহিয়াছি
মন্দির দ্বারে কতো
হে মাধব দেখা দিলে
সখী সেই তো পুষ্পশোভিতা
যা যা লো বৃন্দে
বৃথা প্রবোধ দিসনে
আমি সন্ধ্যামালতী
বনের তাপস কুমারী আমি গো
সখী ফুল ফুটেছে
ডরে ব্যাকুল বেণু বন
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রসনা
বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
বঁইচি মালা রইলো গাঁথা
কন্যার পায়ের নূপুর
কত নিদ্রা যাওরে কন্যা
গাছের তলার ছাওয়া
ওই তরুণী চলে
এসো মাধব এসো
কাজরী গাহিয়া চলে
তব চরণপ্রান্তে

হৃদয় চুরি করতে এসে
তোমার পূজার ফুল
সন্ধ্যা হলো ঘরকে চল
মোরা বিহান বেলা
বুনো পাখি বুনো পাখি
বাঁধিস যদি মোরে
ওমা কালী সেজে
তুমি অনেক দিলে
তুমি আশা পুরাও খোদা
সেদিন বলেছিলে
চৈতী চাঁদের আলো
মা যে চিন্ময়ীরূপী
ভারত শ্মশান হলো মা
তুই আমারে ছেড়ে আছিস
তোর ভুবনে জ্বলে এতো আলো
বল প্রিয়তম বল
মনে পড়ে আজ
মোরা কুসুম হয়ে
পিউ পিউ বোলে পাপিয়া
কল্যাণ দাও হে শ্যাম
কেন গো যোগিনী
গুঞ্জ মঞ্জরী মেলা
আমার ভুবন কান পেতে রয়
ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে
এস প্রিয় মন রাঙায়ে
সখী এখন আমার
আমার কাছে এই কথানি গান
আল্লার রহম—১ম ও ২য়
মাগো আজো বেঁচে আছি

যৌবনে যোগিনী
ওকে নাচের ঠমকে
বনে-বনে খুঁজি
তোমার লীলারসে
সপ্তসিন্ধু ভরি
নাইতে এসে ভাটার স্রোতে
আঁধার রাতে দেবতা মোর
কতদূরে তুমি ওগো
বিয়ে হয়েও সাজলো না বউ
অনেক মাণিক আছে শ্যামা
কুব্জীর নৃত্য
আজি নূতন চাঁদের
বাকা শ্যামল এলো
বাকা শ্যাম হে
সন্ধ্যায় গোধূলি রঙে
আনো আনো অমৃতবাণী
নিশিদিন জপ খোদা
তোমার নূরের রওশানি মাখা
যুগ যুগ সে
সাদিকে পহলে
সাদিকে বাদ
খেলত বায়ু ফুল
আজ বন-উপবনে
তুম হো আনন্দ
মোহনা তুম বনে
মকুর ফুল ঝরিল অবেলায়
অসীম বেদনায় কাঁদে
বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ
হে মদীনার বুলবুলি গো
রঙ পিরহার পরে
মদীনাতে এসেছে সেই
এ কি ঈদের চাঁদ
তোমার আমার আশায়
জ্যোতির্ময়ী মা এসেছে
কে সাজালো মাকে আমার
মধুর আরতি তব
ওগো চৈতী রাতের চাঁদ
অনাদিকাল হ'তে
তোমার আমার এই বিরহ
নিশি ভোরে অশ্রান্ত ধারায়
আজ শ্রাবণের লঘু
আমিনা দুলাল এসো মদিনায়
ওকে সোনার ফাঁদ কাঁদেরে
সংসারেরি সোনার শিকল
দুঃখ অভাব শোক দিয়েছ
ভেসে যায় হৃদয় আমার
আমার হৃদয় অধিক রাঙা
শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা
মেঘবরণ কন্যা
প্রভু তোমারে খুঁজিয়া
দুর্গতিনাশিনী আবার
যে নামে মা ডেকেছিলে
হরে কৃষ্ণ হরে
আমি কেমন করে
ওরে অবোধ আঁখি
কালো জল ঢালিতে সই
শিউলি মালা গেঁথেছিলাম
আমার গানের মালা
এলো এলো রে ঐ সুদূর
বনদেবী এসো গহন

আজি আলকোরাইসি প্রিয় নাবি
যেওনা যেওনা মদীনা-দুলাল
বিরহের অশ্রু-সায়রে
বাঁধিয়া বীণ
উপল নুড়ির কাঁকন
দিন গেল কই দীনের বন্ধু
সুদূর বন্ধু এস
আজকে গানের বান এসেছে
ওকে তালে তালে চলে একেলা
পিয়ো পিয়ো হে প্রিয় সরাব
যূথিকা, মাধবী, মল্লিকা
মণ্ডলী রচিয়া ব্রজের
মরুর ধূলি উঠলো রেঙে
নীল কবুতর লয়ে নবীর
আল্লা রসুল বলরে মন
আল্লা রসুল জপরে
মদিনায় যাবি কে আয়
আমিনার কোলে নাচে হেলে
কে বলে গো তুমি আমার নাই
আমি হবো মাটির বুকে ফুল
নাচিছে মোটকা পিলে পটকা
ও বাবা তুর্কী নাচন
তুমি আমার চোখের বালি
কৃষ্ণচূড়ার মুকুট পরে
মা আমি তোর অন্ধ ছেলে
ওমা ত্রিনয়নী সেই চোখ দে
কাঁকর ভরা দুপুর বেলা
শুসনি শাক তুলতে এসে
দরিয়াতে দাবানল
অঞ্জলি লহ মোর
মিনতি রাখ
বল্লরী ভুজ-বন্ধন খোল
ভোরের স্বপ্নে কে তুমি
সৃজন ছন্দে আনন্দে
মনের রং লেগেছে
ওকে মুঠি-মুঠি আবির
দিনগুলি মোর
ওকে উদাসী আমার
নাই পরিলে নূতন খোঁপায়
আঁধার রাতে তিমির দুলে
চলরে সম্মুখে চল
জননী মোর জন্মভূমি
দোলে প্রাণের কূলে
যুগ যুগ ধরি
মেঘলামতীর ধারা
মেঘ-মেদুর গগনে
তুমি দিয়েছ শোক
দূর আরবের স্বপন দেখি
ওরে ও মদিনা বলতে পারিস
আজ পিয়াল ডালে বাঁধো
প্রীতি-উপহার—১ম-৬ষ্ঠ
এলো ঐ বনান্তে পাগল
আজি চৈতী হাওয়ায়
রাধিকার কুল ভক্ষন
গদাইয়ের পদবৃদ্ধ
সর্বনাশী মেখে এলি
নিশি পবন নিশি পবন
বন-বিহঙ্গ যাওরে উড়ে

শ্যাতার বিরহ
তুমি আসিবে না
তুমি বিরাজ কোথা হে
মোরে পূজারী কর
বকুল বনের পাখী
কত জনম যাবে
দোলা লাগিল দখিনা
গাহে আকাশ পবন
হে মোর স্বামী অন্তর্যামী
এস আনন্দিত ত্রিলোক
এলে মা আমার
সজল কাজল শ্যামল
পূজার থালায় আছে আমার
কিশোরী মিলন বাঁশরী
রাসমঞ্চে দোল লাগে
ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভাই ভাই
ওগো পিয়া তব অকরুণ
মালার ডোরে বেধো না গো
কিশোরী সাধিকা
খেলিছে জলদেবী
বিদেশিনী চিনি চিনি
ওরে ভবের তরী
ফিরে ফিরে কেন তার
আমার হৃদয়-মন্দির
খেলিছ বিশ্ব লয়ে
তোমার মহাবিশ্বে
নিশি না পোহাতে
বিকেল বেলায় ভুঁই চাঁপা গো

গগনে খেলায় সাপ বরষ বেদিনী
ঘনশ্যাম কিশোর নয়ন
তোমার পূজার ফুল ফুটিছে
ও বাঁশের বাঁশী রে
নিশীথ রাতে ডাকলে আমায়
আজ সকালে সূর্য উঠা
নদীর স্রোতে মালার কুসুম
সন্ধ্যা হলো ঘরকে চলো
মোরা বিহান বেলা উঠি রে
সখা শ্যামের স্মৃতি
বাহির দুয়ার মোর রুদ্ধ
জন্মাষ্টমী—১-২
লম্পং লম্পং
হরি হরি হর হর
ঝরঝর নির্ঝর ধারা বহে
বুনো পাখী বুনো পাখী
বাঁধিস যদি মোরে
ঠাকুর তেমনি আমি
যোগী শিব শঙ্কর
ব্রজগোপাল শ্যামসুন্দর
নিশির নিশুতি জানে
বঁধু দেখলে তোমার
ভাওয়া সাগর মে বেহাতি
শ্যামসুন্দর কা দরশন
সপ্তসিন্ধু ভরি গীতা
ঢাকাই কেষ্ট (কলির কেষ্ট)
দাসী হ'তে চাই না
আজো মা তোর পাই-নি
করুণা তোর জানি মাগো

আসিলে এ ভাঙা ঘরে
চিরদিন কাহারো সমান
কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান
মথুরার দ্বার
মা এলো রে এলো রে
আঁধারে এ চিতে
তিমির বিদারী অলখ
বহু পথে বৃথা ফিরিযা
মাতৃস্তোত্র
খোকার গল্প বলা
মহুযা ফুলের ঘন সুবাসে
চাঁদনী রাতে কাননে
শিবস্তোত্রম্
গানগুলি মোর
কেন এলে অবেলায়
দোলে নিতি নবরূপের
হে বিধাতা
শ্রীমতীর চিত্রাঙ্কন
এলো কৃষ্ণ কানাইযা
বরষ এলো ঐ বরষ
আজ বাদল ঝরে
যদি শালেরি বন হ'তো
নিশি ভোর হোলো জাগিযা
ইন্দ্রপতন—১ম ও ২য়
কি সুখে লো গৃহে রবো
দূর দ্বীপ-বাসিনী
মমীর দেশের মেয়ে
চেয়ো না সুনযনা
যাও যাও তুমি ফিরে
নদীর মাঝে রবি
হোরী খেলে নন্দলালা
তুমি ভোরের শিশির
ছন্দের বন্যা হরিণী
মেষ চরাতে যায় নবী
ক্ষমা কর হজরত
হাসির গান
চটির বিরহ
চন্দ্রমল্লিকা
ঝরলো যে ফুল ফোটার
যাও হেসে দুলে
আমার কলগীতি চঞ্চল
ফুল চাই, চাই ফুল
চাঁদের নেশা লেগে
এলো এলো রে বৈশাখী ঝড
আসে রজনী সন্ধ্যারাণী
তরুণ অশান্ত কে বিরহী
অঞ্জলি লহ মোর
দোলা লাগিল
ভারতলক্ষ্মী আয মা আয
জাগো জাগো মাযা জাগো
পিউ পিউ বোলে পাপিযা
রহি রহি কেন আজি
পল্লীবালিকা বনপথে
আমি ময়নামতীর শাড়ী
ও কালো বৌ
গোঁফদাড়ি সম্বল
ভুঁড়ি কম্প
কার মঞ্জীর রিনি ঝিনি

আজ ভারতের নব যাত্রা
দে দোল দে দোল
কি দিয়ে পূজি ভগবান
আমার নয়নে কৃষ্ণ
সখী লো তাই
একি সুরে তুমি গান শোনালে
দেখে যা তোরা নদীয়ায়
মোর মন ছুটে যায়
মহুয়া গাছে ফুল ফুটেছে
কে দিলো
সুরের ধরার পাগল
নাচন লাগে ওই তরুলতায়
এলো ফুলের মরশুম
আন সখী সিরাজী আন
কে এলো গো চির-চেনা
জাগো জাগো রে মুসাফির
কুসুম সুকুমার শ্যামল
এসো নূপুর বাজাইয়া
মন লহ নিতি নাম
তোমার সৃষ্টি মাঝে হেরি
প্রিয় কবে গেছে পরদেশে
বিজলী চাহনি কাজল কালো
মুখে তোমার মধুর হাসি
পাপে তাপে মগ্ন আমি
তুমি সুন্দর কপোত
কৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণগোপাল
পালিয়ে তুমি বেড়াবে কি
চঞ্চল আঁখি কেন
হয়তো আমার বৃথা আশা

ফিরে আয় ভাই গোঠে
কতো আর মন্দির দ্বার
ভালোবাসায় বাঁধবো বাসা
মন নিয়ে আমি লুকোচুরি
কে নিবি ফুল
ঝরা ফুল দলে
দাম্পত্য কলহ
একি হাড়ভাঙা শীত
আমি দেখনহাসি
মরমকথা ফেলে
বলো না বলো না শুনো সই
গাড়োয়ানী উল্লাস
কুব্জা কীর্তন
আজ নাচনের লেগেছে
মুখ তার রহি রহি পড়ে মনে
ক্ষ্যাপা হাওয়াতে মোর অঞ্চল
তোমারি চরণে শরণ যাচি
আজকে তনু মনে লেগেছে
খুলেছে আজ রঙের দোকান
রক্ষাকালীর রক্ষা কবচ
যে ব্যথায় এ অন্তরতল
প্রেম অনুরাগে শ্রীমুখ সুন্দর
কেন ভোরে জাগি
অসীম রূপের সিন্ধু তীরে
হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই
ছলছল চোখে
একলা ঢুলিয়া কে যায়
আজ শরতে আনন্দ ধরে না রে
বিদায় বিদায়

এসো যদি মনোমন্দিরে
হে গোবিন্দ ও অরবিন্দ
কেঁদে যায় দখিন হাওয়া
কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে
কাহার তরে হায়
রাথ রাথ রাঙা পায়
মোর মন্দিরে মন
জপলে রে মন মেরে
দাও শক্তি প্রেম ভক্তি
তোমার আশার চরণ ধরি
আমি সুন্দর নহি
আমি পথভোলা
ভক্তিভরে পার রে
আাম যদি আরব হতাম
সকাল-সাঁঝে প্রভু
আমি প্রেম-পাগলিনী
আঁধারিণী তোর কালোমেয়ে রে
তোর নাম যার জপমালা
কেন তুমি কাঁদাও মোরে
ঘূমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে
সখী কেন এতো সাজিলাম
আমি বাউল হলাম ধূলির পথে
পাষাণ যদি হতে তুমি
ভালোবাসায় ভুলিও না
তোমারি মহিমা গাই
একলা গোরী জলকে চল
গোলাপ ফুলের কাঁটা
নিরালা কানন পথে
এ জনমে মোদের মিলন

মাগো মহিষাসুর সংহারিণী
আয় রণজয়ী পাহাড়ীদল
অন্নপূর্ণা মা এসেছে
এসেছে রে অধর্মের আজ
বাসনার সাঁড়াশিতে
হোক প্রবুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ
তোরা প্রাণভরে ডাক
পুণ্য মোদের মায়ের আসন
দুর্গমগিরি কান্তার মরু
কেন চাঁদনী-রাতে
গোলাপ ফুলের কাঁটা
নিরালা কাননপথ
যে ব্যথায় ও অন্তরতল
আরশিতে তোর নিজেব রূপই
বিদায় প্রিয়তম হে বিদায়
ভেসে আসে সুদূর স্মৃতি
তোমার সৃষ্টিমাঝে হবি
শ্যামল বরণ বাঙলা মায়েব
দুঃখ ক্লেশ শোকে
নাচে ওই নন্দদুলাল
রাখিস না বাঁধিয়া মোরে
পার কর নাইয়া
ছলছল নয়নে
ধর ধর ভরা ভরা
পায়ে বিঁধিছে কাঁটা
সই ভালো করে বিনোদ বেণী
প্রিয় তব গলে দোলে
কেমনে কহি প্রিয়
এলো কে গো চিরসাথী

বছর ফিরলো ফিরলো মা
নাথ সহজ কর লঘু কর
প্রিয় কবে গেছে পরদেশে
দিলো দোলা দিলো দোলা
পুতুলের বিয়ে ১-২
নবার নামতা পায়
কে কি হবি বল
কালো জাম রে ভাই
জুজুবুড়ির ভাই
কানামাছি ভোঁ ভোঁ
ছিনি মিনি খেলা
দিকে দিকে পাশ
কোথায় তক্তে তাউস
ও তুই যাসনে রাই কিশোরী
কালা এত ভালো কি হে
হৃদয় কেন চাহে
শূন্য আজি গুল-বাগিচা
হোরীর হর্‌রা
আজিকে হোরী ও নগরী
অভিনব শব্দার্থ
বিন্ধে ফেলো তীর
কাহার তরে হায়
রাখ রাখ রাঙা পায়
সখীলো তাই
কুসুম সুকুমার শ্যামল
আমার নয়নে নয়ন রাখি
হিন্দু মুসলমান দুই ভাই
শুচিবাই
হেরি আজ শূন্য নিখিল

তোমারে চেয়েছি কত যুগ
তুমি ফুল আমি সুতা
নাচিছে নটনাথ শঙ্কর
চিরকিশোর মুরলীধর
আজকে দোলের হিন্দোলায়
চল সখী খেলি তবে
ভোলো লাজ ভোলো
নমো নমো নমো বাঙলা
ভুলিতে পারি না সই
বিরহের গুলবাগে
গিন্নীর চেয়ে শালী ভালো
রাজযোটক মিল
আমার হরিনামে রুচি
তবু হলো না আক্কেল
কত সে জনম কত সে লোকে
সুনয়ন চোখে কথা
ব্যথার উপরে বন্ধু
শিউলি ফুলের মালা দোলে
গ্রামের শেষে মাঠের পরে
দেশপ্রিয়ের তিরোধানে
ঝড় ঝঞ্ঝার উড়ে নিশান
জাগো দুস্তর পথের নবযাত্রী
আমার প্রাণের দ্বারে
উঠেছে কি চাঁদ
ডেকো না আর দূরের প্রিয়
দূর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে
গত রজনীর কথা
তওফিক দাও খোদা
বীর দল আগে চল

আমরা চটক ভাল
আবু হাবু সংবাদ
মহম্মদ মুস্তাফা
স্বপ্নে দেখেছি ভারত
স্বদেশ আমার
বাজিছে দামামা
বিজন গোঠে
সেদিন প্রভাতে
সকরুণ নয়নে চাহে
মরহবা সৈদি মাক্কি
তোমারি প্রকাশ মোহন
ধীরে যায় ফিরে ফিরে চায়
আজি মিলন-বাসর প্রিয়
ফিরি পথে পথে মজনু
নয়নের মণি আমার পিয়ারা
খোদার হবিব হোলেন নাজিল
সে চলে গেছে বলে
ঐ ঘর ভুলানো সুরে
গঙ্গা সিন্ধু নর্ম্মদা
আমার দেশের মাটি
ঘন ঘোর মেঘ-ঘেরা
প্রভু রাখ এ মিনতি
আমরা বাঙালীবাবু
অসুর বারির ফিরাতে যা
একি অপরূপ রূপে
মালঞ্চে আজ কাহার
আমার দেওয়া ব্যথা ভোলে
মথুরার দ্বারে
ভেঙো না ভেঙো না ধ্যান

চলরে চপল তরুণদল
ফুটলো সন্ধ্যামণির ফুল
গগনে পবনে আজি
বহে বনে সমীরণ
কোন কুসুমে তোমায় আজি
নাচে ভুঁড়ি ভাণ্ডারী
হেলে দুলে বাঁকা কানাইয়া
তুমি নন্দন পথ ভোলা
ঝুমকো লতার চিকন পাতায়
ভুল করিলে বনমালী
নিশুতি রাতের শশী
যাবার বেলায় ফেলে যেও
জানি জানি প্রিয় এ জীবনে
মিটিবে না সাধ
বাঁশী বাজায় কে
আমি কূল ছেড়ে চলিলাম
ওকি ঈদের চাঁদ
মদিনাতে এসেছে সই
মাগো আমি আর কি ভুলি
ব্রজকুমার গিরিধারী
হে মাধব হে মাধব
খেলত বায়ু ফুল বনমে
প্রথম প্রদীপ জ্বালো
শ্রীকৃষ্ণ মুরারী
আজি নূতন চাঁদের
বাঁকা শ্যামল এলো বনে
রাধা তুলসী প্রেম পিয়াসী
শ্রীকৃষ্ণ রূপের কার ধ্যান
কৃষ্ণ নিশিতে নাচে

কেঁদে কেঁদে নিশি হোলো
ওগো চন্দ্রমল্লিকা
নদী এই মিনতি তোমার
পরাণ হেরিয়াছিলে পাশরিয়া
নবীন বসন্তের বাণী তুমি
ঝরলো যে ফুল ফোটায়
ভারতলক্ষ্মী আয় মা
জাগো যোগমায়া জাগো
পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাঘ্র শিকার
শুকনো পাতার নূপুর পায়ে
কবির লড়াই
গলে তাগার মালা
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ
জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর
ঝুলন দোলনা দে দোলায়ে
শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে
ফুলের মত ফুল্ল মুখে
কলঙ্ক আর জ্যোছনায়
বকুলতলে ব্যাকুল বাঁশী
হাওয়াতে নেচে আয়
চাঁদের পেয়ালাতে আজি
নব কিশলয় শয্যা পাতিয়া
সবুজ শোভার ঢেউ খেলে
এসো শারদ প্রাতের পথিক
সাঁঝের পাখীরা ফিরিলে
গিরিধারী গোপাল ব্রজগোপ দুলাল
কেঁদো না কেঁদো না
মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী
তুই পাষাণগিরির মেয়ে হবি
নাচে গৌরী দিবা
দোলে বন তমালের ঝুলনাতে
শ্যাম নাম তু জপলে
কৃষ্ণ মুরারী কৃষ্ণ
রাধাকৃষ্ণ নামের
ভুলে রইলি মায়ায় এসে
সন্ধ্যায় গোধূলি রঙে
আনো আনো অমৃতবারি
ভিলনী ভিলিয়া
প্রেম কাটারি
সখীরে দেখত
মাধব গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ
আজি কুসুম দীপালী
রাত্রি শেষের যাত্রী আমি
তব চরণ প্রান্তে
বুনো ফুলের করুণ-সুবাস
তরুণ তমাল বরণ
তুমি ভোরের শিশির
নৌকা বিহার
আজকে তনু মনে
মেঘমেদুর গগনে
ঘুমাও ঘুমাও
এসো ভিন গেরামের নারী
শূন্য এ বুকে পাখী মোর
যাহা কিছু মম
তবু যাবার বেলায় বলে যেও
ও কূল ভাঙা নদীরে
গেরুয়া রঙ মেঠোপথে
খেলে নন্দের আঙিনায়

সাপ খেলাও তোমারি
সাপ খেলানর বাঁশি
তোমার আমার আশায়
নাইতে এসে ভাঁটির স্রোতে
তোরা যারে এখনি
ওগো আমি তোমার দুলাল
তুমি কি চাঁদ
ফুল-বীথি এলে অতিথি
কোন বিদেশী নাইয়া তুমি
সোনার বরণ কন্যা গো
নাকে নথ দুলায়ে চলে
শ্যামসুন্দর গিরিধারী
তুমি হো আনন্দ ঘনশ্যাম
মোহন তুম বনে বানওয়ারি
কৃষ্ণ কানাইয়া আওয়ে
পাপী তাপী সব তরলে
যমুনাকে তীরকে
ব্রজপুর চন্দ্র
তোরা দেখে যা
তোম হি মোহন চাঁদ
বাতা দেরে যমুনাকে জল
বেদিয়া বেদেনী ছুটে আয়
বাজে মঞ্জিল মঞ্জীর
তোমার বুকের ফুলদানীতে
বহু পথ বৃথা
ধারা কি প্রাণ আঁধার
দো পাইয়া জিউ
নাচে শ্যাম সুন্দর
নাচো নাম কি পেয়ালে
মা তোর চরণকমল
হোরীর রঙ লাগে আজ
কৃষ্ণ কানাই খেলে হোরী
ঘুমায়েছে ফুল পরের
এলে কে মোর সাঁঝ গগনে
হোরী খেলে নন্দলালা
বাঙিল আপনি রাধা
যাও হেলে দুলে
আমার কলগীতি চঞ্চল
শ্রান্ত ধরার বালুতলে
তেরা হি ধেয়ান
মেরা বেটি কি খেলা
সৃজন আনন্দে
যোগী শিব সুন্দর
চম্পা পারুল যুঁথি
আধো আধো বোলে
আজি চঞ্চল লীলায়িত
দিনগুলি মোর পদ্মেরি দল
গানের মালা কোরবো কারে দান
আজি চৈতী হাওয়ার মতন
দেশবন্ধু
এলো এলো রে ঐ সুন্দর
এলে তুমি কে
ভোরের স্বপ্নে কে তুমি
দোল লাগিল দখিনার বনে
কত জনম যাবে হায়
ওগো প্রিয়তম তুমি
চলো চলো চলো
মুক্তি নিয়ে কি হবে মা

মোহরে নেবু জটাধারী
গিরিধারী গনে কৃষ্ণ গোপাল
ভক্ত নরের কাছে হে নারায়ণ
মুক্তি আমায় দিলে হে নাথ
জাগো কৃষ্ণ কালী
যুগ যুগ সে
দিও ওই বর
স্বপন যখন ভাঙলি
নিশীথ রাতে নীরবে
মরুর ফুল ঝরলো অবেলাতে
অসীম বেদনায় কাঁদে
বাঁশীতে সুর শুনিযে
ললাটে মোর তিলক এঁকো
কলঙ্কে মোর সকল দেহ
আকাশে মধুর বাতাসে
এসো চিরজীবনের সাথী
কোথায় গেলে মাগো আমার
আমায় যারা দেয় মা
হে ব্রজবল্লভ
শ্যামে স্মৃতি
আমি সুখের নহি
ব্রজদুলাল ঘনশ্যাম
ঝুলন দোলায় দোলে
মা গো আজো বেঁচে আছি
মা এসেছে রে
বল রে তোরা বল
হেমন্তিকা এসো এসো
লক্ষ্মী মা গো
বাঁশীর কিশোরী
আর কতদিন

ওমা নির্গুণের প্রসাদ দিতে
কেন আজো বাজে আমার
রাঙা মাটির পথে গো
ভুলে যেও সেদিন
বন মে শুন সখীরে
বল যৌবন মোর
দেখো সখী
নয়ন কি তার মার
হৃদয় চুরি করতে এসে
মাসীর দেশের মেয়ে
কুসুম আবির ফাগের
এলো ফুলদল
নন্দকুমার বিনে
সই কই গোপীবল্লভ
বকুল ছায়ে ছিনু ঘুমায়ে
প্রাণ নিয়ে নিঠুর
আমায় রাখিও না আর ধরে
নবনীতে সুকোমল
গুঞ্জমালা গলে
আমাদের নারী
আমরা সেই সে জাতি
বৌমানিয়া
দুঃখের ফর্দ্দ
কলিকাতা পথিকের ভুল
গিন্নির কাছে গয়নার ফর্দ্দ
খেলিছে জলদেবী
শুধু নামে যশ এলো
আঙিনায় দুলাল নাচে
তোমার নামের একি নেশা
হে প্রিয় নবী

তোর কালো রূপ লুকাতে
বনে মোর ফুল ঝরায়
তোমার হাতের সোনার রাখী
বরণ করে নিওনা গো
আমার ঘরের মলিন দীপালোকে
এলে তুমি কে
তোমায় দেখি নিতুই
ওরে ও নূতন ঈদের চাঁদ
তুমি দিয়েছ দুঃখ
আমার হৃদয় মন্দির
গাহ রাম অবিরাম
প্রিয় এখন রাত
আজ নিশীথে তোমার অভিসার
মনের রঙ লেগেছে
ও কে মুঠি মুঠি আবির
দেশপ্রিয়
চিকন কালো ভ্রূর তলে
ওরে সরে যেতে বল
তাহার কি গোল বাধালে
আঁধার রাতে তিথির দোলে
যদি আমি তোমারে হারাই
একি অসীম পিপাসা
হে প্রিয় আমারে দেবে না
মোর বুক ভরা ছিল আশা
যায় ঝিলমিল ঢেউ তুলে
আমায় দুঃখ যত দিবি
জাগো অমৃত পিয়াসী
প্রভাত বিনা তব
স্নিগ্ধশ্যাম বেণীবর্ণ
দখিন সমীরণ সাথে
মদির স্বপনে
শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর
খেলো না আর আমায় নিয়ে
অশ্রু-বাদল করেছিনু
আজি চঞ্চল লালায়িত

আমার আছে একখানি
প্রথম মাধবী ফুটেছে
ফিরে ফিরে কেন তার স্মৃতি
ব্রজ গোপাল
আমার সকল আকাশ ভরলো
অন্ধকারে দেখাও আলো
লীলা রসিক শ্রীকৃষ্ণ
ও পাড়ারি মেয়ে
আমার ঋণের বোঝা শ্যাম
তুমি আমায় সকাল বেলায়
অন্ধকারে এসো তুমি
হায় আঙিনায় সখী
আমার যাবার সময় হ'লো
জাগো মালবিকা
ঝর ঝর ঝর
বুনো ফুলের কুসুম সুবাস
এলো আজি পূর্ণশশী
পথিক বন্ধু এসো
সন্ধ্যা হলো ওগো রাখাল
হায় ভিখারী
তোমার আঘাত শুধু
ফিরিয়ে দে মা
বঁধু সেদিন নাহিকো
মালা যদি মোর
সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায়
মাধবী লীলায় কারা
তৃষিত আকাশ কাঁপে রে
ঝড় এসেছে
মদন মনোহর
ভব কান্ত ১—২
কাছে আমার নাইবা এলে
তুমি চলে যাবে দূরে
আবার কেন বাতায়নে
রূপের কুমার জাগো
বনের হরিণ বনের হরিণ

তব যাবার বেলায়
তোমার ফুল ফোটানো
গলে তাগার মালা
ভুল করেছি ও মা শ্যামা
শ্মশানকালী
ঝরো ঝরো অঝোর ধারায়
মাতলো গগন অঙ্গনে আজ
তুমি যদি বদলে গেছো
ও কে চলিছে বনপথে
এই আমাদের বাঙলা দেশ
যায় হে জনগণ
ভয় নাই ভয় নাই
জাগো তন্দ্রামগ্ন জাগো
তুমি যখন এসেছিলে
আমার কাছে অসীম
এস হে সজল শ্যাম
বেদনা বিহ্বল পাগল
অনাদরে স্বামী পড়ে আছি
বরের বেশে আসবে জানি
তোমার ডাক শুনেছি
জয় মা গঙ্গা
আমি ভুলিতে পারি না
তুমি রাজা নহ সাধু
তোমার লীলা বোঝা ভার
নম নারায়ণ অনন্ত
লায়লী গো এসো
তোমার কবরে প্রিয়
নিশিদিন তব ডাক শুনি
ঠাকুর তোমার মালা
দাও আরো আরো দাও
ওগো ঠাকুর বলতে পার
তুমি দুঃখের বেশে এলে
হে গোবিন্দ হে গোবিন্দ
তোমার সজল চোখে লেখা
ভুল করে যদি
ভোলো গো লায়লী
আজকে সাদী বাদশাজাদী
তোমার বিবাহে আপন হাটে
ঝরঝর বরষণ বারি
বাজে মৃদঙ্গ বরষায়
দোলে ঝুলন দোলে
বনদেবী জাগো
জ্বালিয়ে আবার
মিলন আলোকে ফুটলো কেন
বনফুলের তুমি মঞ্জরী
আবার কেন আগের মত
নীল যমুনা সলিল কান্তি
ডাকতে যদি পারি তোমায়
হে চির সুন্দর
নারায়ণ, নারায়ণ
আমার শান্ত হৃদয়
লহ প্রণাম শ্রীরঘুপতি
ভুবনময়ী ভবনে এসো
আকুল হলে কেন
কার বাঁশরী বাজল
কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ে
নাচে নটরাজ মহাকাল
অন্তরে তুমি আছ
আমার বিফল পূজাঞ্জলি
সাজ অভিনব সাজে
হেলে দুলে চলে
বিধুর তব আঁধার আঁখির কোণে
মুসলিম আমার নাম
নমাজ রোজা হজ জাকাতের
ধীর চরণে নীর ভবনে
পরজনম থাকে যদি
সুন্দর অতিথি এসো এসো
মন দিয়ে যে দেখি তোমায়
কে বলে গো তুমি আমায়
শূন্য বাতায়নে

কে বলে মোর মাকে কালো
মা গো আমি তান্ত্রিক নই
যখন আমার কুসুম
তোমার মূর্চ্ছনাতে
চোখে চোখে চাহ যখন
নন্দদুলাল নাচে
বাঁধন যত খুলিতে চায়
তুমি লহ প্রভু
একি অপরূপ রূপের কুমার
পালিয়ে যাবে গো
তুমি আমারে কাঁদাও
দূরের বন্ধু আছে আমার
জ্বালো দেয়ালী
শেষের মত নামের নেশায়
শ্যামল তুমি শ্যাম
ঘরে আয় ফিরে
একলা জাগে
কাঁদবো না আর
আমি অলস উদাসী
এসো তুমি
রাসো মঞ্চোপরি
যা সখী যা তোরা
হে মহা মৌনী
মন প্রাণ শতদল
নিরন্ত্র মেঘে মেঘে
নাহি ভয়
ওই হের
হে মদিনা
আজ শেফালীর গলে
আঁধখান চাঁদ হাসিছে
ওই কাজল কালো চোখ
ভবের এ পাশা খেলায়
কার বাঁশী বাজে বেণু কুঞ্জে
মুখের কথায় নাই জানালে
বৈকালি সুরে গাও
দেশবন্ধু তিরোধানে
লহ সালাম লহ
হজরতের মহানুভবতা
প্রেমের গোকুলে
সখী শ্রাবণে শোনো
জ্যোৎস্না-হসিত মাধবী
ঘুমাও ঘুমাও
পলাশ ফুলের মন
রূপ নাই গো
তোমায় ফেলে এসেছিলাম
নয়নে তোমার
কুড়িয়ে কুসুম
মনে রাখার দিন গিয়েছে
মাগো তোমার অসীম মাধুরী
প্রেম আমার জাতি
শোনালো শ্রাবণে
মোর শ্রীকৃষ্ণবর্ণ
আকুল ব্যাকুল
তোমার দেওয়া ব্যথা
প্রিয়তমা হে
এসো মা দশভুজা
একটু বসতে দিও
লীলা চঞ্চল ছন্দ দোদুল
কেঁদে কেঁদে নিশি হলো
কোয়েলা কুহু কুহু
নাই চিনিলে আমায়
টলমল তোলে
মনে যে মোর মনের ঠাকুর

বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীর গানের তালিকা, 'কবিতা' চৈত্র ১৩৫১, আষাঢ় ১৩৫২' ও পাঠকদের সাহায্যে এ-তালিকা সঙ্কলিত। এর বাইরে তাঁর বহু রেকর্ড করা গান আছে যা আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। তাই এ তালিকা সম্পূর্ণ নয়। সবার কাছে লেখক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।